যখন নায়ক ছিলাম

ধীরাজ ভট্টাচার্য

সম্পাদনা
দেবজিত্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ১৩৬৭
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
১২বি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে
শিলাদিত্য সিংহ রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ইম্প্রেশন হাউস-এর পক্ষে

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে
রবি দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত
অক্ষর বিন্যাসঃ অ্যাড ওয়েভ কমিউনিকেশন
১০৫/৩ নৈনানপাড়া লেন, কলকাতা ৭০০০৩৬
প্রচ্ছদঃ সৌম্যেন পাল
প্রুফ নিরীক্ষণঃ সুবাস মৈত্র

পটকথা

সন ১৯০৫। ধীরাজ ভট্টাচার্যর জন্ম হয় বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের যশোর জেলার পাঁজিয়ায়। ১৯২৩-এ স্কুল পেরিয়ে পাঠ শুরু হল কলেজের। আর তখনই মনের গভীরের আশৈশব বাসনা রূপ নিল রূপোলি পর্দায়।

১৯২৫। তখনও ছবির কথা ফোটেনি। নির্বাক যুগ। ছবির নাম 'সতীলক্ষ্মী'। এক বখাটে ছেলের মামুলি চরিত্রে ধীরাজের চিত্র-প্রবেশ। বাড়ির অজান্তেই ঘটল সে ঘটনা। ফলে ছবিমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে গেল আত্মীয়মহলে। অখুশি হলেন বাবা ললিতমোহনও। জোর করে পুলিশের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন ছেলেকে। নিজের শহর ছেড়ে যেতে হল চট্টগ্রাম। অনিচ্ছার চাকরিতে মন বসল না। হঠাৎই ছুটি নিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। আর ফিরে যাননি।

১৯২৯। এ যাবৎ রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ ঘটেনি ছবির পর্দায়। তাঁর 'মানভঞ্জন' রূপান্তরিত হল চলচ্চিত্রে — 'গিরিবালা'। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক মধু বসু। প্রযোজক ম্যাডান থিয়েটার্স। রবীন্দ্র-সম্মতিতে শেষ হল চিত্রনাট্যের কাজ। নতুন করে কিছু সংলাপ লিখে দিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রযোজকদের পছন্দ হল সে নাট্যরূপ। আপত্তি উঠল নায়ক নির্বাচনে।

> 'জাহাঙ্গীরজী (ম্যাডান থিয়েটার্স-এর কর্ণধার) বললেন : বোস, নতুন কোনো 'হিরো'র সন্ধান কর। সব ছবিতেই দুর্গাদাস আর দুর্গাদাস। একটু চেঞ্জ হোক।
>
> আমি বললাম : দেখি চেষ্টা করে।
>
> আমি নতুন হিরোর সন্ধানে লেগে রইলাম। অনেককে বললাম — শেষে একদিন বন্ধুবর সুধীরেন্দ্র সান্যাল একটি নতুন ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এলো। বেশ চেহারা, তার বয়স খুব কম। অবশ্য এর আগে ম্যাডানেরই একটা ছবি ('সতীলক্ষ্মী')- তে সে কাজ করেছিল। সে আমাকে তার জীবনের ইতিহাস বলল। সে আগে পুলিশে কাজ করত, কিন্তু অভিনয়ের দিকে তার ঝোঁক বেশী বলে সে পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।
>
> আমি ঠাট্টা করে বললাম : পুলিশ থেকে একেবারে আর্টিস্ট?
>
> এই শিল্পীটি আর কেউ নয় ... ধীরাজ ভট্টাচার্য।'

('আমার জীবন', মধু বসু)

নায়ক হিসেবে ধীরাজকে মেনে নিলেন প্রযোজকরা। নির্বাক যুগের পরিক্রমায় গিরিবালার পরপরই কালপরিণয় (১৯৩০), মৃণালিনী (১৯৩০) এবং নৌকাডুবিতে (১৯৩২) বন্দিত হলেন নায়ক ধীরাজ।

নির্বাক অবসানে এল সবাক যুগ। মুখর হল মূক ছবি। বিজ্ঞাপনি ভাষায় 'Shadows talk in human voice' বা 'Pictures do the talking'। স্ব-রবে অনেকে বাতিলের দলে গেলেও ধীরাজের স্বীকৃতি বেড়ে গেল। সেই নায়কজীবনের সময়, সমাজ ও সঙ্গীদের ঘিরে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি যেন এক চলচ্ছবি। বহু নায়ক চরিত্রের পরতে পরতে গড়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের অকথিত ইতিহাস।

বয়সের সঙ্গে বদলেছে চরিত্র। বখাটে ছেলে থেকে রোমান্টিক নায়ক, নায়ক থেকে ভিলেন। গ্রন্থশেষে তারই আভাষ। বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র-র 'সমাধান' চিত্রে চরিত্রবদল। 'ভিলেন' জীবনের শুরু। হারিয়ে গেল অনেক না-বলা কথা নায়কের অন্তরালে। এ যেন ব্রিটিশ লেখক Quentin Crisp-এরই প্রকাশ : 'An autobiography is an obituary in serial form with the last instalment missing.' (*The Naked Civil Servant*, Quentin Crisp) শুধু তাই নয় ভিলেনের ভানে কখনও হয়েছেন গোয়েন্দা, আবার কখনও নির্মল কমেডিয়ান। বখাটে ছেলের নীরব ভাষা বদলেছে সরব নায়কের রোমান্সে — বদলেছে ভিলেনের ক্রুরতায় — বদলেছে ব্যঙ্গের কশাঘাতে — অবিচ্ছেদ্য বাঙালিয়ানায়। জীবনের তর-বেতর অস্তিত্বে গড়েছেন বহুবিচিত্র রূপময়তা। তাঁর অভিনয়বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠা দেয় ব্রিটিশ পরিচালক-অভিনেতা Laurence Olivier-এর অভিজ্ঞতা

চলচ্চিত্রের শতাধিক রূপায়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক অভিনয় করেছেন মঞ্চে — কখনও রঙমহল, কখনও নাট্যনিকেতন আবার কখনও বা কালিকা থিয়েটারে। জীবন-সায়াহ্নে মঞ্চ ও চিত্র — দু'মাধ্যমেই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এ হাজারি ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয়ের বিরল কৃতিত্ব তাঁর।

নায়ক জীবনের অভিজ্ঞতার এই গ্রন্থরূপের পাশাপাশি লিখেছিলেন পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতায় 'যখন পুলিশ ছিলাম'। গল্পগ্রন্থ 'সাজানো বাগান' এবং 'মহুয়া মিলন' আর উপন্যাস 'মন নিয়ে খেলা' তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রকাশ। তাও অপ্রকাশ রয়ে গেছে ধীরাজ-জীবনের বহু অভিজ্ঞতা। তবু যা পাওয়া গেছে তাই-বা কম কী।

৪ মার্চ ১৯৫৯। কালের অমোঘ নিয়মে হারিয়ে গেলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য।

দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়

"আমার জীবন নদীতে জোয়ার নেই, শুধু ভাঁটা। অনাদি-অনন্তকাল ধরে একঘেয়ে মিনমিনে জলস্রোত বয়ে চলবে লক্ষ্যহীন, উদ্দ্যেশ্যহীন পথভোলা পথিকের মতো। বাঁকের মুখে ক্ষণিক থমকে দাঁড়াবে, আবার চলতে শুরু করবে গতানুগতিক রাস্তা ধরে। এ নদী শুকিয়ে চড়া পড়ে গেলেও জোয়ার কোনোদিন আসবে না, এই বোধ হয় নিয়তির বিধান।"

ধীরাজ ভট্টাচার্য

ভূমিকা

সত্যিই একটা ভূমিকার বিশেষ দরকার, নইলে মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যাবে পাঠক ও আমার মধ্যে। 'দেশ' পত্রিকায় 'যখন পুলিশ ছিলাম' বার হবার সময় থেকেই বহু পাঠক-পাঠিকার অনুরোধপত্র আমি পাই। সবার বক্তব্য এক—পরবর্তী রচনা যেন আমার নায়ক জীবনকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়। তা না হয় হল। কিন্তু তারপর? এই তারপরের একটা সুষ্ঠু মীমাংসায় পৌছতেই প্রায় ছ' মাস কাটিয়ে দিলাম।

কথায় বলে, একে রামানন্দ তায় ধুনোর গন্ধ। আত্মজীবনী, তাও আবার সিনেমা নায়কের! বিশ বছর আগে হলে কল্পনা করাও মহাপাপ ছিল। আজ পৃথিবীর রং-হাওয়া বদলে গেছে। ঢিলে হয়ে গেছে তথাকথিত সামাজিক ও নৈতিক বাঁধনের শক্ত গেরোগুলো। আজ দর্শক শুধু পর্দার ছায়ার মায়ায় ভুলতে রাজি নয়। আজ তারা পর্দার অন্তরালের মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা, সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনের বার্তা জানবার জন্যে উদগ্রীব, আগ্রহশীল। সে আগ্রহ মেটাবার সাহস থাকলেও সামর্থ্য নেই। দেশটা ভারতবর্ষ না হয়ে পৃথিবীর আর যে কোনও সভ্য দেশ হলে এত ভাবনা-চিন্তার কারণ থাকত না। ও দেশের নায়ক-নায়িকারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সব কিছুই খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি দিয়ে বিচার করে বলেই বুক ফুলিয়ে জীবনটাকে খোলা চিঠির মতো দর্শক-সাধারণের চোখের সামনে মেলে ধরে। উৎফুল্ল দর্শক হাসাহাসি করে, মাতামাতি করে, আবার দিনকতক বাদে সব ভুলেও যায়। কিন্তু এদেশের ভবি অত সহজে ভোলে না। ধরুন, বিশ বছর আগে রোমান্টিক আবহাওয়ায় কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে একটি সুন্দরী নায়িকাকে প্রেম নিবেদন করেছিলাম, সাড়াও হয়তো কিছু পেয়েছিলাম। বর্তমানে সিনেমা-জগৎ ছেড়ে

স্বামীপুত্র নিয়ে তিনি হয়তো সুখের নীড়ে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছেন। আজ খুঁচিয়ে ঘা করার মতো একযুগ আগের বিস্মৃতপ্রায় সেই ঘটনা যদি আমার নায়ক জীবনে উল্লেখ করে বসি, পরিণামটা একবার চিন্তা করে দেখুন। তাছাড়াও আর একটা মস্ত বিপদ, নায়ক জীবন লিখতে বসে কোনও গোঁজামিল দিয়ে চলে যাবার উপায় নেই। কেননা অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী এখনও জীবিত রয়েছেন। এইবার আমার অবস্থাটা একবার ভাল করে ভেবে দেখুন। রোমান্টিক নায়ক জীবন লিখতে হবে রোমান্সকে বাদ দিয়ে। ঠিক নুন বাদ দিয়ে মুখরোচক খাবার রান্নার মতো নয় কি? অনেক ভেবেও কোনও কূলকিনারা না পেয়ে কাপুরুষের মতো পিছু হটতে লাগলাম। হঠাৎ চেয়ে দেখি পৌঁছে গেছি পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে সিনেমার আদি যুগে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ দর্শক বা পাঠকের ধারণাই নেই কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, কত হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নির্বাক যুগের ঐ বোবা শিশু একটু একটু করে এগিয়ে এসে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বর্তমানের মুখর যুগের মাঝখানে। দেখি সেদিনের অবহেলায় ফেলে আসা ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনাগুলো আজ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আজ এক নতুন চোখে তাদের দেখতে পেলাম। যত্ন করে তাই একটি একটি করে বুকে তুলে নিয়ে কথার মালা গেঁথে আঁকাবাঁকা পথে সামনে এগিয়ে চললাম। এরাই হল আমার নায়ক জীবনের মূলধন। এই হল 'যখন নায়ক ছিলাম'-এর সত্যিকারের ইতিহাস। সত্যকে যথাযথ বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি। কয়েকটি জায়গায় প্রয়োজনবোধে পাত্র-পাত্রীর নামধাম গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছি, এইমাত্র।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। অনেক পাঠক-পাঠিকার ধারণা, আমি ইচ্ছা করেই হঠাৎ কাহিনীর ছেদ টেনে দিয়েছি। ভুল ধারণা। 'যখন নায়ক ছিলাম' বলতে আমি আমার রোমান্টিক নায়ক জীবন সম্বন্ধেই বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখাবার চেষ্টা করেছি। প্রশংসার জয়মাল্যের পরিবর্তে পেয়েছি সমালোচনার নিষ্ঠুর কশাঘাত। তাই একঘেয়েমি কিছুটা এড়াবার জন্য, চরম লাঞ্ছনার মধ্যেই কাহিনীর যবনিকা টেনে দিয়েছি।

অনেকে এই অভিযোগও করেছেন, এখনও তো আপনি নায়কের ভূমিকায় মধ্যে মধ্যে অভিনয় করেন, সুতরাং 'যখন নায়ক ছিলাম' অত আগে শেষ করলেন কেন? উত্তরে তাঁদের একটু ধীরভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি' 'টাইপ' চরিত্রে আসার পর যে সব নায়ক চরিত্রে আমি রূপদান করেছি, সেগুলি কি রোমান্টিক নায়ক? ধরুন 'নিয়তি', 'কঙ্কাল', 'মরণের পরে', 'ময়লা কাগজ', 'সেতু' প্রভৃতি। 'যখন নায়ক ছিলাম'-এ এগুলোর উল্লেখ করলে আর যে অসংখ্য 'টাইপ' চরিত্রে অভিনয় করে আমি পেয়েছি দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা, সেগুলি বাদ দেওয়া চলে কি? তাই রোমান্টিক নায়কের চিতার আগুন নেববার আগেই কাহিনীর শেষ করেছি। এর জন্য যা কিছু অপরাধ সব আমার, পাঠক-পাঠিকার কাছে এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এর পরবর্তী জীবন— সে আমার নবজন্মের কাহিনী। বর্তমান কাহিনীর সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। নায়ক জীবনের স্বপ্ন-কাজল-মোছা চোখে দেখা এক বিচিত্র জগতের বিচিত্রতর অম্লমধুর অভিজ্ঞতার কাহিনী। বারান্তরে সে সম্বন্ধে কিছু বলবার ইচ্ছা রইল।

আর একটি ত্রুটির কথা এই সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। সিরাজগঞ্জ প্রসঙ্গে উকিল কৃতান্ত কুমার বসুর প্রকৃত নাম অন্তিম কুমার বসু। দীর্ঘ দিনের স্মৃতির অস্পষ্টতার জন্যই ওটা হয়েছে। সম্প্রতি ওঁর সুযোগ্য পুত্র আমার বাড়িতে এসে ঐ ভুলটির সংশোধন করে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে ওরই মধ্যে একটা সান্ত্বনা আমার আছে, নামের ভুল হলেও মানের দিক দিয়ে দুটোর আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য আছে।

বর্তমান যুগ বেপরোয়া সিনেমার যুগ। আকাশে বাতাসে সাহিত্যে শিল্পে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সব কিছুতেই আজ জড়িয়ে আছে সিনেমা। এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলার ইতিহাস হয়তো জানে না, জানে সিনেমার নায়ক-নায়িকার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ক্ষুদ্রতম ঘটনা। তাই যখন দেখি, খোলা মোটরে ঘন্টায় আশি মাইল স্পিডে নায়ক-নায়িকা জড়াজড়ি করে চলেছেন স্টুডিওয়, নয়তো প্রমোদভ্রমণে, তখন তাদের উদ্দেশে মনে মনে বলতে ইচ্ছে হয়— ধীরে বন্ধু, ধীরে। একটু আস্তে, থেমে থমকে চারদিক দেখে পথ চলো। আজ যে কুসুমবিছানো কংক্রিটের চওড়া রাস্তায় তোমার বেপরোয়া যাত্রা শুরু হয়েছে, একদিন তা ছিল আঁকাবাঁকা, এবড়ো-খেবড়ো। ছিল কাঁটায় ভর্তি। আমরা, মানে বোবা যুগের হতভাগ্য নায়কের দল, কাঁটার আঘাত তুচ্ছ করে ক্ষতবিক্ষত হয়েও রোলারের মতো বুকে হেঁটে ঐ রাস্তা করে দিয়েছি সমতল মসৃণ, কুসুম-বিছানো। কিন্তু বেপরোয়া গতিবেগ বাড়াতে গিয়ে তোমরা ওটাকে করে তুলেছ বড্ড বেশি পিছল। তাই বলছিলাম—ধীরে বন্ধু, ধীরে!

যখন নায়ক ছিলাম

মখমলের উপর সোনালী জরির বিচিত্র কারুকার্যখচিত পোশাক, মাথায় সোনার মুকুট, তাতে বহুমূল্য হীরে-জহরত বসানো। সাদা ধবধবে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র চলেছেন কোন সে অজানা দেশের রাজকন্যার সন্ধানে। নীল আকাশে রূপালী মেঘের ছোট-বড় পাহাড়গুলো চোখের নিমেষে পার হয়ে পক্ষিরাজ ছুটে চলেছে। নীচে অসংখ্য রাজ্য ও জনপদ, নদনদী ও অরণ্য-পর্বত হাতছানি দিয়ে ডাকে। ঘোড়া বা ঘোড়সওয়ারের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা চলেছে দূরে, বহুদূরে, বুঝি বা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। যেখানে অচিন দেশের রাজকন্যা ময়নামতী মালা হাতে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছে রাজপুত্রের আশায় পথ চেয়ে। পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। অবশেষে দেখা গেল বহুদূরে নীল সমুদ্রের মাঝখানে ছোট একটা দ্বীপ আর সমস্ত দ্বীপটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা সোনার অট্টালিকা। পড়ন্ত রোদের রক্তিম আভায় অপরূপ স্বপ্নের মায়াপুরীর মত দেখাচ্ছে। আনন্দে পক্ষিরাজ হ্রেষারব করে উঠে দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটে চলল, রাজপুত্র ঘোড়ার পিঠে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। এমন সময় ঘটল এক অঘটন। কোনো অদৃশ্য আততায়ীর এক বিষাক্ত তীর এসে বিঁধল পক্ষিরাজের গলায়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে নীচে নামতে লাগল পক্ষিরাজ, ভীত চকিত চোখে নীচের দিকে চাইতে লাগলেন রাজপুত্র। ভাবলেন, নীচে ঐ অসীম অনন্ত সমুদ্রে পড়লে আর বাঁচবার কোনও আশাই নেই। প্রভুভক্ত পক্ষিরাজ রাজপুত্রের মনের কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় শেষ নিশ্বাস নেবার আগে দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে পড়ল এসে ঐ সোনার অট্টালিকার ছাদে—।

চোখ চেয়ে দেখি, পড়ে গেছি ঘরের সিমেন্টের মেঝেয়। প্রথমটা বেশ অবাক হয়ে গেলাম, নজর পড়ল জামা-কাপড়ের দিকে। পরনে শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়, গায়ে তালি

দেওয়া জামা, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল। সব মনে পড়ে গেল। 'কালপরিণয়' ছবির বেকার দরিদ্র নায়ক মণীন্দ্রের রূপসজ্জায় শুটিং-এর অবসরে ম্যাডান স্টুডিওর মেক-আপ রুমে কাঠের বেঞ্চের উপর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে পড়ে গেছি কঠিন সিমেন্টের মেঝের উপর। ভাগ্যিস ঘরে কেউ ছিল না, নইলে ভীষণ লজ্জায় পড়তাম। ডানহাতের কনুইটায় বেশ চোট লেগেছিল। হাত বুলোতে বুলোতে আরশির সামনে দাঁড়ালাম। নিজের চেহারা দেখে হাসি পেল আমার। কোথায় পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্র, আর কোথায় দারিদ্র্যের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত বেকার শিক্ষিত যুবক মণীন্দ্র! হোক, তবু তো নায়ক ! কতক্ষণ আরশির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই। শুটিং-এর ডাক পড়ল। সারা স্টুডিওটা জঞ্জালে ভর্তি, শুধু খানিকটা জায়গা চৌকো উঠোনের মতো সিমেন্ট করা। তার উপর ঠিক স্টেজের মতো মোটা কাপড়ের উপর রং দিয়ে আঁকা সিন কাঠের ফ্রেমে এঁটে চারদিকে পেরেক আর পিছনে সরু কাঠ দিয়ে ঐ সিমেন্টের মেঝের খানিকটা জায়গায় আটকে তৈরী হয়েছে ঘর। তিন দিকে সিনের দেওয়াল, একদিকে খোলা। উপরে সাদা কাপড় সামিয়ানার মতো টাঙিয়ে সিলিং। পরে শুনেছিলাম সিলিং নয়, রোদের কড়া আলো খানিকটা কমিয়ে দেবার জন্যই ওটার প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশি।

ঘরের মধ্যে টেবিল চেয়ার খাট আলমারি মায় দেওয়ালে ঠাকুর-দেবতার ছবি পর্যন্ত টাঙানো। টেবিলের উপর দু-তিনটে ওষুধের শিশি, ওষুধ খাওয়ার ছোট্ট গ্লাস। পাশে কাগজের উপর খানিকটা বেদানা ও দু-তিনটে কমলালেবু। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি নেই।

খাটের উপর কাঁথা-কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে আমার তিন চার বছরের ছেলে। মাথার কাছে আধময়লা একখানি শাড়ি পরে স্ত্রী সীতাদেবী একখানা পাখা হাতে বাতাস করছে ছেলেকে। এমনি সময় ঘরে ঢুকলাম আমি। ঐ শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়, গায়ে তালি দেওয়া জামা, মাথায় একরাশ তৈলহীন রুক্ষ চুলের বোঝা ও একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে আমি খাটের মাথার দিকে এসে দাঁড়ালাম। স্ত্রী পিছন ফিরে হাওয়া করছিলেন, প্রথমে দেখতে পাননি আমাকে। ছেলের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ কেমন আছে খোকা?' তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়ে বিষণ্ণ মুখে আমার দিকে চেয়ে স্ত্রী বললেন, 'দি সেইম, নো চেঞ্জ অফ টেম্পারেচর।'

বললাম, 'ওষুধটা ঠিকমতো খাচ্ছে তো?'

উত্তরে একটা খালি শিশি টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে আমার প্রায় নাকের উপর সেটা নেড়ে চেড়ে দেখিয়ে স্ত্রী বললেন, 'ইট ইজ এম্পটি সিন্স মর্নিং। বাট হোয়ার ইজ দি মানি টু ব্রিং ফ্রেশ মেডিসিন?'

শিশিটা রেখে স্ত্রী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলেন। মাথা নেড়ে

বললাম, 'নাঃ, কোথাও কিছু হল না। আমার মতো অভাগার চাকরি কোথাও জুটল না।'

হঠাৎ জ্বরের ঘোরে ছেলেটা কেঁদে ওঠে। স্ত্রী তাড়াতাড়ি মাথার কাছে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করেন।

সিনটা হল এই। ক্লোজ-আপ, মিড শট, লং শট— এইভাবে ভাগ করে সিনটা নিতে প্রায় চারটে বাজল। চা খাওয়ার জন্য খানিকটা সময় ছুটি পাওয়া গেল।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, স্ত্রী সীতাদেবী ফিরিঙ্গি মেয়ে হলেও ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলতে পারতেন। কিন্তু পরিচালক গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'না, তাতে এক্সপ্রেশন নষ্ট হবে।' কাজেই সীতাদেবী ইংরেজিতেই ডায়ালগ বলতেন, আমি বাংলায়। আর ছোট ছেলেটা শুনেছিলাম কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের কোনো এক মুসলমান অভিনেত্রীর ছেলে। সে আবার কড়া উর্দু ছাড়া কথা বলতে বা বুঝতে পারত না। রক্ষে যে তার কোনও সংলাপ ছিল না, খালি জ্বরের ঘোরে অচেতন হয়ে উঃ আঃ বলা ছাড়া। নইলে টকীর যুগ হলে ব্যাপারটা একবার ভাবুন তো! বাংলা, উর্দু ও ইংরেজিতে ঐ সিনটা পর্দার উপর পড়লে আমাদের পারিবারিক দুঃখ দেখে লোকে কাঁদত, না হাসত!

নির্বাক যুগের আরও অনেকগুলো সুবিধা ছিল। প্রথমত, সিনারিও বা স্ক্রিপ্টের কোনও বালাই ছিল না। ছাপানো একখানা বই বা নাটক যা তোলবার জন্য মনোনীত হত, তাতে শুধু সংলাপ অংশ লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে নিলেই সিনারিও হয়ে গেল। পরিচালক শুধু সিনটা বুঝিয়ে দিয়ে অভিনয় শিল্পীদের ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে ঐ লাল পেন্সিলের দাগকাটা লাইনগুলো আউড়ে যেতে বলতেন। কোনও অভিনেতার যদি কোনও লাইন আটকে যেত, অমনি স্টেজের মতো প্রম্পট করে বলে দেওয়া হত। সব চাইতে বড় কথা, অপচয় বলে কোনো কিছু নির্বাক যুগে ছিল না। অভিনয় করতে করতে কোনো অভিনেতা যদি হাঁদারামের মতো হঠাৎ সংলাপ ভুলে পরিচালকের দিকে চেয়ে থাকতেন, তাতে তাঁর লজ্জিত বা দুঃখিত হবার কিছু ছিল না। পরিচালকমশাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে 'কাট' বলে চিৎকার করে ক্যামেরা থামিয়ে দিতেন না। বরং উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।' ফিল্ম এডিট বা জোড়া লাগাবার সময় ক্যামেরা বা পরিচালকের দিকে হঠাৎ চেয়ে ফেলার ছবিটা কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে একটা জুতসই টাইটেল জুড়ে দেওয়া হত। ব্যস, সব দিক রক্ষে।

সব চাইতে নিরাপদ ও সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল ভূমিকা নির্বাচন। যেটা বর্তমান টকীর যুগে একটা মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ছবিতে। ধরুন আপনার চাই এমন একটি নায়িকা, যার পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত সেক্স অ্যাপিলে ভর্তি। কিন্তু কোথায় পাবেন তেমন নায়িকা? অনেক খুঁজে-পেতে

যদিও বা একটি পেলেন, দেখলেন সেক্স যদিও তার আছে, সেটা সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিজের মধ্যেই চেপে রেখে দিয়েছে। দশজনের কাছে তার আবেদন পৌঁছে দেওয়া দূরে থাক, কণামাত্র আদায় করতে পরিচালক বেচারিকে মদনদেবের আপিল আদালতে মাথা খুঁড়ে মরতে হয়। শেষকালে তিতিবিরক্ত হয়ে দিলেন ঐ ভূমিকা কোনো নাম-করা অভিনেত্রীকে, ঐ ভূমিকায় যাঁকে একদম মানায় না। আর সেক্স অ্যাপিল? কোন সে সুদূর অতীতে ওঁর সেক্স অ্যাপিলে যাদের দেহে-মনে শিহরণ জাগতো, তাঁদের অনেকেই আজ অ্যাপিলের বাইরে বসে নিশ্চিন্ত মনে নাতি-নাতনি নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছেন। কিন্তু তাতে কী হল? মেয়েদের একটা অদ্ভুত সাইকোলজি, তাঁরা কিছুতেই বয়সের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে চান না। সব সময় পিছনে পড়ে থাকতে চান। ফলে হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে মেক-আপের মায়াজালে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টায় এমন সেক্স অ্যাপিল দেখাতে শুরু করেন, যার ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি বোম্বাইয়ের ছবিকেও লজ্জা দেয়। আর সত্যিকার রসিক দর্শক বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে ভবিষ্যতে বাংলা ছবি না দেখার সংকল্প করে বসেন। বাংলাদেশের নায়িকাদের সম্বন্ধে এই কথাটা বোধহয় নির্ভয়ে বলা চলে যে, যার নেই কিছু, তারই দেবার ব্যাকুলতা । যার আছে, হয় সে কৃপণ, নয়তো দেবার ক্ষমতাই নেই।

এই তো গেল ভলাপচুয়াস নায়িকার কথা। সাধারণ নায়িকার ব্যাপারেও ফ্যাসাদ একটুও কম নয়। সত্যিকার নায়িকা হবার যোগ্যতা বাংলা ছবিতে মাত্র দুতিনজন মেয়ের বেশি নেই। সব প্রোডিউসার মিলে তাদের নিয়েই কাড়াকাড়ি । ফলে এক-একজন নায়িকা বারো-তেরোখানা ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মোটা টাকা আগাম নিয়ে বসে আছেন। শুটিং শুরু করে আপনি দেখলেন, মাসে দুতিন দিনের বেশি ডেট তিনি কিছুতেই দিতে পারছেন না। অগত্যা ছবির সময় ও খরচা দুই-ই বেড়ে গেল।

এইবার দৃষ্টিপাত করুন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে নির্বাক যুগের দিকে। যে কোনো জাতের ভিতর থেকে অতি সহজে নায়িকা নির্বাচন করে ফেলুন যেমনটি আপনার চাই। তারপর স্টুডিওতে নিয়ে এসে শাড়ি-ব্লাউজ পরিয়ে ছবি তুলে নিন। যার যে ভাষা, সেই ভাষাতেই অভিনয় করে যাক, কোনও ক্ষতি নেই। বাংলা টাইটেল দিয়ে শুধু বুঝিয়ে দিন, কী সে বলছে। নির্বাক যুগে খুব কম বাঙালি মেয়ের নায়িকা হবার সৌভাগ্য হত। বেশীর ভাগ মেয়ে নেওয়া হত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাড়া থেকে। এ ছাড়া ইহুদি, জার্মান, ইতালিয়ান, মুসলমান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের মনোনীত করা হত। তখনকার যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রীরা, যথা—সীতা দেবী (মিস রেনি স্মিথ), পেশেন্স কুপার, ললিতা দেবী (মিস বনি বার্ড), সবিতা দেবী, ইন্দিরা দেবী (নির্বাক 'কপালকুণ্ডলা' ছবিতে নাম-ভূমিকায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন) এঁরা সবাই ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে।

আরও একটি বিশেষ কারণে বাঙালি মেয়েদের পারতপক্ষে নেওয়া হত না। সেটা হল তাদের অত্যধিক জড়তা ও লজ্জা, যেটা অন্য জাতের মেয়েদের ছিলই না বলা চলে। আমি নিজে দেখেছি, অজ পাড়াগেঁয়ে গরীবের ঘরের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, কিন্তু তিনি কিছুতেই খালি গায়ে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরতে রাজি হলেন না, পরলেন ফরসা শাড়ি ব্লাউজ। তারপর অভিনয়। ধরুন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা প্রণয়-নিবিড় দৃশ্য। স্বামী বেচারী হয়তো আদর করে একটু কাছে টেনে নিতে চান,স্ত্রী কিন্তু কাঠ হয়ে সেই এক-হাত ব্যবধান থেকেই তোতা পাখির মতো বইয়ের কথাগুলো আউড়ে গেলেন। ফিরিঙ্গি মেয়েদের বেলায় ঠিক এর বিপরীত। শুধু বলে দিলেই হল যে, এটা প্রেমের বা রোমান্টিক সিন। তারপর বেচারী নায়কের প্রাণান্ত ব্যাপার।

আবার শুটিং-এর ডাক পড়ল। এবার দৃশ্যটি হচ্ছে, পরদিন সকালবেলা। ময়লা একটা গেঞ্জি গায়ে চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছি, ধীরে ধীরে স্ত্রী এসে পাশে দাঁড়ালেন। কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইলাম। 'ইজ দেয়ার এনি হ্যাপি নিউজ?'

আমি—'নাঃ, যাও বা একটা ছিল, পাঁচশ টাকা সিকিউরিটি জমা দিতে হবে।'

স্ত্রী—'ডোন্ট ওয়রি ডার্লিং। ভেরি সুন দি ক্লাউডস উইল পাস।'

গোয়ালা দুধের তাগাদায় বাইরে কড়া নাড়ল। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। রোদ্দুর কমে গেছে বলে শুটিং এইখানেই শেষ করতে হল। পরিচালকমশাই বলে দিলেন,'কাল আউটডোর শুটিং, সকাল ঠিক ছ'টায় গাড়ি যাবে।' মেক-কাপ তোলার কোনো বিশেষ বালাই নেই। কাপড়-চোপড় ছেড়ে বাড়ি চলে এলাম।

ভোরে উঠে স্নান সেরে গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছি, গাড়ি এল ঠিক সাতটায়। উঠতে যাব, দেখি গাড়ির ভিতর অর্ধেক জায়গা জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো রং-বেরঙের ঘুড়ি আর সুতো ভর্তি প্রকাণ্ড একটা লাটাই। গাঙ্গুলীমশায়ের অ্যাসিস্টেন্ট মুখার্জির দিকে চাইতেই সে বলল, 'ঐ জন্যই তো আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।' বললাম, 'কিন্তু ব্যাপার কী?'

সব কথায় একটু রহস্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দেওয়া মুখার্জির স্বভাব। বলল, 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। একটু পরেই সব বুঝতে পারবে।' অগত্যা কৌতূহল চেপে চুপচাপ বসে রইলাম। গাড়ি রসা রোড ধরে উত্তরমুখো চলতে শুরু করল। একটু পরেই হঠাৎ ডাইনে জাস্টিস দ্বারকানাথ রোডে ঢুকে পড়ে একটু গিয়েই নর্দার্ন পার্কের আগে দাঁড়াল। কিছু দূরে আর একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে, আর তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন পরিচালক গাঙ্গুলীমশাই ও ক্যামেরাম্যান যতীন দাস। নামতে যাব, মুখার্জি হাত চেপে ধরে বলল, 'যেমন আছ অমনি চুপচাপ বসে থাকো।' কিছু বলবার আগেই মুখার্জি

গাড়ির দরজা খুলে নেমে তাড়াতাড়ি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিন জনে কী যেন পরামর্শ হল, তারপর গাঙ্গুলীমশাই দেখলাম আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন।

কাছে এসে বাইরে থেকে গাড়ির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে চুপিচুপি বললেন, 'শোন ধীরাজ, সিনটা একটু মাথা খাটিয়ে চালাকি করে নিতে হবে।'

একটা সিন নিতে কী এত মাথা খাটানো বা চালাকির দরকার, আমার অল্প কদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝে উঠতে পারলাম না। গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'সিনটা নেওয়া হবে নর্দার্ন পার্কের ভিতর। দৃশ্যটা হল, তোমার শ্বশুর জোর করে তোমার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে এসেছেন নিজের বাড়িতে। একমাত্র আদরের মেয়ে কিশোরী তোমার মতো অপদার্থের হাতে পড়ে চরম দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিন কাটাবে, এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। তুমি বাড়িতে এসে শুনলে, তোমার স্ত্রী-পুত্রকে জোর করে শ্বশুর নিয়ে গেছেন। তখন তুমি পাগলের মতো ছুটলে শ্বশুরবাড়িতে ওদের ফিরিয়ে আনতে। শ্বশুরমশায়ের অবস্থা খুব ভাল। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, গেটে লাঠি হাতে হিন্দুস্থানী দারোয়ান। দারোয়ানের উপর কড়া হুকুম ছিল, তাই তুমি ভিতরে ঢুকতে পারলে না। তারপর দু'তিন বছর কেটে গেছে। অনেকবার শ্বশুরবাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করেও কোনও ফল হয়নি। অনেক কষ্টে আশেপাশের লোকের কাছ থেকে খবর নিয়ে তুমি জানতে পারলে, রোজ বিকালে বেয়ারার সঙ্গে তোমার ছেলে এই পার্কে বেড়াতে আসে।'

চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললাম, 'কিন্তু আমার ছেলে কোথায়, আর সাজবেই বা কে!'

নর্দার্ন পার্কের ঠিক উত্তরে একটি প্রকাণ্ড বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'ছেলে ঐ বাড়ির।'

বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, 'কিন্তু আগে যে ছেলেটিকে স্টুডিওয় দেখেছিলাম—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, ' ভুলে যাচ্ছ কেন? তারপর প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। এখন চাই একটি বড়সড় বছরসাতেকের ছেলে আর চেহারাটাও বেশ নাদুসনুদুস হওয়া চাই। ধনী দাদামশায়ের ওখানে ঘি-দুধ খেয়ে খেয়ে বেশ—'

হঠাৎ চুপ করে উত্তর দিকের ঐ বাড়িটার দিকে চাইলেন গাঙ্গুলীমশাই। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি সদর দরজা খুলে একটি চাকর আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কী কথা হল গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে শুনতে পেলাম না। তক্ষুনি গাড়ির দরজা খুলে চকিতে একবার চারদিক দেখে নিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'চট করে এর সঙ্গে ঐ বাড়িটায় ঢুকে পড়।' কার বাড়ি, আমি কেন ঢুকব, এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি। একরকম ঠেলে দিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'যাও দেরি কোরো না, কেউ দেখে ফেললে মুশকিল হবে।'

এদিকে আমার মুশকিলটা গাঙ্গুলীমশাই দেখলেন না। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-জামা পড়ে একমুখ দাড়ি আর রুক্ষ চুল নিয়ে অত বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার দাখিল। শেষ চেষ্টার মতো ক্ষীণ আপত্তির সুরে তবুও একবার বললাম, 'আমি না হয় গাড়িতেই থাকি।'

গর্জন করে উঠলেন গাঙ্গুলীমশাই, 'না, যা বলছি তাই কর।'

রাশভারি লোক, তার উপর প্রকাণ্ড জোয়ান চেহারা। রাগলে ভয়ানক দেখায়। আর দ্বিরুক্তি করবার সাহস হল না। যা থাকে কপালে, চাকরটার সঙ্গে ঐ অজানা রহস্যপুরীতে ঢুকে পড়লাম।

ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ করে দিল চাকরটা। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে দেখি বেয়ারার পোশাক পরে মাথায় পাগড়ি চাপিয়ে সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছে মুখার্জি। সামনে আর একটা সোফায় বসে আছে একটি বছর ছয়-সাতের আবলু-গাবলু ছেলে, দেখলেই মনে হয় বড়লোকের ঘি-দুধ খাওয়া আদুরে ছেলে, বোকা-বোকা মুখখানা। ম্যাডান স্টুডিওর খাটে-শোওয়া, জ্বরে-ভোগা মুসলমান ছেলেটির তিন-চার বছরের মধ্যে এ রকম বিস্ময়কর পরিবর্তন একমাত্র সিনেমাতেই সম্ভব। দেখলাম ওর মেক-আপ হয়ে গেছে। প্রথমে মুখে খানিকটা ভেসলিন মাখিয়ে নিয়ে তার উপর পাউডার, তারপর ভুসো কালি দিয়ে চোখ-ভ্রূ আঁকা। সব শেষে আলতার শিশি থেকে একটুখানি আঙুলে লাগিয়ে নিয়ে ঠোঁটে দেওয়া। বলা বাহুল্য অধুনাবিখ্যাত ম্যাক্স ফ্যাক্টরের মেক-আপ, লিপস্টিক, ব্রাউন ব্ল্যাক পেন্সিল এসবের সৃষ্টি তখনও হয়নি। আর হলেও আমেরিকা থেকে সুদূর কলকাতায় সবেধন নীলমণি ম্যাডান স্টুডিওতে, তার অস্তিত্ব তখন আমাদের অজ্ঞাত ছিল। মেক-মাপম্যান আসেনি, মুখার্জি ছেলেটিকে মেক-আপ করে দিয়েছে। ছেলেটির কিছুদূরে ঈষৎ অন্ধকারে আর একখানা সোফায় দেখলাম ছোট ছেলেটির বৃহৎ সংস্করণ প্রিয়দর্শন একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ভদ্রলোক বসে বসে পা দোলাচ্ছেন আর পরম তৃপ্তিতে গড়গড়া টানছেন। মুখার্জি আলাপ করিয়ে দিল, 'ধীরাজ, ইনিই এই বাড়ি আর এই ছেলেটির মালিক, নাম শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল। রাজশাহী জেলার পুঠিয়া স্টেটের ছোট তরফের বড়বাবু, আর এটি ওঁরই ছেলে শ্রীমান দীপ্তেন সান্যাল। সিনেমার ছোঁয়াচ লেগে কিনা জানি না, পরবর্তী জীবনে এঁরা দুজনেই স্বনামধন্য। সুধীরবাবু অধুনা বিখ্যাত প্রচার-সচিব ও শ্রীমান দীপ্তেন 'অচলপত্রে'র মাধ্যমে বিখ্যাত।

পরস্পর নমস্কারান্তে বসতে যাব, কানে এল, 'কামাননি কদ্দিন?' বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম, 'আজ্ঞে?'

তেমনি গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানতে টানতে সুধীরবাবু বললেন, 'দাড়ি-গোঁফ কামাননি কতদিন হল?'

বললাম, 'তা প্রায় মাস-দুই হবে।'

'—তা ওরকম উজবুকের মতো একগাল দাড়ি-গোঁফ আর মাথায় একঝুড়ি রুক্ষ চুলের বোঝা নিয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে মেক-আপের চুল দাড়ি নিলেই তো হয়।'

মনে মনে রেগে গেলাম। প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতেই ভদ্রলোক এমন মেজাজে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন, যেন উনি মনিব আর আমি ওঁর খাস তালুকের প্রজা। উত্তর দেব কিনা ভাবছি, প্রাণখোলা হাসির আওয়াজে মুখ তুলে চেয়ে দেখি গড়গড়ার নল হাতে ভুঁড়ি দুলিয়ে সোফায় বসে হাসছেন সুধীরবাবু। চোখে চোখ পড়তেই বললেন, 'রাগ কোরো না ভাই, এটা আমার একটা বিশেষ দোষ। চেষ্টা করেও আমি বেশিক্ষণ গম্ভীর হতে পারিনে। সেইজন্য দেখ না, জমিদারী দেখাশোনা করে ছোট ভাই। সে বেশ গম্ভীর আর রাশভারি ছেলে। আর আমি সেই টাকায় তোফা খেয়েদেয়ে আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি।'

সত্যিই ভাল লাগল সুধীরবাবুকে। বড়লোক হয়েও এমন সহজ সাদাসিধে রসিক লোক কমই দেখেছি। মনের মেঘ কেটে গেল। বললাম, 'মেক-আপ সম্বন্ধে কী বলছিলেন?'

'—ও হো হো, এই দেখ আসল কথাটাই ভুলে গেছি। বলছিলাম যে, অত কষ্ট করে দাড়ি না রেখে তৈরি করে নিলেই তো হয়।'

বললাম, 'আমাদের ছবির এখন যাকে বলে শৈশবাবস্থা। মেক-আপ জিনিসটার আইডিয়াই ভাল করে নেই। যা দু-একখানা ছবি দেখেছি, তাতে পরচুলো আর তৈরি দাড়ির যা নমুনা দেখেছি, তার চেয়ে কষ্ট করে দাড়ি রাখা অনেক ভাল।' আমাদের এই আলোচনার মধ্যেই একটি বছর-চব্বিশের ফরসা মহিলা এসে সুধীরবাবুর কাছে দাঁড়ালেন। পরনে লাল পাড় গরদের শাড়ি, এলো চুল। সৌম্য স্নিগ্ধ মুখে তৃপ্তির হাসি, কপালে চন্দনের ফোঁটা। বুঝলাম সদ্য পূজার ঘর থেকে আসছেন। সুধীরবাবু বললেন, 'ইনি হলেন এই বাড়ির যথার্থ কর্ত্রী। শুধু বাড়ি কেন, এ বাড়িতে যে কটি প্রাণী বাস করে তাদেরও, ইনক্লুডিং মী, ইনি হচ্ছেন—'

বললাম, 'বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি।' উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললাম, 'নমস্কার বৌদি।'

সেদিনের সেই সামান্য শুটিংকে উপলক্ষ করে এই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার যে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম পরবর্তীকালে তা গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আজও তা অটুট আছে। শুধু ছন্দপতনের মতো সাত বছর আগে বৌদির অকালমৃত্যু একটু বিষাদের ছায়া এনে দেয়।

নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বৌদি বললেন, 'বসুন, বসুন। আজ আপনাদের শুটিং দেখব, কখনো দেখিনি। ওমা, কেলুধনের মেক-আপ হয়ে গেছে দেখছি!'

শ্রীমান দীপ্তেনের ডাকনাম কেলু বা কেলো। বাপ-মায়ের চেয়ে গায়ের রং বেশ দু-তিন ডিগ্রী কম বলে, না অন্য কারণে ঠিক বলতে পারব না।

আমার দিকে ফিরে বৌদি বললেন, 'ও কিন্তু ভীষণ নার্ভাস। শেষকালে আপনাদের ছবি না নষ্ট করে দেয়।'

প্রায় কাঁদকাঁদ সুরে কেলু বলে উঠল, 'তুমি কিন্তু কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে মা, নইলে আমি ছবিতে প্লে করব না।'

চৌকশ মুখার্জি অনেক বোঝাল, কোনো ফল হল না। অগত্যা ঠিক হল শুটিং-এর সময় সামনের পার্কে কেলোর সামনে, মানে ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে, বৌদি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

মুখার্জি আমায় দৃশ্যটা যা বুঝিয়ে দিল তা হল এই, আমার শ্বশুরবাড়ির বেয়ারার সঙ্গে ছেলে রোজ বিকালে পার্কে খেলা করতে আসে। ছেলেবেলা থেকেই ঘুড়ি আর লাটাইয়ের উপর ওর অদম্য ঝোঁক। তাই অনেক কষ্টে পয়সা যোগাড় করে তা দিয়ে কয়েকখানা ঘুড়ি আর লাটাই কিনে চোরের মতো ছেলের সঙ্গে পার্কে দেখা করতে এসেছি আমি। গাড়ির মধ্যে ঘুড়ি লাটাই-এর রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হল। একটা জিনিস তখনও পরিষ্কার হয়নি। বললাম, 'ছবি তুলবে, তা এত লুকোচুরি হাশহাশ কেন?'

বেয়ারার পোশাকে বেমানান হলেও বিজ্ঞের হাসি হেসে মুখার্জি বলল, 'ভাই ধীরাজ, মাত্র কদিন এ লাইনে এসেছ তাই বুঝতে পারছ না, আমি আর গাঙ্গুলীমশাই কত মাথা খাটিয়ে এ সিনটা নেবার ব্যবস্থা করেছি। শোন, যদি পার্কে প্রকাশ্যে ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তুলতে শুরু করি, দেখতে দেখতে ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে যাবে আর সেই অগুনতি জনতাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত ছবি তোলা অসম্ভব। এই সিনটা হলো বইয়ের মধ্যে সবচাইতে ইম্পর্ট্যান্ট ও ইমোশনাল সিন। যাক, তোমায় যা করতে হবে শোন। গাড়ি করে আমরা তোমায় পার্কের দক্ষিণ দিকের গেটের কাছে নামিয়ে দেব। ছেলেটি উত্তরের গেটের কাছে ফুটবল নিয়ে খেলা করছে।' 'ফুটবল! ফুটবল আমি খুব ভাল খেলতে পারি, না মা?' বুঝলাম কেলুর একমাত্র সাক্ষী ও সমঝদার হলো মা।

মুখার্জি বলল, 'দক্ষিণ দিকের গেট দিয়ে ঢুকে চারদিকে তুমি খুঁজে দেখছো তোমার ছেলেকে। হাতে রয়েছে দু'তিনখানা রঙিন ঘুড়ি আর সুতো ভর্তি লাটাই।'

সবে এসে যাওয়া ঘুমের মাঝখানে ছারপোকার কামড়ের মতো কুটকুট করে বলে উঠল কেলো, 'ঘুড়ি লাটাই সব আমায় দিয়ে দেবে তো মা?'

বিরক্ত হয়ে বৌদি ধমকে উঠলেন, 'আঃ, সব কথায় কথা কইতে তোমায় না মানা করেছি কেলু?'

মুখার্জি বলে চলল, 'ঘুড়ি আর লাটাই-এর লোভ দেখিয়ে ওকে নিয়ে বসবে তুমি উত্তর দিকের পাঁচিলের গা ঘেঁষে যে কাঠের বেঞ্চিখানা পাতা রয়েছে তার উপর।'

কৌতূহল বেশ বেড়ে গিয়েছিল। বললাম, 'তারপর মুখুজ্যে?'

সিনেমা সম্বন্ধে নিজের বিদ্যা বুদ্ধি জাহির করার এরকম সুযোগ ছাড়তে মুখার্জি মোটেই রাজি নয়। ঘরসুদ্ধ সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুরু করল, 'তারপর? তারপর ঐ বেঞ্চিতে বসে খোকার হাতে ঘুড়ি লাটাই সব দিয়ে ওকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বলবে, খোকা, তুমিও যেন আমার মতো পলকা সুতোয় ঘুড়ি উড়িও না বাবা। ঠিক এমনি সময় দূর থেকে খোকার উড়ে বেয়ারা, মানে আমি, দেখতে পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে খোকার হাত থেকে ঘুড়ি লাটাই ছুঁড়ে ফেলে দেবো মাটিতে। তারপর তোমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে খোকাকে কোলে করে বাড়ি চলে যাব।'

'আর ফুটবল? বা রে, ফুটবলটা ফেলে যাব নাকি?' অবাক হয়ে বলে উঠল কেলো।

সবাই হেসে ফেললাম। মুখুজ্যে বলল,' সত্যিই খোকা আমার একটা ভুল ধরেছে। ফুটবলটা মাটি থেকে আমিই কুড়িয়ে নিয়ে যাব।'

দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দিতেই দেখলাম স্টুডিওর গাড়ির ড্রাইভার রামবিলাস। মুখুজ্যেকে চুপি চুপি বলল, 'ধীরাজবাবুকে গাঙ্গুলীমশাই ডাকছেন।'

রামবিলাস চলে যেতেই দরজা ঈষৎ ফাঁক করে উটের মতো গলা বাড়িয়ে মুখুজ্যে বাইরের রাস্তার এধার-ওধার দেখে নিয়ে আমায় বলল, 'যাও, চট করে গাড়িতে উঠে পড়, রাস্তা একদম ফাঁকা।'

কোনো দিকে না চেয়ে একরকম ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। পিছনের সীটে ঘুড়ি লাটাইয়ের মধ্যে একরকম লুকিয়ে বসে আছেন গাঙ্গুলীমশাই, আর ড্রাইভারের সীটের এক পাশে হাতে ঘোরানো ডেবরি ক্যামেরা নিয়ে সামনের কাচ তুলে রেডী হয়ে বসে আছে ক্যামেরাম্যান যতীন দাস। গাড়ি ঘুরে চললো নর্দার্ন পার্কের দক্ষিণ দিকের গেটমুখো। গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'মুখুজ্যের কাছে সিনটা সব বুঝে নিয়েছো তো?' সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। দক্ষিণ গেটের একটু দূরে এসে গাড়ি থামলো। দু'তিনখানা ঘুড়ি আর লাটাইটা আমার হাতে দিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'চারদিক দেখে নাও আগে। লোকজন বেশি থাকলে নেমো না।'

বেলা প্রায় এগারোটা, পথ জনবিরল। গাড়ি থেকে নেমে পার্কে ঢুকে পড়লাম। আমাকে ফলো করে গাড়িখানা আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো পার্কের গা ঘেঁষে। বুঝলাম, যতীন ছবি তুলতে শুরু করে দিয়েছে। দু-চারজন চাকর-বেয়ারা ক্লাসের লোক আর কতকগুলো স্কুল-পালানো ডানপিটে ছেলে ছাড়া পার্কে বিশেষ লোকজন নজরে পড়ল না। ছেলের খোঁজে ওদেরই মধ্যে দিয়ে চারদিক চাইতে চাইতে ঘুড়ি লাটাই হাতে এগিয়ে চলেছি। পার্কের মাঝ বরাবর গিয়ে উত্তর দিকে চেয়ে দেখি কেলুধন ওর সমবয়সী চার-পাঁচটি ছেলের সঙ্গে দিব্বি ফুটবল খেলতে শুরু করে দিয়েছে। কিছু দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন বৌদি, আর বেশ খানিকটা দূরে দু'তিনটে

চাকরের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে মুখুজ্যে।

বেশ একটু উৎসাহের মাথায় সামনে এগিয়ে গেলাম যেখানে কেলুরা ফুটবল খেলছে। একটু দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলটাকে হাতে তুলে নিতেই ছেলেগুলো ভয়ে ভয়ে আমার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। কোনো কথা না বলে খপ করে কেলুর একখানা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললাম পূর্বনির্দিষ্ট বেঞ্চির দিকে। কেলু শুধু বলে চলেছে, 'বা রে, ফুটবলটা নিয়ে নিলে, ঘুড়ি লাটাই দাও!'

কোনো জবাব না দিয়ে বেঞ্চির উপর দু'জনে বসলাম। তারপর ফুটবলটা মাটিতে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে ঘুড়ি লাটাই কেলুর হাতে দিলাম। মুখ দেখে বোঝা গেল ও বিশেষ খুশি হয়নি। বারবার লোলুপ দৃষ্টিতে নীচে ফুটবলটার দিকে দেখতে লাগল। এই অবসরে আড়চোখে দেখে নিলাম ক্যামেরাসুদ্ধ গাড়িটা এসে গেছে উত্তরের রেলিং ঘেঁষে একেবারে আমাদের সামনে। মহা উৎসাহে যতীন হাতল ঘুরিয়ে চলেছে । আর দেরি করা ঠিক হবে না। কেলোকে হঠাৎ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বেশ ইমোশন দিয়ে বলে উঠলাম 'খোকা, তুমি যেন আমার মতো পলকা সুতোয় ঘুড়ি উড়িও না বাবা।'

শেষের কথাটা বলেছি কি বলিনি, দড়াম করে পড়লো এক লাঠি আমার পিঠে। যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি পাঁচ ছ'জন জোয়ান ছেলে লাঠি হান্টার আর হাতের আস্তিন গুটিয়ে ঘুষি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার ঠিক পিছনে।

একজন বলল, 'জানিস রতা, ব্যাটা যখনই ঘুড়ি লাটাই হাতে নিয়ে চোরের মতো চাইতে চাইতে পার্কে ঢুকেছে, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছে। তাড়াতাড়ি সাইকেলটা বার করে সবাইকে খবর দিয়ে এসেছি। ওরা এল বলে।'

কিছু না বুঝতে পেরে অপরাধীর মতো মুখ করে ভয়ে ভয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ওদের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে ভিড় বেড়ে উঠল। একটা ষণ্ডামার্কা ছেলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমার চুলের মুঠো ধরে বেঞ্চি থেকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর সবলে গালে এক চড় মেরে বলল, 'রোজ রোজ ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,। আজ ব্যাটাকে মেরেই ফেলব।'

মেরেই ফেলতো যদি না হঠাৎ ভিড় ঠেলে মুখুজ্যে এসে আমায় আড়াল করে দাঁড়াত। মুখুজ্যে ওদের একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ব্যাপার কী? আপনারা হঠাৎ একে মারধোর করছেন কেন?'

ওদেরই মধ্যে একটু বেশি বয়সের একটা ছেলে ভেংচি কেটে বলে উঠল, 'তুই ব্যাটা উড়ে মোড়লি করতে এলি কেন? বড়লোকের বাড়ির বেয়ারা—মেজাজ দেখ না!'

তাড়াতাড়ি মাথার পাগড়িটা খুলে মুখুজ্যে বেশ নরম সুরে বলল, 'ভাই, বেয়ারা আমি নই, সেজেছি।'

আর যায় কোথায়! সবাই একসঙ্গে হৈহৈ করে উঠলো, 'দেখলি পানু? আমি বলেছি ওরা একা আসে না, দলবল নিয়ে আসে।'

দু'তিনটে ছেলে একরকম মুখুজ্যেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমার শতচ্ছিন্ন তালি দেওয়া জামাটার কলার চেপে ধরল। ঠিক এমনি সময়ে ত্রাণকর্তার মতো দামী গরম স্যুট পরা, লম্বা, সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘকায় গাঙ্গুলীমশাই দু'হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের দলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হয়েছে কী, এত ভিড় কেন?'

প্রায় দু'তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, 'আপনিই বিচার করুন তো মশাই, আজ দু'তিন দিন ধরে আমাদের পাড়ায় ছেলেধরার উৎপাত শুরু হয়েছে। দুটো ছেলে এই পার্ক থেকে চুরি গেছে। একটা পাওয়া গেছে, আরেকটার কোনো পাত্তাই নেই। তাই আমরা পাড়ার ছেলেরা ঠিক করেছি পালা করে পাহারা দেব। দেখি ছেলেধরার উৎপাত বন্ধ করতে পারি কিনা। আজও সকাল থেকে ঘরের খড়খড়ি তুলে পল্টু সাতটা থেকে ডিউটি দিচ্ছিল। হঠাৎ ও দেখে ছেলে ভোলাবার জন্য দু'তিনখানা রঙিন ঘুড়ি ও লাটাই নিয়ে এই ব্যাটা চোরের মতো চারদিকে চাইতে চাইতে পার্কে ঢুকে যেখানটায় ছেলেগুলো ফুটবল খেলছে, সেইদিকে এগোচ্ছে। ব্যস, ও তখনই সাইকেলে করে দলের সবাইকে খবরটা দিয়ে দেয়। আজ যখন হাতেনাতে ধরেছি তখন আগে মেরে ব্যাটাকে আধমরা করব, তারপর পুলিশে দেব।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হৈহৈ করে সবাই মারবার জন্য এগিয়ে এল। হাত তুলে থামিয়ে দিলেন গাঙ্গুলীমশাই। তারপর বললেন, 'তোমাদের ভুলটা ভেঙে দিতে আমার সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু না দিয়েও উপায় নেই। যাকে তোমরা ছেলেধরা মনে করে মারধোর করছ, সে হচ্ছে আমার 'কালপরিণয়' ছবির নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য। ছবিতে ঠিক এমনি একটা ঘটনা আছে, তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি-চুপি সিনটা নিচ্ছিলাম, যাতে খুব ন্যাচারাল হয়। সিনটা আমার প্রায় তোলা হয়ে গিয়েছিল। আর একটু হলেই—'

পাশ থেকে মুখুজ্যে বলল, 'আর এখানে নয়। বাকি সিনটা স্টুডিওতে একটা বেঞ্চি দিয়ে ক্লোজ-শটে নিলেই চলবে। চলুন যাওয়া যাক।'

ছেলের দলের সন্দেহ তখনো পুরোপুরি যায়নি বুঝতে পেরে ক্যামেরাসুদ্ধ যতীনকে ডেকে ওদের দেখিয়ে সমস্ত সিনটা বলে গেলেন।

হঠাৎ মুখুজ্যে বলে উঠল, 'কেলু? কেলো কোথায়? আর ঘুড়ি, লাটাই, ফুটবল এগুলোই বা গেল কোথায়?'

চেয়ে দেখলাম নিজেদের বাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে ফুটবল, ঘুড়ি, লাটাই, সব দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মিটমিট করে হাসছে কেলুধন, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সুধীর ও বৌদি।

বেশ বুঝতে পারলাম ছেলের দল খুব নিরুৎসাহ হয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে আমায় ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে পথ করে ভিড় ঠেলে সবাই গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

স্টুডিওতে মালপত্র ক্যামেরা নামিয়ে গাঙ্গুলীমশাইকে বাড়িতে ছেড়ে গাড়ি আমার বাড়ির কাছে এলে নামতে নামতে মুখুজ্যেকে বললাম, 'তুমি আর গাঙ্গুলীমশাই অনেক মাথা খাটিয়ে যে ফন্দিটা করেছিলে, তাতে আমার পৈতৃক মাথাটা যেতে বসেছিল।'

কিছুমাত্র দুঃখিত বা লজ্জিত না হয়ে মুখুজ্যে জবাব দিল, 'ছবির নায়কের পক্ষে এসব কিছুই নয়, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।'

কোনো উত্তর দেবার আগেই দেখি গাড়ি বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। অবাক হয়ে চলমান গাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কালপরিণয়' ছবির আর এক দিনের আউটডোর শুটিং-এর কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। দৃশ্যটা হল, সারাদিন চাকরির চেষ্টায় এ-আফিস সে-আফিস ঘুরে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে বাড়িতে এসে শুনি, আমার স্ত্রী-পুত্রকে ধনী শ্বশুর একরকম জোর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছেন। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তখনই হেঁটে চললাম শ্বশুরবাড়ি। শেয়ালদার মোড় থেকে সোজা পশ্চিমমুখো হ্যারিসন রোড ধরে কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত ঐভাবে জোরে হেঁটে যেতে হবে।

মুখার্জি বলে দিল, 'তুমি কোনো দিকে না চেয়ে সোজা ভিড় ঠেলে ডান দিকের ফুটপাথ দিয়ে চলে যাবে, আমরা গাড়ির মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাথের গা ঘেঁষে তোমায় ফলো করে যাব। কেউ জানতেই পারবে না যে, ছবি তোলা হচ্ছে।'

সেদিনের পিঠের ব্যথাটা তখনও মিলিয়ে যায়নি। বললাম, 'মুখুজ্যে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুখুজ্যে বলল, 'সেদিনকার দৃশ্য আর আজকের দৃশ্যে অনেক তফাত। সেদিনকার দৃশ্যটা তোলায় বিপদ ছিল। আজ শুধু ভিড় ঠেলে রেগে জোরে জোরে হেঁটে যাওয়া।'

অগত্যা তাই ঠিক হল। একে ঐ রকম পাগলের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ, তার উপর রেগেছি। দু'হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছি, দু'একজন বিরক্ত হয়ে বেশ শক্ত দু'চার কথা শুনিয়েও দিল। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু সামনে এগিয়ে চলা।

আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হতেই কানে এল, 'কে, ধীরাজ না?'

মনে মনে প্রমাদ গণলাম। কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এবার বেশ কাছ থেকেই প্রশ্ন হল, 'ঠিক দুপুরবেলায় এমন ভাবে কোথায় চলেছিস?'

কোনও দিকেই না চেয়ে জবাব দিলাম, 'শ্বশুরবাড়ি।'

'— শ্বশুরবাড়ি! তুই আবার বিয়ে করলি কবে? বেশ বাবা, তিন মাস কলকাতায় ছিলুম না, এই ফাঁকে বিয়ে করে আমাদের ফাঁকি দিলি তো?'

প্রশ্নকর্তা আমার সহপাঠী নির্মল বোস। মাসতিনেক হল এলাহাবাদে মামার

বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। দিন দুই হল কলকাতায় ফিরেছে। নির্মল নাছোড়বান্দা। বেঁটে লোক, আমার সঙ্গে অত জোরে হেঁটে পারবে কেন? একরকম ছুটেই সঙ্গে সঙ্গে চলল। '— কই, জবাব দিচ্ছিস না কেন?'

'—কী জবাব দেব? বড়লোক শ্বশুর জোর করে আমার স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে গেছে। সেইখানে একটা হেস্তনেস্ত করতে যাচ্ছি।'

বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে তুলে হাত ধরে আমায় একরকম জোর করে দাঁড় করিয়ে নির্মল বলল, 'ছেলে! তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করে তোর ছেলে হয়েছে? গাঁজা-টাঁজা খাচ্ছিস নাকি? তা, চেহারাখানা যা করেছিস, তাতে তো তাই মনে হয়।'

কলেজ স্ট্রীটের মোড় তখনো খানিকটা বাকি আছে, হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম, আজ গাঙ্গুলীমশাই আর মুখুজ্যের কাছে নির্ঘাত বকুনি খাব। দৃশ্যটা এভাবে নষ্ট হয়ে গেল!

সামনের গাড়ি থেকে গাঙ্গুলীমশাই আর মুখুজ্যে হাসতে হাসতে নেমে এলেন। আমি তো অবাক। গাঙ্গুলীমশাই কাছে এসে পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ভেরি গুড! আজকের সিনটা খুব ভাল হয়েছে। আমি এতটা আশা করিনি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কিন্তু আমার এই বন্ধুটি প্রায় সারা পথটা প্রশ্ন করতে করতে এসেছে।'

মুখুজ্যে বলল, 'সেটা আরও ভাল হয়েছে। তোমরা যদি ক্যামেরার দিকে চেয়ে ফেলতে তাহলে সব মাটি হয়ে যেত। ছবির নায়ক মণীন্দ্র কলেজে-পড়া শিক্ষিত ছেলে। তাকে রাস্তা দিয়ে ওভাবে পাগলের মতো হাঁটতে দেখে তার দু-একজন সহপাঠী বা বন্ধুর প্রশ্ন করাটা স্বাভাবিক। বরং পাবলিক কারুর সঙ্গে দেখা না হলে সেইটেই আনন্যাচারেল হতো।' বাঁচা গেল। বেচারী নির্মল! সব শুনে সে এমন বোকা বোকা চোখে আমাদের দিকে চেয়ে রইল যে, না হেসে পারলাম না।

এই ঘটনার পর মাসখানেক কী কারণে জানি না 'কালপরিণয়' ছবির শুটিং বন্ধ ছিল। এরই মধ্যে একদিন ৫ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট, নিউ সিনেমার সামনে ম্যাডান কোম্পানির আফিসে গিয়ে শুনি, জার্মানি থেকে ফিল্ম শিল্পে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছেন মধু বোস। ম্যাডান কোম্পানির হয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'মানভঞ্জন'-এর চিত্ররূপ দেবেন। কিন্তু নায়ক গোপীনাথের ভূমিকা কাকে দেবেন, এই নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছেন। আফিসের সর্বময় কর্তা রুস্তমজী মধু বোসের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, আমিই নায়ক গোপীনাথের ভূমিকায় মনোনীত হলাম। আমার বিপরীতে নায়িকা গিরিবালার জন্যে নির্বাচন করা হল একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে, নাম মিস বনি বার্ড। বাংলা নাম, অর্থাৎ ছায়াচিত্রের নাম হল ললিতা দেবী।

মহা সমারোহে সিনারিও লেখবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। দেখলাম, মধু

বোস ছাপার বই-এ ডায়ালগের নীচে লাল পেন্সিলে দাগ টেনে সিনারিও করার পক্ষপাতী নন। সপ্তাহ দুই-এর মধ্যে সিনারিও শেষ হয়ে গেল, ডাক পড়ল রিহার্সালের। প্রথমেই চমকে উঠলাম, নির্বাক ছবিতে আবার রিহার্সাল কী রে বাবা! জার্মানি-ফেরতা ডিরেক্টর, প্রতিবাদ করবে কে? রোজ রিহার্সালে যাই, বেলা চারটে পাঁচটা পর্যন্ত বসে বসে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর সংলাপ আউড়ে, সিনের পর সিন রিহার্সাল দিয়ে, চা-টোস্ট-ডিমের সদ্ব্যবহার করে বাড়ি চলে আসি। হঠাৎ শুনি, ছবির নাম পাল্টে গেছে, নায়িকার নাম অনুসারে ছবির নাম হয়েছে 'গিরিবালা'।

একদিন সন্ধ্যেবেলা রিহার্সাল দিয়ে ফিরতেই বাবা ডেকে পাঠালেন। কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, বাবা বললেন, 'ধীউ বাবা, দু'খানা ভাল ছবিতে তুমি নায়কের ভূমিকা পেয়েছ। ভাল কথা। কিন্তু ওঁরা এর জন্যে পারিশ্রমিক কী দেবেন না দেবেন, সে সম্বন্ধে কোনও কথা হয়েছে কি?'

ভারি লজ্জা পেলাম। সত্যি, নায়ক হবার স্বপ্নে এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওদিকটার কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।

বললাম, 'না বাবা, 'কালপরিণয়' ছবিতে নামবার সময় টাকার প্রশ্নই ওঠেনি। কেননা, আমি ভাবতেই পারিনি যে, অত সহজে মুলান্ড সাহেব আমার রেজিগনেশান অ্যাকসেপ্ট করবেন। তারপর 'গিরিবালা' ছবিটাও হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল। আমি কালই গাঙ্গুলীমশাই আর মিঃ বোসকে জিজ্ঞাসা করবো।'

পরদিন আফিস, মানে ৫ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে যেতেই গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রুস্তমজী সাহেবের কাঁচের পার্টিশন দেওয়া ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। নমস্কার করে আমার বক্তব্য বিষয় তাঁর কাছে নিবেদন করলাম।

একটু চুপ করে থেকে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'শোনো ধীরাজ, একটা কথা তোমার জানা দরকার। ছবিতে নেমেই নায়কের চান্স পাওয়াটা ভাগ্যের কথা, পারিশ্রমিকের প্রশ্নই ওঠে না। বহু সুশ্রী বড়লোকের ছেলে নায়কের জন্য লালায়িত, এমন কি তার জন্য বেশ কিছু আমাকে অফারও করেছে। সেসব চিঠিপত্তর, ফটো আমার আফিস ঘরের ড্রয়ারের মধ্যে রয়েছে। দেখতে চাও?'

বেশ একটু দমে গিয়ে বললাম, 'না না, আপনার কথাটাই যথেষ্ট।'

—'তবুও তোমার সব কথা মুখুজ্যের কাছে শুনে আমি সমস্ত ছবিটার জন্যে তোমার পারিশ্রমিক ঠিক করে দিয়েছি দেড় শ' টাকা। এইমাত্র সাহেবের সঙ্গে সেই কথাই পাকা করে এলাম।'

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। এত বড় বিরাট চেহারার মতো হৃদয়টাও বড় না হলে মানুষ সত্যিই বড় হতে পারে না।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজ বের করে পেন্সিল দিয়ে তাতে কী লিখলেন গাঙ্গুলীমশাই, তারপর কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এইটে নিয়ে

ক্যাশিয়ারের কাছে গেলেই তিনি তোমায় পঞ্চাশ টাকা দেবেন। পরে দরকার হলে কিছু কিছু করে নিও।'

দেহে মনে একরকম লাফাতে লাফাতে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে রিহার্সাল রুমে ঢুকে পড়লাম। মধু বোস তখনও এসে পৌঁছননি।

ঘর ভর্তি অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল, তারই মধ্যে দিব্যি আরামে চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন অধুনা বিখ্যাত পরিচালক-অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র। একটু অবাক হয়ে বললাম, 'নরেশদা আপনি!'

এখানে বলে রাখা দরকার, 'কালপরিণয়' ছবিতে একটি দুর্ধর্ষ ভিলেন চরিত্রে রূপ দিচ্ছিলেন নরেশদা। এবং অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় শিক্ষার ভারও ছিল নরেশদার উপর। আমার অভিনয় শিক্ষার হাতেখড়ি নরেশদার কাছ থেকেই।

জবাব না দিয়ে আমার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগলেন নরেশদা। একটু পরে ঘরসুদ্ধ সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন, 'ধীরাজ, তুমি মদ খাও?'

স্তম্ভিত, বজ্রাহত হয়ে গেলাম। এ কী প্রশ্ন! মদ খাওয়া দূরের কথা, যারা খায় তাদের পর্যন্ত মনে মনে ঘৃণা করি তখন। সব জেনেও এ কী প্রশ্ন করলেন নরেশদা? জবাব দিলাম না, দেবারও কিছু ছিল না।

আবার প্রশ্ন, 'অস্থানে-কুস্থানে, মানে মেয়েমানুষের বাড়ি যাওয়া-টাওয়া অভ্যাস আছে?'

গুরুর মতো শ্রদ্ধা ও মান্য করি নরেশদাকে। তাছাড়া, অল্প কয়েকদিনের মাত্র আলাপ, ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি তখন। সত্যিই ব্যথা পেলাম।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বোধহয় নরেশদা কাছে ডেকে বসালেন। তারপর বললেন, 'না হে, অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। 'গিরিবালা' ছবিতে আমাকে মিঃ বোস দিয়েছেন তোমার একটি বন্ধুর ভূমিকা। আমার একমাত্র কাজ হলো তোমাকে মদ খেতে শেখানো, মেয়েমানুষের বাড়ি নিয়ে যাওয়া আর রাত্রে বাড়ি ফিরতে না দেওয়া। যে সৎ গুণগুলি না থাকলে সমাজে বড়লোক কাপ্তেন বলে পরিচয় দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে।'

এতক্ষণে নরেশদাকে বোঝা গেল। গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং আমার 'কালপরিণয়' ছবির পারিশ্রমিকের কথা সব নরেশদাকে বললাম। শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন নরেশদা। বললেন, 'পারিশ্রমিকটা একটু কম হয়ে গেল না? দেড় বছরে মাত্র দেড়শ টাকা—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'দেড় বছর! 'কালপরিণয়' ছবি শেষ হতে দেড় বছর লাগবে?'

'হ্যাঁ, যতদিন না 'গিরিবালা' শেষ হয়, ধর মাসতিনেক, গাঙ্গুলীমশায়ের শুটিং বন্ধ থাকবে। তারপর শুরু হয়ে শেষ হতে তাও তিন-চার মাস। হরে দরে সেই দেড় বছরের

ধাক্কা।'

বললাম, 'আচ্ছা নরেশদা, এই যে 'গিরিবালা' ছবিতে মিঃ বোস আমাকে নিয়েছেন, এর জন্যও কিছু দেবেন তো?'

'নিশ্চয়ই—তুমি মিঃ বোসের সঙ্গে কথা বলনি?'

বললাম, 'না।'

একটু চুপ করে থেকে নরেশদা বললেন, 'আজই কথা বলে নিও। আর যদি পারমানেন্ট, মানে মাস-মাইনে করে নিতে পার তো কথাই নেই। এই দ্যাখো না, তোফা মাসের তিন তারিখে এসে মাইনে নিয়ে যাই। ছবি তোমার দেড় বছরে হোক আর দু' বছরে হোক, বয়েই গেল।'

স্বপ্নের সেই সোনার পাহাড়টা চোখের সামনে ভেসে উঠতে না উঠতেই কোথায় মিলিয়ে গেল। বললাম, 'কাকে বলবো নরেশদা?'

'—কেন, গাঙ্গুলীমশাই ইচ্ছে করলে অনায়াসেই করে দিতে পারেন। উনি তো শুধু পরিচালক নন, এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসের (অধুনা মিনার্ভা থিয়েটার) ম্যানেজার । তাছাড়া, মনিবরা কোম্পানির আরও অনেক জটিল বিষয়ে ওঁর পরামর্শ নিয়ে থাকেন।'

পরিচালক মধু বোস ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে সিল্কের শাড়ি পরিহিতা অপূর্ব সুন্দরী একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে। বুঝলাম, ইনি নায়িকা বনি বার্ড ওরফে ললিতা দেবী।

আমার আর নরেশদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মধু বোস বললেন, 'আপনারা বসে আলাপ করুন, আমি একবার রুস্তমজী সাহেবের ঘর থেকে আসছি।'

তিনজনে চুপচাপ বসে আছি। মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবছি, কী কথার সূত্র ধরে কথা আরম্ভ করা যায়। আমারই নায়িকা, কিছু একটা না বলাও অশোভন।

নরেশদাই শুরু করলেন, 'মিস বার্ড, ডু ইউ লাইক ইওর হিরো?'

ললিতা দেবী আমার আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'হি ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম নো ডাউট।'

দুষ্টুমিভরা একটা হাসির কটাক্ষ আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পরম কৌতুকে বসে পা দোলাতে লাগলেন নরেশদা। এতক্ষণ ধরে মনে মনে যা বলব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম সব তালগোল পাকিয়ে গেল। ক্লাস ভর্তি ছেলের সামনে পড়া বলতে না পারা ছেলের মতন লজ্জায় মুখ নীচু করে সামনের কাঠের টেবিলটার একটা কোণ নখ দিয়ে খুঁটতে লাগলাম।

আমার দিকে একটু ঝুঁকে নরেশদা বললেন, 'আলাপ হতে না হতেই এত নার্ভাস হয়ে পড়ছো ধীরাজ, এরপর যখন চুরচুরে মাতাল হয়ে জোর করে বউ-এর কাছ থেকে সিন্দুকের চাবি কেড়ে নিয়ে একরাশ গয়না নিয়ে বেরিয়ে আসবে, তখন কী করবে?'

অবাক হয়ে বললাম,'গিরিবালা'য় আমার এইসব সিন আছে নাকি নরেশদা!'

'—শুধু এই? আমার অমোঘ শিক্ষার গুণে তোমার মতো মুখচোরা লাজুক ছেলে হয়ে উঠেছে একেবারে চৌকশ নামকরা কাপ্তেন। লবঙ্গ নামে একটি মেয়েকে বাঁধা রেখে রাতদিন তার ওখানেই পড়ে থাকো মদে চুরচুর হয়ে। শুধু টাকার দরকার হলেই বাড়ি এসে স্ত্রীকে মারধোর করে যা পাও নিয়ে বেরিয়ে যাও।'

ললিতা দেবীর দিকে চাইতেও সাহস হচ্ছিল না। ফ্যালফ্যাল করে নরেশদার দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

নরেশদা বলেই চললেন, 'একদিক দিয়ে তোমার উপর হিংসে হয় ধীরাজ। সিনেমায় ঢুকতে না ঢুকতেই সীতা দেবী আর ললিতা দেবীর মতো স্ত্রী পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।' মনে হল ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও যেন ফেললেন নরেশদা। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, ললিতা দেবী আমাদের দিকে চেয়ে আছেন একাগ্রভাবে। হয়তো আমাদের আলোচনাটার মর্মোদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করছেন। ঘরের মধ্যে আরও দু'চারজন অভিনেতা, যাঁরা এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরাও উৎকর্ণ হয়ে আমাদের কথাগুলো শুনছেন। ভারি লজ্জা করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, নরেশদাকে থামিয়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। নরেশদা যেন আজ সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন। সে ভাষণ যত দীর্ঘ, যত নিরসই হোক, শেষ না হলে সভাভঙ্গের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আবার তেড়ে শুরু করলেন নরেশদা, 'বয়সে ও অভিজ্ঞতায় তোমার চেয়ে আমি বড়। সেই অধিকারে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। মন দিয়ে শোন, ভবিষ্যতে ভাল হবে। না শোন, দুদিনেই পাঁকে তলিয়ে যাবে।'

ভূমিকা শুনেই বুক কেঁপে ওঠে। চুপ করে নরেশদার পরের কথাগুলো শোনবার জন্য বসে রইলাম।

পেশাদার যাদুকরের মতো দর্শকের কৌতূহল পুরো মাত্রায় জাগিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন নরেশদা। তারপর ধীরে সুস্থে পকেট থেকে এক প্যাকেট ক্যাভেন্ডার সিগারেট বের করে তা থেকে একটা ধরিয়ে দু'তিনটে টান দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'এ লাইনে বড্ড বেশি প্রলোভন। বিশেষ করে তোমার মতো অল্পবয়সের ছেলের পক্ষে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই এ বয়সে সাধারণত প্রেমে পড়বার একটা ঝোঁক আসে, আর সেটা স্বাভাবিক। বাইরে থেকে সে ঝোঁকটা চেষ্টা করলে সামলে নেওয়া যায়। কিন্তু এ লাইনে সেটা সামলে নেওয়ার সুযোগ খুব কম। ধরো, সীতা দেবী বা ললিতা দেবীর মতো মেয়ের সঙ্গে তুমি বেশ জড়াজড়ি করে প্রেমের অভিনয় করে রাতদিন তাদের কথাই ভাবতে শুরু করলে। তোমার আহার-নিদ্রা গেল। এই যে কড়া মনোবিকার, এর একমাত্র প্রতিকার হল দৃঢ় মনোবল আর স্টুডিওর বাইরে গিয়ে ওসব স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে

ফেলে দেওয়া। খুব শক্ত, তবে এ ছাড়া বাঁচবার উপায়ও আর নেই। তাছাড়া, এই সব মেয়ে— সীতা, ললিতা এরা মাকাল ফল। ঐ বাইরে থেকে দেখতেই যা, ভিতরে বিষের ছুরি। ভালবাসা বলে কোনো জিনিস ওদের মধ্যে নেই, শুধু দু'হাতে টাকা লুটতে আর তোমার মতো সুন্দর কচি ছেলেদের হাড়মাস চিবিয়ে খেতেই ওরা এ লাইনে ঢুকেছে।'

নিস্তব্ধ ঘরে বাজ পড়লো যেন। সশব্দে চেয়ারখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ললিতা দেবী। চোখ নাক মুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। নরেশদাও দেখি আমার মতো বেশ ভড়কে গেছেন।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ললিতা দেবী বললেন—

'Mr Mitter, I think you are going too far. I am sorry to let you know that though I cannot speak properly, I can understand Bengali.' (মিঃ মিত্র, আমার মনে হয়, আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, যদিও ভাল বলতে পারি না, তবে বাংলা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি।)

মঞ্চ ও পর্দার পাকা ঝানু অভিনেতা নরেশদা। অনেক রকম অভিব্যক্তি তাঁর বিভিন্ন ভূমিকায় দেখেছি। কিন্তু সেদিনকার ঐ ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া অভিব্যক্তি— তুলনা নেই। চেষ্টা করেও কোনো ভূমিকায় আর কোনোদিন দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

কথা শেষ করে দমকা হাওয়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল 'গিরিবালা'র নায়িকা ললিতা দেবী। মনে হল বুঝি বা আমার জীবন থেকেও। শুধু হিলতোলা জুতোটার খট-খট আওয়াজ খানিকক্ষণ পর্যন্ত সিমেন্টের মেঝেয় প্রতিধ্বনি তুলে আস্তে আস্তে চুপ করে গেল।

পুরোদমে শুটিং চলেছে 'গিরিবালা'র। সকাল ছ'টায় গাড়ি আসে, আটটার মধ্যে লোকেশনে পৌছে মেক-আপ করে প্রস্তুত হয়ে থাকি। বেলা বারোটা পর্যন্ত শুটিং চলে। তারপর সূর্য মধ্যগগনে দেখা দিলে, অর্থাৎ 'টপ সান' (top sun) হয়ে গেলে শুটিং বন্ধ হয়। তখন আমাদের লাঞ্চের ছুটি। আবার দুটো থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত কাজ চলে। রোদের তেজ কমে এলে শুটিংও বন্ধ হয়ে যায়।

'গিরিবালা'র শুটিং-এ আর একটা নতুন জিনিস দেখলাম 'রিফ্লেকটর' বা ঝকঝকা ব্যবহার। আগে শুধু সানলাইটে শুটিং হতো। একটু অন্ধকার জায়গা, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে না, সেখানে বড় বড় আয়না দিয়ে সূর্যের আলো ধরে ফেলা হত। তার ফলে আলোর সমতা রক্ষা হতো না। কেমন যেন ছোপ-ছোপ আলোর এফেক্ট হতো। মধু বোসকেই প্রথম দেখলাম কাঠের বড়, মাঝারি ও ছোট ফ্রেমে সোনালী ও

রূপালী কাগজ এঁটে সূর্যের বিপরীতে ধরে সেই আলো শিল্পী ও লোকেশনের উপর ফেলে ছবি তুলছেন। প্রয়োজনমতো এই রকম রিফ্লেকটর পনেরো-কুড়িখানাও ব্যবহার করা হত। ফটোগ্রাফির উৎকর্ষ যে আগের চেয়ে অনেক ভাল হল একথা বলাই বাহুল্য।

ভাল কথা। নরেশদার সঙ্গে ললিতা দেবীর (মিস বনি বার্ড) সেদিনকার অপ্রিয় ব্যাপারটা মধু বোসই একদিন মিটিয়ে দিলেন। সেও এক মজার ব্যাপার । স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছি, শুটিং-এর সময় ললিতা দেবীকে সাদরে জড়িয়ে ধরে হেসে ডায়ালগ বলি। শট শেষ হয়ে গেলে গম্ভীর মুখে উঠে চলে এসে অন্যদিকে পায়চারি করে বেড়াই। নরেশদাও যথাসম্ভব ওকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। ললিতা দেবীর প্রসঙ্গ উঠলেই নরেশদা হঠাৎ মধু বোসের সিনারিও খাতাটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করেন অথবা আমাকে ডেকে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে বসেন। ব্যাপারটা মধু বোসের দৃষ্টি এড়াল না।

একদিন আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী বলতো ধীরাজ? হিরোইন, তার সঙ্গে কোথায় একটু ভাবসাব করবে, যাতে দুজনের জড়সড় ভাবটা কেটে যায়। তা না, নর্থ পোল আর সাউথ পোল!'

আমতা আমতা করে সে প্রসঙ্গ কোনও রকমে এড়িয়ে গেলাম। মধু বোস কিন্তু নাছোড়বান্দা। নরেশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা সত্যিই কী হয়েছে বলুন তো নরেশবাবু? ধীরাজ আর ললিতা পরস্পরকে খালি এড়িয়েই চলেছে। এতে কিন্তু বিয়ের পর ওদের প্রণয়দৃশ্যটা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

একগাল হেসে নরেশদা অম্লানবদনে বলে বসলেন, 'মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কী! ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার।'

মধু বোস ও আমি দুজনেই থ বনে গেলাম।

'— দুদিনের তো আলাপ, এর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই বা হল কখন! নাঃ, ব্যাপারটা তো খুব সহজ মনে হচ্ছে না। শোন ধীরাজ,' আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে মধু বোস বললেন, 'সত্যি কী হয়েছে বলতো?'

সত্যি কথা বলতে কি নরেশদার উপর মনে মনে বেশ একটু রাগও হয়েছিল। কাণ্ডটা আসলে বাধালেন উনিই, আর বেগতিক দেখে সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর দোহাই পেড়ে খালাস? গোড়া থেকে শুরু করে সেদিনকার ব্যাপারটা সব বললাম মধু বোসকে। সব শুনে প্রথমটা বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় হয়ে গেল মধু বোসের। তারপর হাসতে শুরু করলেন, যেন হিস্টিরিয়ার হাসি। প্রথমে কুঁজো হয়ে, তারপর পেটে হাত দিয়ে। সব শেষে শুয়ে পড়লেন ঘাসের উপর।

শুনেছিলাম হাসি জিনিসটা সংক্রামক। এবার সে প্রবাদবাক্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। মধু বোসকে ওভাবে হাসতে দেখে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর কখন কেমন করে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় একটু একটু করে হাসতে হাসতে

হাসিতে ফেটে পড়লাম মনে নেই। একটু পরে দেখি, ব্যাপারটা অনুমানে বুঝে নিয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে হাসতে নরেশদা এগিয়ে আসছেন। ওরই মধ্যে চেষ্টা করে একটু দম নিয়ে মধু বোস বললেন, 'নরেশবাবু, আপনি যদি ধর্মযাজক হতেন, তাহলে সমস্ত পৃথিবীটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ ভরে যেত।' আবার হাসি, এবার নরেশদাও যোগ দিলেন।

সেদিনের লোকেশন ছিল ওঙ্কারমল জেঠিয়ার বাগানবাড়িতে। চেয়ে দেখি, আমাদের ওভাবে হাসতে দেখে ইউনিটের আর সব কর্মীরাও হাসতে শুরু করেছে। শুধু পূর্বদিকের গঙ্গার ধারে একখানা বেতের চেয়ারে বসে উদাস চোখে নদীর অপর পারে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন ললিতা দেবী। আমাদের এ হাসির উৎস যে উনি নিজেই, মনে হল তা বুঝতে পেরেই যেন আরও আড়ষ্ট হয়ে গেছেন। হঠাৎ হাসি থামিয়ে মধু বোস বললেন, 'আপনারা বসুন, আমি এখুনি আসছি।'

একটু পরেই অনিচ্ছুক প্রতিবাদরতা ললিতা দেবীকে একরকম টানতে টানতে এনে আমাদের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন মধু বোস। তারপর ইংরেজিতে বললেন, 'বনি, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। সেদিন নরেশবাবু তোমায় ইচ্ছে করে অপমান করেননি। অনভিজ্ঞ নতুন ছেলে এ লাইনে এলে পাছে তারা খারাপ হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় উনি তাদের বাঁচাবার জন্য তৎপর হয়ে মরালিটি সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুরু করে দেন। সেদিন ধীরাজকেও এ সম্বন্ধে সচেতন করবার সদিচ্ছায় উদাহরণ খুঁজে না পাওয়ায় হাতের কাছে তোমাকে দেখে তোমার নামই করে ফেলেন। সবচেয়ে মুশকিল হল, তুমি যে বাংলা বুঝতে পার, এটা উনি ভাবতেও পারেননি। নাও, মিটমাট করে ফেল। তোমাদের ভুল বোঝাবুঝির ঠেলায় আমার সিনগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

গম্ভীর মুখে তবুও ললিতা দেবী বসে আছেন দেখে নরেশদা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন— 'মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিস বার্ড, আই অ্যাম সরি!'

ব্যস, মেঘ কেটে গেল। হেসে নরেশদার প্রসারিত হাতখানা ধরে ললিতা দেবী বাধো বাধো বাংলায় বললেন, 'হামি বাংলা বুঝটে পারি, এর জন্য সরি।'

আবার হাসির তুফান উঠলো। পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, সূর্যদেব রাগে অথবা লজ্জায় লাল হয়ে পশ্চিম দিগন্তে আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন।

সেদিন আর শুটিং হল না। তল্পিতল্পা নিয়ে যে যার বাড়ি চলে এলাম।

'কালপরিণয়' ছবির শুটিং আপাতত বন্ধ আছে। শুনলাম 'গিরিবালা' রিলিজ হয়ে গেলে আবার শুরু হবে। গাঙ্গুলীমশাই অমন তাড়াহুড়ো করে ছবি তুলতে ভালবাসেন না, তা ছাড়া তিনি অনেক কাজের মানুষ। শুধু ছবি তোলা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে কেন?

'গিরিবালা' প্রায় শেষ হয়ে এল। রোজ শুটিং, বেশ লাগে। শুটিং না থাকলেই

মনটা খুঁত-খুঁত করে। এর মধ্যে মনে রাখবার মতো কিছু ঘটেনি। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে বেশ বুঝতে পারতাম, ললিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে, হাসাহাসিও করে, গ্রাহ্য করি না।

সেদিন হঠাৎ শুটিং-এর শেষে মধু বোস বললেন, 'কাল 'গিরিবালা'র শেষ শুটিং।'

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আমার। আড়চোখে লক্ষ করে দেখলাম, ললিতার মুখখানাও ম্লান। আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে একটু দূরে বেঞ্চির উপর বসে পড়লাম। নরেশদা আর মধু বোসও এগিয়ে এলেন। কাছে এসে মধু বোস কোনও রকম ভূমিকা না করেই বললেন, 'আজকাল ললিতার সঙ্গে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না ধীরাজ?'

বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললাম, 'আপনারাই তো বলেন হিরোইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করলে স্বাভাবিক অভিনয়, বিশেষ করে লাভ সিন করা, সম্ভব নয়।'

কোন জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে নরেশদা ও মধু বোস গাড়ির দিকে চলে গেলেন।

ওঙ্কারমল জেঠিয়ার বালির বাগানবাড়ি থেকে ভবানীপুর বেশ খানিকটা দূর। এই দীর্ঘ পথ সেদিন নীরবেই কাটিয়ে দিলাম। চেষ্টা করেও কোনো কথা বলতে পারলাম না।

রাত্রে শুয়ে ঘুম আর আসে না। নিজের মনের সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিলাম।

—অন্যায়! কী অন্যায়টা করেছি শুনি?

—প্রথমেই নরেশদা তোমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন, এ লাইনে প্রলোভন বিছানো।

—নরেশদার সবতাতেই একটু বাড়াবাড়ি। ললিতাকে যদি আমার ভাল লাগে তাতে দোষ কী?

—দোষ এই যে, ছবি শেষ হতে চললো অথচ তোমার ভাললাগা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য যুক্তিপূর্ণ পথে যে আলাপ-আলোচনা চলে তাকেই বলে তর্ক। আর কোনো যুক্তিই মানবো না, যেভাবে হোক আমার নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবই, এটা হল বিতণ্ডা। সোজা পথ ছেড়ে মনের সঙ্গে এই বিতণ্ডা করতে করতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো মায়ের ডাকে। বলছেন,' শুটিং-এর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। তিন তিনবার ডেকে গেলাম এখনও ঘুম ভাঙলো না? আজ তোর হলো কী?'

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে কোনরকমে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে গাড়িতে উঠে

ড্রাইভারের কাছে শুনলাম, আজ আর অন্য আর্টিস্ট কেউ নেই, শুধু আমি আর ললিতা। সারা পথ চুপচাপ কাটিয়ে জেঠিয়ার বাগানবাড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন প্রায় আটটা বাজে।

আমার আগেই মধু বোস ললিতাকে নিয়ে পৌঁছে গেছেন। তাড়াতাড়ি মেক-আপ করতে গেলাম।

সেদিন নেওয়া হল কতকগুলো বিক্ষিপ্ত শট। যেমন মত্ত অবস্থায় আমার টলতে টলতে হেঁটে যাওয়া, উপরের জানলা খুলে ললিতার উঁকি মেরে দেখার ক্লোজ-আপ, সিঁড়ি দিয়ে টলায়মান দু'খানি পা নেমে আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর নেওয়া হল বিভিন্ন ভঙ্গিতে আমার আর ললিতার একত্রে কতকগুলো স্টীল ফটো পাবলিসিটির জন্য।

লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। প্রতিদিনের বরাদ্দ যথারীতি খাবারের সঙ্গে, অবাক হয়ে দেখলাম, কেক, সন্দেশ ও কমলালেবুর অতিরিক্ত আয়োজন। একটু পরেই জানতে পারলাম বাড়তি খাওয়াটা খাওয়াচ্ছেন ললিতা দেবী, বিদায় আপ্যায়ন হিসাবে। আমিও বাদ গেলাম না। কেমন অভিমান হল। যুক্তিহীন অভিমান ঐ বয়সের নিত্যসঙ্গী। ভাবলাম, আমাকেও ললিতা দেবী সবার সঙ্গে এক করে বিদায় দিতে চান?

মুখ দেখে বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। একটু নিরিবিলি হতেই কাছে এসে চুপি-চুপি বললেন, ' ধীরাজ, তোমার জন্য রেখেছি একটা বিগ সারপ্রাইজ। মামি নিজে রান্না করেছে, মুরগ মসল্লম। রাত্রে আমাদের ওখানে তুমি খাবে।' আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে খপ করে ললিতার একখানি হাত ধরে ফেললাম, কথা খুঁজে পেলাম না।

চকিতে চারদিক দেখে নিয়ে ললিতা বলল, 'ছাড়ো ছাড়ো! সবাই দেখলে কী ভাববে বল তো? বি পেশেন্ট ডারলিং!'

ডারলিং? আমি আর নেই! ছবিতে নামতে শুরু করে, আমার এই একুশ-বাইশ বছর বয়সে, ইংরেজি জানা কোনো কটা রঙের মেয়ের মুখ থেকে ডাইরেক্ট ডারলিং ডাক এই প্রথম। ভাবলাম, আর বাড়ি যাব না। গঙ্গার তীরে ওঙ্কারমল জেঠিয়ার এই বাগানবাড়িতে মালি হয়ে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি যদি ললিতার মতো মেয়ে রোজ মাত্র একটিবার ডারলিং বলে ডাকে।

সেদিন আর বিশেষ কিছু কাজ হল না। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই বেলা আড়াইটে বেজে গেল। কাজ শেষ করার আনন্দে সবাই বিভোর। মধু বোস ক্যামেরাম্যান যতীনকে নিয়ে কতকগুলো প্যানোরামিক দৃশ্য তুললেন এডিটিং শট হিসাবে। বেলা যেন তবু শেষ হয় না।

অবশেষে তল্পিতল্পা বেঁধে বালি থেকে যখন রওনা হলাম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। ছোট গাড়িটায় আমি, ললিতা ও মধু বোস। বড় ভ্যানটায় আর সব স্টুডিও কর্মীরা। হৈ-হল্লা করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার লোক অবাক হয়ে চোখ কপালে

তুলে ভাবে, ব্যাপার কী!

ধর্মতলায় আসতেই মধু বোস ৫ নম্বর বাড়িতে নেমে গেলেন রুস্তমজী সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। গাড়ি আমাকে ও ললিতাকে নামাতে চললো। ললিতারা ম্যাডান স্ট্রীটে একটা বড় ব্যারাক বাড়িতে থাকতো। তখন অবশ্য রাস্তাটির অন্য নাম ছিল, আর রাস্তাও অত চওড়া ছিল না। সবে দুধারে বাড়িগুলো ভাঙতে শুরু করেছে। ম্যাডানের আফিস ও বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি ম্যাডান স্ট্রীট ধরে দক্ষিণমুখে একটু এগোতেই ডান দিকে একটা পুরনো প্রকাণ্ড ব্যারাক বাড়ি পড়ে। সেইখানেই একটা ফ্ল্যাট নিয়ে ললিতারা থাকে।

গাড়ি থামতেই ললিতা নেমে পড়ল। আমি গম্ভীর হয়ে চুপ করে একপাশে বসে আছি, হাত ধরে একটু টান দিয়ে ললিতা বলল, 'এসো'।

তবুও ইতস্তত করছি, দেখি ড্রাইভার রামবিলাস মুচকি মুচকি হাসছে। অগত্যা নামলাম। সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে সামনে একটা অন্ধকার নোংরা স্যাঁতসেঁতে উঠোন। একটু এগিয়ে গিয়ে কাঠের নড়বড়ে একটা সিঁড়ি, তাই বেয়ে উপরে উঠতে হবে। কেমন একটু নিরুৎসাহ হয়ে গেলাম। ললিতার হাত ধরে সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, হঠাৎ পাশ দিয়ে দু-তিনটি ছেলে-মেয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল। বহুদিনের পুরনো সিঁড়ি যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে উঠল। রোমান্টিক নভেল পড়ে পড়ে যে কুসুমবিছানো পথ কংক্রিটের মতো মনে স্থায়ী আসন পেতে রেখেছিল, এই অন্ধকার নড়বড়ে সিঁড়িই প্রথম সেটায় নাড়া দিয়ে কাঁটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিল। হঠাৎ নরম বালিশের মতো একটা পদার্থ পায়ের ওপর পড়তেই সভয়ে চিৎকার করে পড়তে পড়তে ললিতাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেও টাল সামলাতে পারলাম না। সিঁড়ির উপর দু'জনে জড়াজড়ি করে বসে পড়লাম বা পড়ে গেলাম। কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে পরম কৌতুকে খিলখিল করে হেসে উঠল ললিতা। শীতের সন্ধ্যায়, বেশ বুঝতে পারলাম, কপালটা আমার ঘামে ভিজে উঠেছে। সিঁড়ির চার-পাঁচটা ধাপ উপরে উঠতেই দোতলার বারান্দা। হঠাৎ ডানদিকের ঘরের দরজাটা খুলে গেল আর এক ঝলক আলো এসে সামনে পড়ল। একটি মোটাসোটা আধাবয়সী মহিলা, পা পর্যন্ত ছিটের গাউন পরা, টর্চ হাতে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। টর্চের আলোয় দেখি কোলের উপর একটা মিশমিশে কালো লোমশ কুকুরকে জড়িয়ে ধরে হেসেই চলেছে ললিতা। এতক্ষণে খেয়াল হল আমার হাত দুটো তখনও জড়িয়ে আছে ললিতাকে। লজ্জায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। টর্চ-হাতে মহিলাটির বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। গায়ের রং ফরসা নয়, বেশ চাপা। মুখ দেখলে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, এই প্রৌঢ়াই ললিতার মা। নাক চোখ মুখ হুবহু এক।

বেকুবের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নির্বিকার মুখে মহিলাটি ডাকলেন—'বনি!'

নিমেষে হাসি থেমে গেল ললিতার। তাড়াতাড়ি উঠে কুকুরটাকে কোলে করে সিঁড়িগুলো একরকম লাফিয়ে পার হয়ে মার কাছে গিয়ে বলল, 'মামি, এই ধীরাজ, আমার হিরো।'

জীর্ণ নড়বড়ে সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে শুধু মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে ওটা যদি ভেঙে আমায় নিয়ে পড়ে যায় তাহলে বেঁচে যাই। ললিতার মায়ের সঙ্গে প্রথম আলাপে খানিকটা ভাল ইম্প্রেশন দেব বলে কতকগুলো জুতসই ভাল ভাল কথা মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিলাম। সব ভেস্তে গেল। অপরাধীর মতো এক-পা দু-পা করে উঠে সামনে গিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়ালাম। স্নিগ্ধ হাস্যে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় ললিতার মা বললেন, 'তোমরা ভিতরে এসো।'

সবাই ভিতরে ঢুকলে ললিতার মা দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। লোকমুখে কয়েকটি বিখ্যাত পীঠস্থানের কথা শুনেছিলাম, যেখানে অতি দুর্গম কষ্টকর পথ বহু ক্লেশে অতিক্রম করে দেবতার কাছে পৌঁছে মানুষ পথ আর পথের কষ্ট সব ভুলে যায়। যেন মানুষের একাগ্রতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা নেবার জন্যই পথের ছলনা।

আমারও ঠিক তাই হল। নীচের ঐ দুর্গন্ধময় অন্ধকার উঠোন, জীর্ণ নড়বড়ে অন্ধকার সিঁড়ি, সব ভুলে গেলাম এদের ছিমছাম পরিষ্কার ঘরখানি দেখে। মাঝারি ঘর। একপাশে শোবার খাট, তার উপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানা। অন্য পাশে তিন চারখানি সোফা ও তার সঙ্গে মিল রেখে গোল একটা টেবিল। তার উপর ফুলদানি। তাতে টাটকা সুগন্ধি নাম-না-জানা ফুলের স্তবক। দেওয়ালে দু' তিনখানা ছবি, সবই নাম করা আর্টিস্টের আঁকা। ঘরের মধ্যে কাঠের ফ্রেমে ফিকে সবুজ কাপড় দিয়ে একটা মুভেবল পার্টিশন। দরকার হলে গুটিয়ে একপাশে রাখা যায়। সব মিলিয়ে মনে হল, এদের দারিদ্র্য আছে, দৈন্য নেই। রুচি আছে, সচ্ছলতা নেই। কেমন একটা সম্ভ্রম-মাখানো বিস্ময়ে সব ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

চমক ভাঙল ললিতার মায়ের কথায়। ' আমাদের এই জোড়াতালি দিয়ে দারিদ্র্য ঢাকবার চেষ্টা দেখে মনে মনে হাসছ ধীরাজ?'

হেসে জবাব দিলাম—' না। বরং শিখে নিচ্ছিলাম পরিচ্ছন্নতা ও রুচি দিয়ে কী করে দারিদ্র্যকে হার মানাতে হয়।'

বোধহয় খুশি হলেন ললিতার মা। আমাকে ওঁর পাশে এসে বসতে বললেন। দুজনে সোফায় বসলাম। ললিতা তখনও দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে আদর করছে।

মিসেস বার্ড এবার একটু রেগেই বললেন, 'বনি, এখনও দাঁড়িয়ে লোলাকে আদর করছ? যাও, বাথরুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে এসো।'

কুকুরটাকে ছেড়ে দিতেই সে পশ্চিমদিকের অন্ধকার বারান্দায় ছুটে গেল, ললিতাও তার পিছনে পিছনে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। আমিই শুরু করলাম, 'দেখুন মিসেস বার্ড, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলতে পারেন, কিন্তু ললিতা—'

বাধা দিয়ে ললিতার মা বললেন, 'ভাল বলতে পারে না। অবাক হবারই কথা, তোমার কাছে বলতে বাধা নেই, আমি বাঙালি খ্রীস্টান। আমার স্বামী ছিলেন আইরিশম্যান, ই. আই. আর.-এ গার্ডের কাজ করতেন। বনিকে আমরা ইচ্ছে করেই বাংলা শেখাইনি। কারণ, আমাদের এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের কোনো অভিজ্ঞতা যদি তোমার থাকতো, তাহলে বুঝতে পারতে এ সমাজে বাংলা বলা বা বোঝা একটা অপরাধ।'

বিস্মিত হয়ে ললিতার মায়ের মুখের দিকে চাইতেই তিনি বললেন, 'হ্যাঁ অপরাধ। যদি কেউ জানতে পারে, আমি ভাল বাংলা বলতে পারি বা বুঝতে পারি, তাহলে সমাজের চোখে আমি অনেকখানি নেমে গেলাম এবং ছুতোয়নাতায় সবাই আমাদের এড়িয়ে চলবে। এ সমাজে রঙের কোনো দামই নেই। আবলুস কাঠের মতো রঙও যদি তোমার হয়, আর বুলি যদি ইংরেজি হয়, ব্যস সাত খুন মাফ। এই দেখ না, আমাকে দেখেই বুঝতে পারবে আমি বেশ কালো। কিন্তু বনি? বনি পেয়েছে ওর বাপের রং।'

হঠাৎ কথা বন্ধ করে ললিতার মা পুবদিকের দেওয়ালে আলোর ব্র্যাকেটের নীচের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি ঠিক আলোর নীচে ছোট একখানা বাঁধানো ফটো টাঙানো রয়েছে। অনুমানে বুঝতে পারলাম উনিই মিঃ বার্ড, বনির বাবা।

চুপ করে রইলাম। ভাবলাম এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা বদলানো দরকার। বললাম, 'আচ্ছা মিসেস বার্ড, সিঁড়িটায় কোনো আলো নেই কেন? ওরকম অন্ধকার, তার উপর সিঁড়িটা তো মোটেই নিরাপদ নয়। বাড়িওয়ালাকে আপনারা বলেন না কেন?'

ললিতার মা বললেন, 'বাড়িওয়ালার কোনো দোষ নেই। এই বাড়িটায় খুব কম করে দেড়শোটি পরিবার বাস করে। কারো সঙ্গে কারো ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, ভাল পরিচয়ও নেই। সারা দিনরাত কে কখন আসে, কে কখন বেরিয়ে যায় ঠিক নেই। প্রথম প্রথম বাড়িওয়ালা আলো দিয়েছিল। সকালে দেখা গেল বালব নেই। এইরকম পাঁচ-সাতবার বালব চুরি যাবার পর আর আলো দেয় না।'

হঠাৎ মাথার উপর হুড়মুড় শব্দ। মনে হল সমস্ত ছাদটা এখুনি ভেঙে মাথায় পড়বে। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের ছবিগুলো কেঁপে দুলতে লাগল। ভয়ে ও উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম।

অভয় দিয়ে ললিতার মা বললেন, 'বোসো ধীরাজ, ওপরের ঘরে পেগি আর মেরি দু'বোনে নাচতে শুরু করেছে।' কান পেতে শুনলাম, তাই বটে। একটা গ্রামোফোনে নাচের রেকর্ড বাজছে—বীভৎস তার আওয়াজ। আর তারই তালে তালে নাচের নামে দুরমুশ করছে উপরের ছাদটা পেগি আর মেরি দুই বোন। অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশ,

এর আগে এ রকম আবহাওয়ায় আর কোনও দিন পড়িনি।

পশ্চিমের বারান্দার ডানদিক থেকে বনি ডাকল, 'মামি, মামি!'

ললিতার মা উঠে গিয়ে বারান্দায় উঁকি দিয়ে এসে কাঠের সেই মুভেবল পার্টিশনটা দিয়ে ঘরের খানিকটা জায়গা আড়াল করে দিলেন। বুঝলাম বনির বেশ পরিবর্তন হবে। অন্য দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে একটা ইংরেজি গানের দু'লাইন গুনগুন করে গাইতে গাইতে পার্টিশনের আড়ালে প্রসাধন শুরু করল বনি।

চুপ করে বসে আছি। কানে আসছে শুধু বনির গুনগুন গুঞ্জন আর উপরে মুগুর দিয়ে ছাদ পেটানোর আওয়াজ। হঠাৎ শুনি গান থেমে গেছে। পার্টিশনের আড়াল থেকে বনির ন্যাকা কান্নার আওয়াজ ভেসে এল, 'মামি, উই্ আর হাঙরি মামি!'

ক্ষুধা-তৃষ্ণা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম আমারও খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কোনো কথা না বলে ললিতার মা উঠে পশ্চিমের বারান্দার বাঁ দিকে চলে গেলেন, বুঝলাম ঐ বারান্দার ডানদিকে হলো বাথরুম আর বাঁ দিকে কিচেন।

পার্টিশনের দিকে চোখ পড়তেই দেখি অপরূপ সাজে বেরিয়ে আসছে ললিতা। পরনে গোলাপী রঙের ফিনফিনে পাতলা সিল্কের ঢিলে পাজামা, গায়ে ততোধিক পাতলা শুধু একটা নকশা কাটা কিমোনো। পায়ে বেডরুম স্লিপার, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল ফাঁপানো ফোলা। ললিতা কাছে এসে দাঁড়াতেই ইভনিং-ইন-প্যারির মিঠে গন্ধে ঘরটা মশগুল হয়ে উঠল।

হতবাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছি। হাসিমুখে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে ঝুপ করে আমার সোফাটার হাতলের উপরে বসে পড়ল ললিতা। তারপর চক্ষের নিমেষে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের পাশে মুখ রেখে গদগদ কণ্ঠে বলল, 'নাউ মাই ডারলিং, মামির সঙ্গে কী কী কথা হলো বল।'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার। সোফাটার একপাশে জড়সড় হয়ে কুঁকড়ে বসে পাংশু মুখে পশ্চিমের বারান্দার বাঁ দিকে চাইতে লাগলাম—যদি দয়া করে ললিতার মা খাবার নিয়ে এখুনি এসে পড়েন তো বেঁচে যাই। কিন্তু এলেন না। জবাব না পেয়ে কপট অভিমানে মুখটা আমার বুকের উপর রেখে আরও নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ললিতা বলল, 'এত সাজগোজ করে এলাম তোমার জন্যে, আর তুমি একবারটি বললে না কেমন দেখাচ্ছে আমাকে!'

বুকের ভিতরটায় হাতুড়ি পিটছিল। অতি কষ্টে বললাম, 'ভালো!'

মোটেই খুশি হলো না ললিতা। মুখ তুলে তেমনি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'মোটেই না। কী রকম হিরো তুমি? অন্য দেশ হলে হিরোইনকে এভাবে নির্জনে পেলে হিরো বুকে জড়িয়ে নাচতে শুরু করে দিত।'

সাহস খানিকটা ফিরে এসেছিল। বললাম, 'তুমি হলে বিশ্বের নায়িকা, আর আমি? বাংলাদেশের মুখচোরা লাজুক হিরো। তফাতটা অনেকখানি কিনা—কাটিয়ে

উঠতে সময় নেবে।'

পরম কৌতুকে হেসে উঠল ললিতা। তারপর বলল, 'মাই ডারলিং, শুধু ভাল ভাল কথাই বলতে পারো, ইউ আর হোপলেস!'

জড়সড় ভাবটা ততক্ষণে কেটে এসেছে। হেসে বললাম, 'ধরো, সবে আমাদের সিনটা জমে উঠেছে, এমন সময় তোমার মামি খাবার নিয়ে ঢুকলেন—তখন?'

বেশ একটু জোর দিয়েই ললিতা বলল, 'মোটেই না। মামি এতক্ষণে কিচেনে বেতের চেয়ারটায় বিয়ারের বোতল খুলে বসেছে। এটা মামির বিয়ার খাবার সময়। এখন ভূমিকম্প হলেও অন্তত হাফ অ্যান আওয়ার এদিক মাড়াবেন না।'

ভাবলাম, ললিতাকে জিজ্ঞাসা করি অবস্থা তো বলছ তেমন সচ্ছল নয়, অথচ রোজ মামির বিয়ার, তোমার রং-বেরঙের পোশাক এসব আসে কোত্থেকে? লজ্জা ও সংকোচ এসে বাধা দিল।

ললিতা বলল, 'অনেস্টলি ধীরাজ, বলতো, এর আগে আর কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছ?'

প্রথমটা চমকে উঠলাম। সামলে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে জবাব দিলাম, 'না।'

'—দ্যাটস হোয়াই! তাই তুমি অত শাই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি সাতদিন যদি তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা করো, আমি তোমায় স্মার্ট ড্যাশিং হিরো বানিয়ে দেবো।'

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই কি সেই লজ্জানতা স্বল্পবাক গিরিবালা? হাত বাড়ালেই যে মেয়ে ছুটে এসে বাহুবন্ধনে ধরা দেয় তাকে নিয়ে আর যাই চলুক, প্রেম করা চলে না। ললিতা সম্বন্ধে যে মিষ্টি মধুর রোমান্সের জাল এতদিন যত্ন করে বুনে চলেছিলাম, আজ হঠাৎ দমকা হাওয়ায় তার অনেকখানি উড়িয়ে নিয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, এই গায়ে-পড়া প্রেম, এর জন্য প্রস্তুতও যেমন ছিলাম না, ভালও তেমনি লাগছিল না।

বাইরের বারান্দায় একটা বিশ্রী গোলমাল শোনা গেল। মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে চিৎকার করে কী বলছে, এক বর্ণও বোঝা গেল না। ললিতা তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেল। নির্বিকারে তেমনি ঠায় বসে রইলাম। মনে হল আজ আমার ভয় বিস্ময় কৌতূহল কিছুই আর নেই যেন। এই রহস্যময় পুরোনো ব্যারাকবাড়িতে সব কিছুই সম্ভব।

হাসতে হাসতে ফিরে এসে একরকম আমার গায়ের উপর পড়ল ললিতা। তারপর দু' হাত দিয়ে আমায় দু'তিনটে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'জান ধীরাজ, কী মজার ব্যাপার হয়েছে? দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটায় লিজ্জি বলে একটা মেয়ে থাকে। সে এই ব্যারাকের টমি বলে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে

প্রেম করছিল। এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে চুপিচুপি উঠে এসে হঠাৎ ওদের উপর টর্চের আলো ফেলেছে ওর লাভার। অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করছিল, হাতেনাতে ধরে ফেলেছে আজ। ব্যস, আর যায় কোথায়! কিল, চড়। তারপর টমির সঙ্গে শুরু হল ঘুঁষোঘুঁষি।' আবার হাসিতে ফেটে পড়ল ললিতা।

সমস্ত দেহ-মন ঘেন্নায় রি-রি করে উঠল। ললিতার উচ্ছ্বাস ও হাসি তখনও থামেনি। বলল, 'রাত দশটার পর হঠাৎ যদি কেউ বারান্দায় একটা আলো জ্বেলে দেয়, অন্তত টেন পেয়ার্স অফ লাভার হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।'

আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আবার সেই কুৎসিত ইঙ্গিতে ভরা গা-জ্বালানো হাসি। রোমান্সের নেশা পুরোপুরি ছুটে গেছে আমার। কতক্ষণে এদের হাত থেকে, এই নোংরা আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাব এখন তাই শুধু একমাত্র চিন্তা।

ভেজানো দরজায় খটখট করে দু'তিনটে টোকা পড়ল। আর এক নতুন বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলাম। তাড়াতাড়ি উঠে স্থানভ্রষ্ট কিমোনোটা ঠিক করে নিয়ে গম্ভীরভাবে ললিতা বলল, 'কাম ইন!'

ঘরে ঢুকল একটা বছরদশেকের পশ্চিমা মুসলমান ছেলে। পরনে ময়লা লুঙ্গি, গায়ে ততোধিক ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি। দেখলাম, ওর হাতে রয়েছে শালপাতা দিয়ে মোড়া পুরু কয়েকখানা পরোটা।

ললিতা বলল, 'কিচেনমে মামি কে পাস লে যাও।' ছেলেটিকে নীচের কোনও মুসলমান হোটেলের বয় বলেই মনে হল। মিনিটখানেক বাদেই দু'হাতে রেজকি ও পয়সা গুনতে গুনতে ঘরে এসে আমাকে ও ললিতাকে সেলাম করে চলে গেল।

এই অদ্ভুত ব্যারাকবাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি ঘরের মাঝখানে অপরূপ ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করে দিয়েছে ললিতা। ভূতলে এক পা আর স্বর্গে এক পা তুলে বিচিত্র অদ্ভুত নাচ। একটু কান খাড়া করে শুনি উপরতলায় পেগি মেরি বোধহয় ক্লান্ত হয়ে নাচ থামিয়েছে, কিন্তু গ্রামোফোনটা থামায়নি। তারই ভাঙা অস্পষ্ট সুরের রেশ টেনে স্বর্গ-মর্ত তোলপাড় করে নাচছে ললিতা। হাসি পাচ্ছিল, অতি কষ্টে সামলে নিয়ে ভাললাগার ভান করে চেয়ে রইলাম।

নাচ থামিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ললিতা, 'মামি, আই হ্যাভ ডান ইট!' চেয়ে দেখি দু'হাতে ধরা বড় ট্রের উপর কতকগুলো খাবারের ডিশ নিয়ে মিসেস বার্ড কখন এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পিছনে। বড় ড্যাবডেবে চোখ দুটো তাঁর গর্বে ও প্রশংসায় উজ্জ্বল।

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এই ডিফিকাল্ট নাচটা সত্যিই বনি শিখে ফেলেছে, কী বল?' কিছু না বুঝেই হাসিমুখে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

বুঝলাম, রাত্রি আটটার পর থেকে মিসেস বার্ড একটু বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েন। আর ললিতার নাচই যে তার একমাত্র কারণ নয়, এটা বুঝতেও দেরি হল না। গর্বস্ফীত চোখে কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে থেকে মিসেস বার্ড বললেন, 'ভেরি গুড ডারলিং। নাউ গিভ ইওর পুয়র মামি এ কিস।'

ছুটে এসে ললিতা চুমোয় চুমোয় মাকে অস্থির করে তুলল। আদরের ঠেলায় খাবারসুদ্ধ ট্রেটা মাটিতে পড়ে আর কী! কোনো রকমে সামলে নিয়ে মিসেস বার্ড বললেন, 'নাউ চিলড্রেন, হিয়ার ইজ ডিনার।'

দু'জনে মিলে গোল টেবিলটার উপর খাবারগুলো তিনটে প্লেটে সাজিয়ে দিল। সত্যিই ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছিল। আর দ্বিরুক্তি না করে সবাই খেতে বসে গেলাম। প্রায় এক পোয়া ওজনের ঘিয়ে জবজবে মোটা পরোটা একখানা করে, অন্য প্লেটে মুরগ মুসল্লম, আর ছোট একটা চিনামাটির বাটিতে খানিকটা করে সাদা পুডিং। এই অদ্ভুত বাড়িটায় এতক্ষণ বাদে সত্যিকার আনন্দ পেলাম খেয়ে, একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। মুরগির এরকম প্রিপারেশন এর আগে খাইনি। শুনলাম, এক পরোটা ছাড়া, মাংস, পুডিং ললিতার মা নিজে তৈরি করেছেন। বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রশংসার যতগুলো ভাল ভাল কথা মনে এল সব উজাড় করে দিলাম। ফলে লাভ এই হল, ললিতার মাকে কথা দিতে হল যে, সপ্তাহে অন্তত একদিন ওঁদের এখানে এসে খেয়ে যেতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই রাত ন'টা বেজে গেল। বাড়ি ফেরার জন্যে উসখুস করতে থাকি, কিন্তু ওরা কিছুতেই উঠতে দেবে না। নানা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। যথা— বাড়িতে কে কে আছেন, অবস্থা কেমন, ভাই বোন ক'টি ইত্যাদি ইত্যাদি। এতেও নিস্তার নেই। ললিতা মায়ের সামনেই স্পষ্ট বলে ফেলল, 'বাড়িতে না আছে বউ, না আছে লাভার, অত তাড়া কীসের?'

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর খানিকটা বসতে হল।

অবশেষে সত্যিই বিদায় নিয়ে, আবার আসবার এবং পরবর্তী ছবিতে যাতে ললিতাকে হিরোইন নেওয়া হয় তার জন্য গাঙ্গুলীমশাই, নরেশদা এবং মধু বোসকে বিশেষ করে অনুরোধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর থেকে যখন বার হলাম তখন দশটা বাজে। এদের এতখানি আদর-আপ্যায়নের অর্থ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

অবশেষে সত্যিই একদিন ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমান উত্তরা সিনেমা) 'গিরিবালা' মুক্তিলাভ করল। তারিখটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। বাংলা ১০ ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩৬ সাল। ইংরেজি ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার দু' একদিন আগে মিঃ বোস ও ম্যাডান কর্তৃপক্ষ ম্যাডান থিয়েটারে (বর্তমান এলিট সিনেমা) সকালে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনে সমস্ত নামকরা দৈনিক ও

সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সমালোচকদের এই প্রদর্শনীতে আহ্বান করা হয়। এখানে বলে রাখি, তখনকার দিনে কোনও ছবির মুক্তির আগে এ রকম প্রেস-শো বা স্পেশাল-শো'র রেওয়াজ ছিল না। কাজেই অনেকেই বেশ একটু কৌতূহলী হয়ে নতুনত্বের সন্ধানে ছুটে এসেছিলেন সেদিনের সকালের শো-এ। তখনকার দিনের বিখ্যাত চিত্র ও মঞ্চ সাপ্তাহিক 'নাচঘর' তো স্পষ্ট লিখেই ফেলল—

'সেদিন রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে গৃহীত 'গিরিবালা' চিত্রনাট্যের অপ্রকাশ্য অভিনয় দেখবার জন্য ম্যাডান কোম্পানি অনেক সাংবাদিক ও নাট্যসমালোচককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই আমন্ত্রণ পেয়ে আমাদের মতন আরো অনেক বাঙালি নাট্যসমালোচক নিশ্চয়ই অল্প বিস্মিত হননি। কারণ এটা অভূতপূর্ব।'

(নাচঘর, ২ ফাল্গুন, ১৩৩৬)

একখানা নির্বাক ছবির মুক্তিতে এত হৈচৈ ও চাঞ্চল্য এর আগে বাংলাদেশে হয়নি। প্রতিটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক 'গিরিবালা'র স্তুতিগানে মুখর হয়ে উঠল। আর সে কী প্রশংসা! সবগুলো এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া সম্ভব নয়, কয়েকটি নমুনা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না—

The Statesman,Tuesday,Feb.11,1930:

'Dhiraj Bhattacharjee, Naresh Mitter and Chakrabartty gave good performances in the male roles.'

স্টেটসম্যান ছাড়াও ইংরেজি 'বেঙ্গলী', 'লিবার্টি' ও 'অ্যাডভান্স' পত্রিকা অভিনয়, পরিচালনা ও ফটোগ্রাফির ভূরি ভূরি প্রশংসা করেছিল। বাংলা সাপ্তাহিক 'ভোটরঙ্গ' গল্প, পরিচালনা ও ফটোগ্রাফির পর আমাদের সম্বন্ধে লিখল—

'এই তিনটি চরিত্রের সবটুকু বৈচিত্র্যই অভিনেতৃবর্গ ছবির ওপরে ভালো করে ফুটিয়েছেন। যেমন হয়েছে ললিতাদেবীর গিরিবালা, তেমন হয়েছে ধীরাজবাবুর গোপীনাথ, আবার তাঁদেরই সঙ্গে সমানভাবে পা ফেলে চলেছেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র—গোপীনাথের বন্ধুর ভূমিকায়।'

('ভোটরঙ্গ', রবিবার, ৪ ফাল্গুন,১৩৩৬)

সাপ্তাহিক 'শিশির' লিখল—

'বলিতে দ্বিধা নাই যে, এই চিত্রনাট্যের প্রায় প্রত্যেকেই বেশ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। গোপীনাথের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্যের এবং তাঁহার বন্ধুর ভূমিকায় নরেশবাবুর অভিনয় হইয়াছিল অতি চমৎকার।'

('শিশির', শনিবার, ২৮ ফাল্গুন, ১৩৩৬)

সাপ্তাহিক 'নাচঘর' লিখল—

'গিরিবালা' দেখে আমরা বাংলা ফিল্ম-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়েছি। অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে গোড়াতেই ম্যাডান কোম্পানির নতুন সংগ্রহ প্রিয়দর্শন

তরুণ নট শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্যকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

('নাচঘর',১৬ ফাল্গুন, ১৩৩৬)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বায়োস্কোপ' প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় কলমে লিখল—

'গিরিবালা'র পরিচালক শ্রীযুক্ত মধু বোস তাঁর এই প্রথম তোলা ছবিতে তাঁর যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছবিখানি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি কোথাও হয়নি। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো অনেক কিছু আশা করি। ...'গিরিবালা'য় গোপীনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য। ছায়ালোকের এই নবীন শিল্পীকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

('বায়োস্কোপ', ১৬ সংখ্যা, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০)

এছাড়াও 'কুরুক্ষেত্র', 'বাঙলা', 'ভগ্নদূত' প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। সবার এককথা, এ রকম নীট ছবি বাংলায় আর হয়নি। আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত ও ভাবিত করে তুলল, তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিক 'নবশক্তি'। অধুনাবিখ্যাত সমালোচক ও চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (চন্দ্রশেখর) 'গিরিবালা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'নবশক্তি'তে লিখলেন—

' আমরা কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছি নায়ক গোপীনাথের ভূমিকায় একজন নতুন অভিনেতার অভিনয় চাতুর্যে।

...চমৎকার ফিল্ম ফেস আছে তাঁর। তাঁর ভাব প্রকাশের ভঙ্গিও অনিন্দনীয়, তাঁর সংযত অভিব্যক্তি আমাদের বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছে। সমজাতীয় না হলেও ধীরাজবাবুর মুখের নিম্নাংশের সঙ্গে ওদেশের অতুলনীয়া গ্রেটা গার্বোর মুখের আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করেছে বলেই আমরা এখানে তার উল্লেখ করছি। আমাদের বিশ্বাস এই একটি ভূমিকায় অভিনয় করেই ধীরাজবাবু এদেশের চিত্রপ্রিয়দের কাছে বিশেষভাবেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন।'

('নবশক্তি', শুক্রবার, ২ ফাল্গুন, ১৩৩৬)

বলতে লজ্জা নেই, আজ এত দীর্ঘদিন বাদেও চন্দ্রশেখরবাবুর ঐ গ্রেটা গার্বোর মুখের নিম্নাংশের সঙ্গে তুলনার মানেটা ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারিনি। কখনও মনে হয় বুঝি প্রশংসা, আবার কখনও সন্দেহ জাগে ঠাট্টা করলেন নাকি?

পরিচালক মধু বোস বাবাকে নিয়ে 'গিরিবালা' দেখালেন। হাবেভাবে বুঝতে পারলাম বাবা মনে মনে খুশি হয়েছেন। অনেক দিন বাদে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

ইতিমধ্যে আমার সেই দূর সম্পর্কের কাকাটি সপরিবারে একদিন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। 'যখন পুলিশ ছিলাম'-এর পাঠকবর্গের বোধহয় মনে

আছে, পড়া ছেড়ে প্রথম যখন অভিনয় আরম্ভ করি, ইনিই উপযাচক হয়ে এসে বাবা-মা'কে অনেকগুলো কটু অপ্রিয় কথা শুনিয়ে গিয়েছিলেন। আজ হঠাৎ এঁর আবির্ভাবে আমরা সবাই মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। কাকার বড় মেয়ে রিনির বয়স তের-চৌদ্দ। ইশারায় তাকে একটু দূরে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী পার্ল হোয়াইট?'

ফুটফুটে সুন্দর নিটোল চেহারা রিনির। গোল মুখে হাসলে টোল খায়, তখনকার দিনের সর্বজনপ্রিয় অভিনেত্রী পার্ল হোয়াইটের মতো। আমি ঠাট্টা করে তাই ওকে ঐ নামেই ডাকতাম। রিনি খুশিই হত, কাকা-কাকিমা চটে যেতেন।

ছোট্ট সহজ কথাও অকারণে ফেনিয়ে ঘোরালো করে তোলা বোধহয় মেয়েদের অভ্যাস। চারদিকে সভয়ে চেয়ে গলাটা খাটো করে রিনি বলল, 'জান ছোড়দা, ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার গিরিবালা।'

বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। মুখে আস্ফালন করে বললাম, ' ফাজলামো করিসনি, ব্যাপারটা কী বল?'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে রিনি বলল,'বাবা-মা বলতে বারণ করে দিয়েছে যে?'

বেশ বুঝলাম কথাটা বলবার জন্যে রিনি ছটফট করছে। বললাম, 'ও আচ্ছা, তাহলে বলিসনি।'

চলে আসবার জন্যে ফিরে দাঁড়াতেই পিছনের শার্টের একটা কোণ টেনে ধরল রিনি। ফিরে দাঁড়িয়ে অবাক হবার ভান করে বললাম, 'কী রে?'

'—তুমি যদি কাউকে না বল তো বলতে পারি।'

'—দরকার নেই আমার শুনে অমন কথা। ছেড়ে দে, আমায় এখুনি স্টুডিওতে যেতে হবে।'

স্টুডিও আর শুটিং—এই দুটোর উপর রিনির কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এ যেন অদৃষ্টের পরিহাস। কাকা-কাকিমা বায়োস্কোপ-থিয়েটারের নাম শুনতে পারতেন না আর ছেলেমেয়েগুলো, বিশেষ করে রিনি, সবার বড় বলে সিনেমা-থিয়েটারের কথাগুলো যেন গিলতো। নিমেষে আমার আরও কাছে এসে চুপিচুপি বলল রিনি, 'বাবা করুক রাগ, জান ছোড়দা, বাবার আফিসের বড়বাবু থেকে শুরু করে অনেকেই তোমার 'গিরিবালা' ছবি দেখে এসেছে।'

ঠোঁট দুটো উল্টে তাচ্ছিল্যের ভান করে বললাম, 'এই কথা!'

রিনি দমবার মেয়ে নয়। বলল,'শুধু এই কথা নয়, এর পরের কথাগুলো আরও দরকারী।'

পরের দরকারী কথাগুলো শুনবার কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করে চুপ করে আছি দেখে অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে রিনি বলল, 'বেশ বেশ, নাই বা শুনলে, আর কখনো তোমাকে কিছু বলব না।'

বুঝলাম আর বাড়াবাড়ি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বললাম, 'হ্যাঁরে রিনি, তোকে পার্ল হোয়াইটের সিরিয়্যালে 'The Iron Claw' ছবিটার শেষ ইনস্টলমেন্টটা বলেছি কি?'

হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রিনি। আমার হাত ধরে বলল, 'বল না ছোড়দা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

'—তার আগে ঐ পরের দরকারী কথাটা বল।'

গড়গড় করে বলতে শুরু করল রিনি—

'বায়োস্কোপ-থিয়েটারের উপর বাবা বরাবরই চটা। তোমার কথা উঠলেই বাবা মাকে বলতেন, ধীরেটা এবার উচ্ছন্নে যাবে। রাঙাবৌ আর রাঙাদাকে কত করে বললাম, শুনলেন না। পরে বুঝবেন মজাটা। এই বয়সে ঐ সব সংসর্গে পড়ে দু'দিন বাদেই মদ-ভাঙ খেতে শুরু করবে। তারপর ওদেরই মধ্যে একটা খ্রীস্টান ছুঁড়িকে বিয়ে করে আমাদের বংশের নাম ডোবাবে।'

যৌবনে আমার মা নামকরা সুন্দরী ছিলেন। দুধে-আলতা মেশানো গায়ের রং, নিখুঁত গড়ন। সব মিলিয়ে মায়ের মতো সুন্দরী মেয়ে আমাদের গ্রামে এর আগে আর কেউ দেখেনি। তাই বধূবেশে প্রথম পদার্পণ থেকেই ছোট-বড় সবাই মাকে রাঙাবৌ বলে ডাকত। বাবাও খুব ফরসা ছিলেন, ঠিক কাঁচা হলুদের মতো রঙ। কাকারা এবং আত্মীয় যারা বয়সে বাবার ছোট, সবাই রাঙাদা বলে ডাকতেন।

একটু থেমে দম নিয়ে বলতে শুরু করল রিনি, 'চারদিকে সব নাম করা শিষ্য। তারা যখন ছবির পর্দায় গুরুপুত্রের কাণ্ডকারখানা দেখবে তখন? তাই বাবা আমাদের সবাইকে বলে দিয়েছে, তোমরা যে আমাদের আত্মীয় একথা যেন কাউকে না বলি।'

আমার সিনেমায় যোগ দেওয়া সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজন কেউ খুশি হয়নি একথা জানতাম। কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়িয়েছে জানা ছিল না।

রিনি বলল, 'আমাদের পাড়ার রায়বাহাদুরের মেয়ে গোপাকে জান ছোড়দা?' কাকা থাকতেন খিদিরপুরে হেমচন্দ্র স্ট্রীটে (আগে নাম ছিল পদ্মপুকুর রোড)। দু'তিনবার মাত্র গিয়েছি কাকার বাড়ি, তাও খুব অল্প সময়ের জন্যে। এর মধ্যে রায়বাহাদুরের মেয়ে গোপাকে না জানা খুব একটা মারাত্মক অপরাধ বলে মনে হয়নি। সহজভাবেই বললাম, 'না।'

বিস্ময়ে দুচোখ কপালে তুলে রিনি বলল, 'তুমি কী ছোড়দা? গোপা তোমাকে চেনে আর তুমি ওকে জান না?'

সত্যিই ভাবিত হয়ে পড়লাম। স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে গোপানাম্নী মেয়েটির পরিচয়-রহস্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

রিনিই বাঁচিয়ে দিল। বলল, 'গোপা এবার ম্যাট্রিক পাশ করে বেথুনে আই.এ. পড়ছে। চেহারা আর পয়সার দেমাকে আগে আমাদের সঙ্গে কথাই কইত না।

তোমার ছবি দেখে এসে যেচে আলাপ করেছে গোপা।'

কৌতূহল বেড়ে গেল। বললাম,'কী রকম?'

রিনি বলল, 'আগে চোখাচোখি হলে মুখ ঘুরিয়ে নিত। কথাই কইত না। হঠাৎ ক'দিন থেকে দেখি আমাদের বাড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিন ছাদে কাপড় মেলে দিয়ে চলে আসছি, কানে এল, 'শোনো রিনি।' আমি তো অবাক! চেয়ে দেখি ওদের ছাদের আলসের উপর ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে আছে গোপা। চলে আসব কি না ভাবছি, গোপা বলল, 'ধীরাজ ভট্টাচার্য, যিনি 'গিরিবালা' ছবিতে নেমেছেন, তিনি তো তোমার ভাই হন, না?' একবার ভাবলাম বলি, 'না।' বললাম 'হ্যাঁ।' গোপা বলল, 'আগে মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়ি আসতেন, এখন আর দেখতে পাই না কেন?'

কাকিমার গলা শুনতে পেলাম, 'রিনি!'

রিনি বলল, 'মা ডাকছে, আমি চলি ছোড়দা!'

বাধা দিয়ে বললাম, 'চলি মানে! তারপর কী কথা হল বল?'

'—ফিরে এসে বলব।' একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল রিনি।

রায়বাহাদুরের সুন্দরী মেয়ে গোপার চেহারাটা কল্পনার তুলিতে আঁকবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

বাইরের ঘরে কাকা ও বাবা কী একটা কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন, আমি ঘরে ঢুকতেই দুজনে চুপ করে গেলেন। কাকাকে নমস্কার করে চলে আসছিলাম, বাবা ডাকলেন,'ধীউ বাবা, ভূপতির আফিসের বড়বাবু ও আরও অনেক অফিসার তোমার 'গিরিবালা' দেখে এসেছেন। ওঁদের খুব ভাল লেগেছে। ভূপতির উপর হুকুম হয়েছে একদিন ওদের আফিসে তোমায় নিয়ে যেতে, আলাপ করবেন।'

দেখলাম পুত্রগর্বে বাবার মুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমার কাকার নাম ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবার মামাতো ভাই। কলকাতার একটা বড় সওদাগরী আফিসে সিনিয়র কেরানী।

কাকা বললেন, 'হ্যাঁ, আরও মুশকিল হয়েছে। ওরা কী করে জানতে পেরেছে ও আমার ভাইপো। তা যাস একদিন আফিসে, আলাপ করিয়ে দেবো।'

হঠাৎ কাকার এতখানি পরিবর্তনে মনে মনে বেশ খানিকটা বিস্মিত হলেও মুখে বললাম,'যাব।'

কাকা বললেন,'বইটা লিখেছে তো রবি ঠাকুর। তা এইরকম বইয়ে নামলে লোকেও ভাল বলে, আর নামও হয়।'

জবাব না দিয়ে চলে আসছিলাম, কাকা বললেন, 'আজকাল আমাদের বাড়ি যাসনে কেন?'

বললাম, 'ছবির কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তা ছাড়া—'

—'তা ছাড়া কী?'

—'তা ছাড়া বায়োস্কোপে কাজ করি, যখন-তখন আপনাদের বাড়ি গেলে লোকের কাছে আপনার—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকা বললেন, 'আমার মাথা নীচু হয়ে যাবে, না? ডেঁপোমিটুকু ষোল আনা আছে। ওরে মুখ্যু, আমরা গুরুজনেরা যা বলি তোদের ভালর জন্যেই বলি। ওসব মনে রাখতে নেই।'

কাকার বিব্রত অবস্থাটা বুঝতে পেরেই বোধহয় বাবা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, গুরুজনের কথায় রাগ করতে নেই। যেদিন শুটিং থাকবে না, ঘুরে এসো খিদিরপুরে ভূপতির বাসায়।'

ভূপতির বাসার চেয়েও বেশি আকর্ষণ আমার রায়বাহাদুরের প্রাসাদেই। কাজেই তখনই সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম রিনির খোঁজে।

সারা বাড়ি নিঝুম নিস্তব্ধ, রিনির খোঁজ আর পাইনা। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে আসবার সময় মা আর কাকিমার গলা পেলাম।

কাকিমা বলছেন, 'এখনও বলছি তোমায় রাঙাদি, ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও। পরে একদিন দেখবে একটা মেমসাহেব, নয়তো বাজারের একটা অ্যাকট্রেসকে বিয়ে করে এনে তুলবে, নয়তো বিয়ে না করে তাকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকবে। বাড়িই আর আসবে না।'

দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারলাম, মা আঁতকে উঠলেন। তারপর প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বললেন, 'কী হবে ছোটবৌ? আমি বলে বলে হার মেনে গিয়েছি। কর্তার ঐ এক কথা, ছেলে নিজে থেকে বিয়ে না করলে আমি কোনো দিন বলবো না। তুই একবার ঠাকুরপোকে দিয়ে বলাতে পারিস?'

উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাকিমা বললেন, 'তুমি যদি চাও বলাতে পারি, কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। যাই বল দিদি, ভাশুরঠাকুর একটু নরম প্রকৃতির, পুরুষমানুষ একটু শক্ত না হলে চলে?'

আর দাঁড়ানো নিরাপদ নয় মনে করে ডাকলাম, 'কইরে পার্ল হোয়াইট!' রান্নাঘরের ভিতর থেকে একটা অব্যক্ত গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। বিস্মিত হয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে একনজর চেয়েই হেসে ফেললাম। রান্নাঘরের একপাশে মা আর কাকিমা মুখোমুখি গম্ভীর হয়ে বসে, আর একপাশে কাকার দু'তিনটে ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে রিনি একখানা বড় থালায় একগাদা পরোটা ও খানিকটা আলু-চচ্চড়ি নিয়ে তাদের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। মনে হল একখানা আস্ত পরোটায় খানিকটা আলুর চচ্চড়ি দিয়ে সেটা তালগোল করে পাকিয়ে মুখে পুরে দিয়েছে রিনি, সেই সময় আমার ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই ঐ রকম গোঙানির

আওয়াজ। দেখলাম, প্রাণপণে সেটা গেলবার চেষ্টা করেও পারছে না রিনি।

অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললাম, 'ব্যস্ত হবার দরকার নেই পার্ল হোয়াইট। পরশু রবিবারে তোদের বাড়ি গিয়ে গল্পটা শুনিয়ে আসব। এখন আমি বাইরে যাচ্ছি।'

চলে আসতে যাচ্ছি, বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই কাকিমা বললেন, ' তবু ভাল, এতদিন বাদে গরিব কাকিমার কথা মনে পড়েছে ছেলের।'

একটু আগে রিনির কাছে শোনা কাকার কথাগুলো বুকের মধ্যে কিলবিল করে উঠল। একটা কড়া জবাব দিতে গিয়ে অতি কষ্টে সামলে নিয়ে হেসেই বললাম, 'গরিব হওয়ার ঐ এক মস্ত অসুবিধে কাকিমা। কেউ ফিরে তাকায় না, এমন কি ভগবান পর্যন্ত। তিনিও তেলা মাথায় তেল মাখাতে ব্যস্ত।'

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

বাইরে যাচ্ছি তো বলে এলাম, এখন যাই কোথায়? হঠাৎ মনে পড়ল আজ ম্যাডান স্টুডিওতে জাল সাহেবের পরিচালনায় 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ' হিন্দি ছবিটার শুটিং আছে। হিন্দি ছবি মানে টাইটেলগুলো হিন্দিতে লিখে দেওয়া হবে। তাড়াতাড়ি ফরসা জামাকাপড় পরে বেরোতে যাচ্ছি, নজর পড়ল জুতোটার উপর। মনে হল যেন জিভ বার করে ভেংচি কাটছে। অনেকদিনের পুরোনো এলবার্ট, ডান পায়ের টো-এর বাঁ দিকের খানিকটা সেলাই ছিঁড়ে যেন হাঁ করে আছে। ছেঁড়া সুতোর টুকরোগুলো মনে হল দাঁত, আর সেই ছেঁড়া ফাঁকের মধ্যে বুড়ো আঙুলের খানিকটা জিভের মতো দেখা যাচ্ছে। একটু চললে বা পা নাড়লে ঠিক মনে হবে জিভ বার করে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। হতাশ হয়ে বিছানার উপর বসে পড়লাম। কিছুদিন আগে হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত 'গিরিবালা'র নায়ক এই ছেঁড়া জুতো পায়ে দিয়ে স্টুডিওতে যেতে পারে? বিদ্রোহী মন চিৎকার করে উঠল, 'কখনই না।' তাহলে উপায়? বাবার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্রাম থেকে ধর্মতলায় নেমে চীনের দোকানের জুতো কিনব বলে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে উত্তরমুখো এগিয়ে চলেছি , ও হরি, সব দোকান বন্ধ। ব্যাপার কী! আশেপাশের দু'একজন মুসলমান দোকানীকে জিজ্ঞাসা করেও কোনও সদুত্তর পেলাম না। জুতো-ব্যবসায়ী সব চীনেম্যান একজোট হয়ে ধর্মঘট করে বসল নাকি! হতাশ হয়ে অদ্ভুত নামের সাইনবোর্ডগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। থা থট, লুং ফো, লি চং, সুং হিং, মা থিন।

মা থিন! ('যখন পুলিশ ছিলাম' দ্রষ্টব্য) সারা দেহের উপর দিয়ে একটা বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। ফুটপাথের একটা থাম ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখনকার মতন আমার সর্বেন্দ্রিয় অবশ, পঙ্গু হয়ে গেছে। মাথা ঘুরছিল, পাশের একটি বন্ধ দোকানের

সিঁড়ির উপর বসে পড়লাম।

কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম মনে নেই। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। এক-পা দু-পা করে সেই সর্বনেশে সাইনবোর্ডের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভাল করে চেয়ে দেখি মা থিন নয়, নামটা মং থিন। অনুস্বরটা আকারের মতো এমন খাড়া করে লিখেছে যে, ম-এর মাত্রার সঙ্গে মিশে গেছে। একটু দূর থেকে দেখলেই 'মা' ছাড়া কিছুই মনে হবে না। হঠাৎ মনে পড়ল স্টুডিওর শুটিং-এর কথা। আপাতত জুতো কেনা স্থগিত রেখে ধর্মতলা থেকে টালিগঞ্জের ট্রামে উঠে বসলাম।

স্টুডিওতে ঢুকে দেখি গেট থেকে শুরু করে সারা স্টুডিও-চত্বরটা শুধু চীনেম্যান আর চীনেম্যান, কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের জুতোর দোকানগুলো কেন আজ বন্ধ, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

মাথার প্রকাণ্ড টিকিটা মাটিতে পায়ের কাছে লোটাচ্ছে, ঠোঁটের উপর নাকের নীচে খানিকটা ফাঁক, তারপর দুটো সরু গোঁফ গালের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে বুকের কাছাকাছি। পরনে বিচিত্র রঙের ঢিলে পায়জামা, তার উপর ঢিলে আলখাল্লার মত রংচঙে চীনে প্যাটার্নের জামা, পায়ে চীনে চটি বা ক্যাম্বিসের অদ্ভুত জুতো, চণ্ডু আর চুরুটের ধোঁয়া, তার সঙ্গে অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষা। সব মিলিয়ে মনে হলো স্টুডিওর আবহাওয়াটা বদলে গেছে। অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে একটু একটু করে এগোচ্ছি, সামনে দেখি মুখার্জি। অকূলে কূল পেলাম যেন। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মুখার্জি বলল, 'চীনেপাড়ায় আজ চীনেম্যান নেই—তিনখানা লরি বোঝাই করে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে এসেছি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু এসব অদ্ভুত পোশাক-আশাক—'

কথা শেষ করতে পারলাম না। মুখার্জি বলল, 'পার্শি অ্যালফ্রেড থিয়েটার আর কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের সমস্ত পোশাক, পরচুলো আর বারোজন ড্রেসার, মেক-আপ ম্যান কাল রাত্রের শো শেষ হবার পর থেকেই এখানে এসেছে। জাল সাহেবের শুটিং, একেবারে দুর্গোৎসবের ব্যাপার!'

বেশ একটু কৌতূহল হল। বললাম, 'আচ্ছা মুখার্জি, জাল সাহেব খুব বড় ডিরেক্টর, না?'

মিনিটখানেক চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল মুখার্জি। তারপর কী ভেবে বলল, 'নিশ্চয়ই! প্রথমত জাল সাহেব জাতে পার্শি, ম্যাডানদের আত্মীয়। তার উপর নিজে ক্যামেরা ঘোরান, সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেকশন দিয়ে থাকেন। বাপরে, এতগুলো কোয়ালিফিকেশন যার, তাকে বড় ডিরেক্টর বলতেই হবে— না বললে চাকরিই থাকবে না।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মুখার্জি চীন সমুদ্রে তলিয়ে গেল। একবার ভাবলাম বাড়ি চলে যাই, আবার তখনই মনে হল, এত বড় ব্যাপারটা না দেখে গেলে আফসোস

থেকে যাবে। এক-পা, দু-পা করে ভিড় ঠেলে আবার এগোতে শুরু করলাম।

উত্তরমুখো আর একটু এগিয়ে দেখি পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন এবং আরও দু-তিনজন বাঙালি স্টুডিও-কর্মী দাঁড়িয়ে জটলা করছে। মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ডাকনাম মনু। অধুনা নিউ থিয়েটার্সের চীফ ক্যামেরাম্যান। আমার সমবয়সী। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। সব সময়ে মুখে পান আর দোক্তা ঠাসা, প্রতি কথায় অকারণে খানিকটা হাসা, এই নিয়েই মনমোহন। সাদা জামা-কাপড় পরে মনমোহনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা কওয়া খুব নিরাপদ ছিল না। তার ঐ অকারণ হাসির ধাক্কায় পান-দোক্তার রস পিচকারির মতো প্রতিপক্ষের বুক রাঙিয়ে দিত। ভুক্তভোগী, তাই একটু দূর থেকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী মনু, কাজকর্ম ছেড়ে এখানে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে?'

এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার মনমোহন পরিচালক জ্যোতিষবাবুর নিকট-আত্মীয়। অভিনেতা হবার প্রবল ইচ্ছে নিয়ে জ্যোতিষবাবুকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে ম্যাডানে ঢোকে। কিন্তু বাদ সাধলো ঐ পান আর দোক্তা। অনেক চেষ্টা করেও যখন মনমোহন ওদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারল না, তখন অগত্যা জ্যোতিষবাবু এডিটিং ডিপার্টমেন্টে ঢুকিয়ে দিলেন।

যা ভয় করেছিলাম তাই। নিমেষে কাছে এসে আমার ফরসা সাদা জামাটা ডান হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে এক পক্কড় হেসে নিল মনমোহন। তারপর বলল,'জাল সাহেবের শুটিং, এ ফেলে কাজ? পাগল হয়েছিস?'

ততক্ষণে আমার যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। জোর করে জামা থেকে ওর হাতখানা ছাড়িয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছি, হঠাৎ হুড়মুড় করে আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মুখখানা চেপে হাসতে শুরু করল মনমোহন। বেশ বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কী ছেলেমানুষি হচ্ছে?'

হাসি থামিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বলল মনমোহন, 'জালসাহেব, ঐ দ্যাখ ক্যামেরা ঘাড়ে করে চলেছে।'

নামই শুনেছিলাম, চোখে কোনোদিন দেখিনি। স্থান-কাল-পাত্র এমন কি আমার শখের জামাটার পরিণাম ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। লম্বা খুব বেশি যদি হয় তো সাড়ে চার ফুট, চওড়া তিন ফুট। প্রকাণ্ড জালার মতো ভুঁড়িটা প্রায় বুক থেকে নেমেছে। গায়ে লম্বা পার্শি কোট। পরনে সাদা জিনের প্যান্ট ঐ দীর্ঘ পার্শি কোটের আওতায় পড়ে অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। প্রকান্ড একটা ধড়ের উপর ততোধিক প্রকাণ্ড একটা মুণ্ড কে যেন চেপে বসিয়ে দিয়েছে। গলা বলে কিছু নেই। মাংসল সুগোল লালচে মুখ, রোদে পোড়া রং। ভাঁটার মতো গোল দুটো চোখ, দেখলেই মনে হবে ভদ্রলোক সব সময় চটেই আছেন। ধ্যাবড়া বড়ির মতো ছোট্ট নাকের দুপাশ দিয়ে দুগাছা শ্রীহীন গোঁফ গালের পাশে নেমে এসেছে, যেন অবহেলার লজ্জায় মাথা উঁচু করে কারো দিকে চাইতে পারছে না। মাথায় লম্বা গোল পার্শি টুপি, একটু বেশি লম্বা, বোধহয় খোদার

উপর খোদকারি করে উচ্চতা বাড়াবার চেষ্টা।

মনে হল জীবনে এই একটি বার মনমোহন অকারণে হাসেনি। অপলক চোখে চেয়েই আছি। সব মিলিয়ে মানবদেহে এতবড় একটা গরমিল আর কোনোদিন আমার চোখে পড়েনি।

চারপাশে বিচিত্র পোশাক পরা অগণিত চীনেম্যান, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যামেরায় হাত দিয়ে ম্যাডানের এস (ace) পরিচালক জাল সাহেব। পুরো নাম জাল খাম্বাটা না জাল মার্চেন্ট মনে নেই। মনমোহনের কাছে শুনলাম, জাল সাহেবের ছ'জন অ্যাসিস্টেন্ট। দুজন বাঙালি হিন্দু — অসিত ও জগন্নাথ। দুজন পার্শি, আর দুজনের একজন মুসলমান, অপরটি পাঞ্জাবী। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে একজন সহকারী হলেই পরিচালকের কাজ চলে যেত। গাঙ্গুলীমশাই, মধু বোস, জ্যোতিষবাবু এঁদের একজনের বেশি সহকারী ছিলেন না। শ্রদ্ধা ও কৌতূহল বেড়ে গেল। ভিড় ঠেলে খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আধ ডজন সহকারীর মাঝে নেপোলিয়নের মতো দাঁড়িয়ে আছেন জাল সাহেব। পাশে লম্বা তেপায়া স্ট্যান্ড-এর উপর ফিট করা রয়েছে একটা কালো চৌকো কাঠের বাক্স। লম্বা প্রায় দেড় ফুট, চওড়া আট ইঞ্চি। বাক্সটার মাঝখানে একটা ছোট হ্যান্ডেল ফিট করা, ঐটাই হল ক্যামেরা।

বেশ একটু অবাক হয়ে মনমোহনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যতীন দাস যে ক্যামেরায় গাঙ্গুলীমশাই বা মধু বোসের ছবি তোলে সে তো হল এল-মডেল ডেবরি। এটা কী ক্যামেরা?'

এবার আমার পিঠের উপর মুখ রেখে হাসল মনমোহন। বুঝলাম পৃষ্ঠরক্ষা করার চেষ্টা বৃথা।

একটু পরে মুখ তুলে বলল মনমোহন, 'ওটা হল প্যাথে নিউজরীল ক্যামেরা। অতি পুরোনো মডেল, আজকাল লেটেস্ট মডেলের অনেক ভাল ভাল ক্যামেরা বেরিয়েছে, কিন্তু জাল সাহেব সিনেমার শুরু থেকেই ঐটা আঁকড়ে পড়ে আছেন।'

হঠাৎ চুপ করে গেল মনমোহন। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি বিচিত্র পোশাক পরা চীনেম্যানের দল হৈ-হল্লা করতে করতে পুবদিকের বাগানে ঢুকছে। এখানে বলে রাখি অত বড় ম্যাডান স্টুডিওটার সিকি অংশ শুধু পরিষ্কার করে শুটিং-এর কাজ চলতো। বাকিটা, বিশেষ করে পুবদিকটা, ছিল একেবারে গভীর জঙ্গল, বড় বড় গাছ ও আগাছায় ভর্তি।

চীনেম্যানের দল বাগানে ঢুকছে, যেন রক্তবীজের বংশ। শেষই হয় না। আমাদের কাছ থেকে কিছু দূরে ঐ অদ্ভুত ক্যামেরাটার উপর একটা হাত রেখে সেনাপতির মতো অন্য হাত নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কী সব বলছেন জাল সাহেব। খানিকটা ইংরেজি, খানিকটা গুজরাটি আর উর্দু মেশানো। একটা কথারও মানে বুঝতে পারলাম না।

সহকারী ছ'জন ছুটোছুটি করে একবার যাচ্ছে চীনেম্যানদের কাছে, আবার ছুটে আসছে জাল সাহেবের কাছে। রীতিমতো একটা যুদ্ধযাত্রার পূর্বাভাস। মনমোহনের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি নেই, রীতিমতো অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

একটু পরে সব চুপচাপ। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, যেন কোনো যাদুমন্ত্রে সব চীনেম্যান অদৃশ্য হয়ে গেছে স্টুডিওর জঙ্গলে । এইবার ক্যামেরাটি ঘাড়ে নিঁয়ে পুবমুখো করে দাঁড় করালেন জাল সাহেব। তারপর ডান হাত দিয়ে হাতলটা ঘোরাতে যাবেন, এমন সময়ে সহকারী জগন্নাথ কী যেন বলতে ছুটে এল জাল সাহেবের কাছে। বিকট পার্শি হুংকার ছাড়লেন জাল সাহেব। ভাষা না বুঝলেও যার ভাবার্থ হল : এখন কোনও কথা নয়, ডোন্ট ডিসটার্ব মি! বেশ একটু দমে গিয়ে হতাশ দৃষ্টিটা জঙ্গলের দিকে মেলে অপরাধীর মতো চেয়ে রইল জগন্নাথ।

কানের কাছে ফিসফিস করে বলে উঠল মনমোহন, ' হুঁ হুঁ, এ বাবা বাঘা ডিরেক্টর! কাজের সময় আজেবাজে কোনো কথাই চলবে না।'

ক্যামেরার হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে জাল সাহেব হাঁকলেন, ' কাম ফরোয়ার্ড।'

মিনিটখানেক চুপচাপ। শুধু একটানা ক্যামেরার ঘরর ঘরর আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

কিন্তু কই? কেউ তো এগিয়ে এল না! আরও খানিকক্ষণ ক্যামেরা ঘুরিয়ে চললেন জাল সাহেব। তারপর হঠাৎ ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন হিন্দিতে, 'ইধার আ যাও ইউ ফুলস!' এই হুংকারে চীনেম্যান একটিও এলো না, এলো ছ'জন সহকারী পরিচালক। ভয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ পাংশু হয়ে গিয়েছে।

জাল সাহেবের লাল মুখ আরও লাল হয়ে গিয়েছে। তার উপর ঘামে সমস্ত মুখখানা সপসপ করছে। রুমাল দিয়ে দু'তিনবার মুছেও কিছু হলো না। রাগে ভিজে রুমালখানা আছড়ে মাটিতে ফেলে হিন্দি ও ইংরেজির তুবড়ি ছুটিয়ে দিলেন, ' ক্যা মতলব? হোয়াট ইজ অল দিস? হামারা ইন্সট্রাকশন্স ক্যা থা?'

প্রথমটা ভয়ে কেউই জবাব দেয় না। আবার গর্জন করে উঠলেন জাল সাহেব, 'সে সামথিং ইউ বাঞ্চ অফ ফুলস!'

অসিত এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা হিন্দি ও বাংলায় একনিশ্বাসে বলে গেল, ' আপনি বলেছিলেন যে, আপনি প্রথমে আমাদের ইশারা করবেন, তারপর আমরা সাদা রুমাল নেড়ে ওদের আসতে বলব। আমরাও ওদের তাই বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি সে সব কিছু না করেই চেঁচিয়ে উঠলেন, কাম ফরোয়ার্ড—।'

—'এনাফ! টেল দেম হোয়েন আই সে 'কাম ফরোয়ার্ড '—কাম।'

আবার ছুটল অ্যাসিস্টেন্টের দল জঙ্গলে। চারদিক থেকে শোনা গেল বহুকণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন। চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব, 'খামোশ!'

নিমেষে গুঞ্জন থেমে গেল। একটু পরে সহকারীর দল ফিরে এসে জানাল সব

ঠিক আছে।

শুরু হলো শুটিং।

ক্যামেরা খানিকটা ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়লেন জাল সাহেব —'কাম ফরোয়ার্ড!' একটু পরে দেখি ভয়ে মড়ার মতো পাংশু মুখে একটি একটি করে চীনেম্যান বেরিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে, চোখে শঙ্কিত চাউনি।

আট-দশজন এইভাবে আসার পর হঠাৎ ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে শূন্যে একটা তুড়িলাফ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব, 'স্টপ, রোখখো!'

চীনেম্যানের দল কিন্তু থামল না। একটির পর একটি এগিয়েই চলল। দু'তিনটি সহকারী ছুটে গিয়ে ওদের হাত-মুখ নেড়ে কী সব বলতে তবে থামল।

এরই মধ্যে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন জাল সাহেব। দু'হাত দিয়ে মাথার দুপাশের রগ দুটো টিপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে সহকারীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'উন লোগোঁকো বোল দো ইট ইজ নট ফিউনারেল সিন, ইট ইজ হ্যাপি সিন। হাসনে বোলো।'

তাই হলো, অনেক কষ্টে হাত-মুখ নেড়ে হেসে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, এটা শোকের বা দুঃখের দৃশ্য নয়, সবাই হাসতে হাসতে আসবে। আবার চীনের দল জঙ্গলে ঢুকল।

ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত হলেন জাল সাহেব। জগন্নাথ কাছে এসে বলল, 'একটা কথা স্যার।'

আবার চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব, 'বাত নেহি মাংতা, কাম মাংতা! যাও, ডোন্ট ডিসটার্ব মি নাউ।'

ক্ষুণ্ন মনে ফিরে গিয়ে সঙ্গীদের ফিসফিস করে কী বলল জগন্নাথ। ততক্ষণে জাল সাহেব ক্যামেরা ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছেন। একটু পরেই 'কাম ফরোয়ার্ড' বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিলপিল করে চীনের দল আসতে শুরু করে দিল। ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টি তাদের জাল সাহেবের দিকে, মুখে জোর করে আনা এক অদ্ভুত হাসি বর্ষার ক্ষণিক ভিজে রোদের মতো নিষ্প্রাণ। ক্যামেরার পাশ দিয়ে এক এক করে সবাই চলে গেলে হাতল ঘোরানো বন্ধ করলেন জাল সাহেব। বুঝলাম, এ শটটা শেষ হল।

বেশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল মনমোহন, 'এটা কী হাসি ভাই?'

হেসে জবাব দিলাম, 'যে হাসিই হোক, তোমার হাসির চেয়ে ঢের নিরাপদ। এ হাসিতে মনে তো নয়ই, এমন কি জামা-কাপড়েও স্থায়ী ছাপ রেখে যায় না।'

জাল সাহেবের গলা শুনলাম, 'সব কো বুলাকে জঙ্গল চলো।' সেনাপতির মতো হুকুম দিয়েই স্ট্যান্ডসুদ্ধ ক্যামেরাটি ঘাড়ে করে জঙ্গলের পথ ধরলেন জাল সাহেব। সহকারীর দল ছুটোছুটি করে ঐ দেড়শ দু'শ চীনেম্যান নিয়ে সঙ্গে চলল। মনমোহন

আর আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো কৌতূহলী হয়ে চলতে শুরু করলাম।

একটু যেতেই অসিত আর জগন্নাথ কাছে এসে বলল—' আর এগিয়ো না ভাই। দেখছো তো সাহেবের মেজাজ, তার উপর কড়া হুকুম দিয়েছে, যাদের কাজ আছে তারা ছাড়া কেউ যেন জঙ্গলে না ঢোকে।'

অগত্যা ফিরে গিয়ে আমগাছতলায় দু'খানা ভাঙা নড়বড়ে টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

একটু পরে বহু লোকের সম্মিলিত বিকট হাসির আওয়াজ ভেসে এল জঙ্গলের দিক থেকে। অনুমানে বুঝলাম, চোখ রাঙিয়ে বা ভয় দেখিয়ে ঐ চীনের পালকে হাসাতে শুরু করেছেন জাল সাহেব।

বেলা প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। মনমোহনকে বললাম, 'চল বাড়ি যাওয়া যাক। ওদের ঐ জঙ্গলপর্ব শেষ হতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

নীরব সম্মতি দিয়ে উঠে দাঁড়াল মনমোহন। গল্প করতে করতে দু'জনে গেটের কাছে এসে পড়লাম। হঠাৎ দেখি, একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে হন্তদন্ত হয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কাছে এলে চিনলাম, ভবেশ। ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী ভবেশ? ও-রকম করে ছুটে চলেছ কোথায়?'

দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে বলল ভবেশ, 'আপনাদের কাছেই আসছিলাম।'

বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, 'তার মানে!'

ভবেশ বলল, 'এর মধ্যেই চললেন কোথায়?'

বললাম, 'বাড়ি।'

বিজ্ঞের মতো একটু হেসে বলল ভবেশ, 'নাচ না দেখে বাড়ি যাবেন না। সারা জীবনের মতো আফসোস থেকে যাবে।'

মনমোহন আর আমি প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'নাচ! কোথায়?'

একনিশ্বাসে বলে গেল ভবেশ, 'একটা অপূর্ব সুন্দরী বাঙালি মেয়েকে নিয়ে এসেছেন জাল সাহেব এই ছবিটায় একটা নাচের জন্যে। একটা সিনের ছোট্ট একটা নাচের পারিশ্রমিক পাঁচশ' টাকা। বেলা দুটো থেকে তিনটে ড্রেসার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাকে পোশাক পরাতে, এখনও শেষ হয়নি।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'ভবেশ, তোমার উপকার জীবনে ভুলব না। এ নাচ না দেখে যদি বাড়ি যাই, সারা জীবন তীব্র অনুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরলেও তার ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হবে না।'

আর কোনও কথা না বলে অ্যাবাউট টার্ন করে স্টুডিওয় ঢুকতে যাব, পিছনে জামাটায় টান পড়ল। ফিরে দেখি মনমোহন। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বলল, 'আমি বলছি নাচের এখনও বেশ দেরি আছে। ততক্ষণ চ' না ভাই, মোড়ের দোকান থেকে এক কাপ চা আর পান খেয়ে আসি।'

ভেবে দেখলাম, কথাটা মন্দ বলেনি মনমোহন। এতক্ষণ ভুলে একরকম ছিলাম ভাল। মনে করিয়ে দিতেই প্রাণটা চা-চা করে আর্তনাদ করে উঠল। চেয়ে দেখি, লোভাতুর দৃষ্টিটা গোপন করবার অছিলায় অন্য দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভবেশ। বললাম, 'এত বড় একটা সুখবর এনেছ, প্রতিদানে অন্তত এক কাপ চা না খাওয়ালে নেমকহারামি হবে, এস ভবেশ।' তিনজনে দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটতে হাঁটতে টালিগঞ্জের তেমাথায় সবেধন নীলমণি দোকানটিতে ঢুকে তিন কাপ চা ও তিনটে ওমলেটের অর্ডার দিয়ে বাইরের বেঞ্চিটায় বসে পড়লাম।

তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সূর্য হেলে পড়েছে টালিগঞ্জের তেমাথার বৃহৎ বটগাছটার আড়ালে। খানিকটা নিস্তেজ হলদে রোদ ছিটকে এসে পড়েছে স্টুডিওর সিমেন্ট-বাঁধানো চত্বরটার উপর। তারই শেষপ্রান্তে কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের একটা জমকালো সিন টাঙিয়ে, মেঝেয় বহুমূল্য কার্পেট বিছিয়ে, আশেপাশে কয়েকটা টেবিল সাজিয়ে একটা কক্ষের দৃশ্য করা হয়েছে আর সেই কক্ষের ঠিক মাঝখানে কার্পেটের উপর বিচিত্র পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে নর্তকী বীণা।

এত ভিড় ম্যাডান স্টুডিওয় এর আগে কখনো দেখিনি। অতি কষ্টে দুহাতে ভিড় ঠেলে আমি আর মনমোহন একটু একটু করে সামনে এগোতে লাগলাম। আশেপাশের মৃদু গুঞ্জনের কয়েকটা টুকরো কানে এল। 'কী আইডিয়া দেখেছিস!' 'এই জন্যেই জাল সাহেবকে ম্যাডান কোম্পানি মাসে হাজার টাকা মাইনে দেয়।' 'মেয়েটা কী সুন্দর দেখতে —ওকে হিরোইন করলেই ঠিক হতো—' ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিগুণ উৎসাহে সামনে এগিয়ে চললাম। বেশ খানিকটা কাছে এসে বীণাকে দেখলাম। হ্যাঁ, সত্যিই দেখবার মতো। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, রং বেশ ফরসা, আর তারই সঙ্গে মিল রেখে নাক চোখ মুখ নিখুঁত সুন্দর। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ এনে মনমোহন বলল, 'এটা কোন দেশী পোশাক ভাই?'

এতক্ষণে মেয়েটির পোশাকের দিকে নজর পড়ল। সত্যিই অবাক হবার কথা। বাঙালি মেয়েদের ধরনে একখানা দামী গাঢ় নীল রঙের বেনারসী পরা। সোনালী জরির কাজ করা মোগল আমলের দু'তিনটে লাউড রঙের বিচিত্র ব্লাউজ, জাহাঙ্গীর বাদশার আমলের ভারী ভারী জড়োয়া গয়নায় বাহু-গলা-কান ভর্তি। মাথায় আধুনিক ফাঁপানো খোঁপায় লাল নীল সাদা ফুল গোঁজা। পাতলা ফিনফিনে গোলাপী ওড়নাটা মাথা থেকে বুকের দুপাশে ঝোলানো, পায়ে মেমসাহেবদের হাই-হিল জুতো। এ যেন বিস্মৃতির অতলে ফেলে আসা দু'তিনটে যুগকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে এনে বর্তমানের সঙ্গে মিল খাওয়ানোর চেষ্টা।

হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল মনমোহন। আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে পান-দোক্তা

খাওয়া মুখখানা কাঁধের উপর ঘষতে ঘষতে অতি কষ্টে বলল—'জাল সাহেবের দিকে চেয়ে দ্যাখ!'

দেখলাম স্ট্যান্ডটাকে যথাসম্ভব ছোট করে তার উপর ক্যামেরা বসিয়ে বাঁ চোখটা ভিউ-ফাইন্ডারের উপর চেপে হাত দিয়ে ডান চোখটা টিপে ধরে উটের মতো এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন জাল সাহেব। ঘামে ভিজে ব্লু-ব্ল্যাক পার্শি-কোটটার বুক, পেট, পিঠ ও হাত দুটো আবলুস কাঠের মতো আরও কালো দেখাচ্ছে। অবশিষ্ট কয়েকটি অংশ ঘামের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অতি কষ্টে নিজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে লজ্জায় নীল হয়ে ফ্যালফ্যাল করে সবার দিকে চেয়ে আছে। টুপি মাথায় থাকলে ক্যামেরার মধ্য দিয়ে দেখার অসুবিধা হয়, তাই সেটা খুলে ক্যামেরার হ্যান্ডেলটার উপর ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। হাসি আসাই স্বাভাবিক। হঠাৎ ক্যামেরা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন জাল সাহেব। বদরাগের ডিনামাইট দিয়ে ঠাসা গোমড়ামুখো লোকটা হঠাৎ যেন কোন যাদুমন্ত্রে আগাগোড়া বদলে গেছে। হাসি-খুশিতে মাংসবহুল গোল মুখখানা আরও গোল হয়ে উঠেছে। দেখলাম, ঘামে স্যাঁতসেঁতে মুখখানা ও টাকবহুল মসৃণ মাথাটা জামার হাতা দিয়ে বেশ যত্ন করে মুছে নিলেন জাল সাহেব। তারপর হেলেদুলে গজেন্দ্রগমনে বীণার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরে হঠাৎ দেখি, হাত দিয়ে বীণার ডান বুকের ওড়না সরিয়ে দিলেন, তারপর একগাল হেসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। লজ্জায় লাল হয়ে মুখ নীচু করে রইল মেয়েটা। বুঝলাম, এবার বক্স আফিসের দিকে নজর দিয়েছেন জাল সাহেব।

চুপিচুপি মনমোহনকে বললাম, 'এই না হলে বড় ডিরেক্টর! দেখেছিস সব দিকে কী রকম কড়া নজর!'

উত্তরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল মনমোহন, বলা হল না। বিজয়গর্বে ফিরে এসে ক্যামেরার কাছে দাঁড়ালেন জাল সাহেব। জগন্নাথ, অসিত ও একটি অবাঙালি সহকারী কাছে এসে বলল, 'একটা কথা স্যার, অনেকক্ষণ ধরে—'

কথা শেষ করতে পারল না ওরা, হঠাৎ ডিনামাইটে আগুন লেগে গেল। অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব, 'গেট আউট, অল অফ ইউ। বাত নেহি মাংতা, কাম মাংতা। সমঝা? ইউ ফুলস!'

রাগে ক্যামেরার হাতল থেকে টুপিটা উঠিয়ে নিয়ে চেপে মাথায় বসিয়ে দিলেন জাল সাহেব। তারপর ক্যামেরার লেন্স-এর মধ্যে চোখ দিয়ে দেখতে লাগলেন। নিস্তব্ধ জনতা ভয়ে বিস্ময়ে একটা কিছু অঘটন ঘটবার প্রত্যাশায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, ঘটলও তাই।

ক্যামেরায় চোখ রেখে ডান হাতখানা নীচু থেকে উপরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বললেন জাল সাহেব, ' শাড়ি উঠাও, বীণা শাড়ি উঠাও।'

ভয়ে বিস্ফারিত চোখে বীণা চেয়ে রইল জাল সাহেবের দিকে। অপেক্ষমাণ জনতার ভেতর থেকেও খুশির কি বিস্ময়ের জানি না, একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ চোখে চারদিক দেখে নিয়ে হাত ইশারায় সহকারীদের কাছে ডাকলেন জাল সাহেব। তারপর গলাটা একটু খাটো করে বীণাকে দেখিয়ে বললেন, 'উসকো উধার লে যাও, আওর আচ্ছা করকে সমঝা দো, হোয়াট আই ওয়ান্ট।'

কক্ষের শেষ প্রান্তে খালি একটা সোফায় বীণাকে নিয়ে বসাল জগন্নাথ। তারপর হাত-মুখ নেড়ে দু'তিন জনে কী বোঝাতে লাগল, আর মাটির দিকে চেয়ে বীণা খালি মাথা নেড়ে চলল।

মনমোহনকে বললাম, 'চল বাড়ি যাই, এদিকে সন্ধ্যেরও তো আর দেরি নেই।'

আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মনমোহন বলল, 'পাগল হয়েছিস, এর শেষ না দেখে যাবি কোথায়? আর রোদ্দুর না থাকলেও জাল সাহেবের ক্যামেরায় ছবি ওঠে। ওর লেন্স খুব পাওয়ারফুল।'

ভাবলাম, হবেও বা।

ইতিমধ্যে হতাশ করুণ মুখে বীণা এসে দাঁড়িয়েছে স্বস্থানে। দ্বিগুণ উৎসাহে জাল সাহেব ক্যামেরা নিয়ে ফোকাস করতে শুরু করে দিলেন। এবার ক্যামেরাটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বীণার পায়ের উপর। ঐভাবে ক্যামেরা ফিট করে আবার এগিয়ে বীণার ডান দিকের বুকের ওড়না সরিয়ে দিলেন জাল সাহেব। মনমোহন ফিসফিস করে আমার কানের কাছে বলল, 'ফটো যখন তুলছে পায়ের, তখন বারবার ওর বুকের ওড়না সরাচ্ছে কেন ভাই?'

বেশ একটু বিরক্ত হয়েই চাপাগলায় বললাম, 'ওরে মুখ্যু, ঐ ক্যামেরা যখন পায়ের দিক থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে মুখ তুলে বীণার সারা দেহের উপর চোখ বোলাবে, তখন বুঝতে পারবি।'

বুঝতে পেরেই বোধহয় চুপ করে গেল মনমোহন।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ ও অসিত বিবর্ণ মুখে পরস্পরকে জাল সাহেবের দিকে ইশারা করে কী যেন বলতে বলছে, কিন্তু দেখলাম শেষ পর্যন্ত কেউই সাহস করে এগোতে পারল না। শুটিং শুরু হল। ঐ হুমড়ি খেয়ে পড়া ক্যামেরায় চোখ ঢুকিয়ে একটা কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে ডান হাত দিয়ে ক্যামেরা ঘোরাতে শুরু করলেন জাল সাহেব। একটু পরেই জাল সাহেবের গলা শুনতে পেলাম, 'শাড়ি উঠাও বীণা, শাড়ি উঠাও!'

সবিস্ময়ে দেখলাম ভীত চকিত চোখদুটো দিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে লজ্জানত মুখে আস্তে আস্তে ডান পায়ের দিকের শাড়িটা গুটিয়ে উপরে ওঠাতে শুরু করল বীণা। কৌতূহলী জনতা লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে যেন ভেঙে পড়ল পায়ের উপর । বেশ

একটু শঙ্কিত হয়ে মনে মনে ভাবলাম, বক্স আফিস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এবার কি জাল সাহেব কর্পোরেশনের কোনো বিশেষ ডিপার্টমেন্টের দিকে নজর দিতে চলেছেন?

সন্দেহভঞ্জন হতে দেরি হল না। বীণা হাঁটু পর্যন্ত শাড়িটা তুলেছে, আর হাঁটুর আঙুলছয়েক নীচে নকল সোনার চওড়া একটা ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা গোল রিস্টওয়াচ। হঠাৎ মনে হল যেন ঘড়িটা আমাদের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে নির্লজ্জের মতো হাসছে। ভাবলাম আর কিছুদিন যদি সুস্থ দেহে বেঁচে থাকেন আর এইরকম তিন-চারখানা নাচের ছবি তোলেন জাল সাহেব, তাহলে নারীদেহে রিস্টওয়াচের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কল্পনা করেই আতঙ্কে চোখ বুঁজে ফেললাম।

জাল সাহেবের গলা শুনতে পেলাম, 'নাচো বীণা, হাঁ, অ্যায়সে শাড়ি পাকড়কে নাচো ভাই!'

গালচের উপর শাড়িখানা হাঁটু পর্যন্ত তুলে নাচতে শুরু করেছে বীণা। একটু পরেই দেখি ক্যামেরার হাতল বন্ধ হয়ে গেছে, কালো কাপড় দিয়ে মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে বেঁকে ক্যামেরার লেন্সে চোখ লাগিয়ে, কালো পার্শি-কোটে ঢাকা প্রকাণ্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা হেলিয়েদুলিয়ে নেচে চলেছেন জাল সাহেব। হঠাৎ ছেলেবেলায় পড়া 'আবোল তাবোল'-এর একটি বিখ্যাত কবিতার প্রথম লাইনটা মনে পড়ে গেল, 'যদি কুমড়োপটাশ নাচে।' নাচতে নাচতে মুখে তারিফ করতে লাগলেন জাল সাহেব, 'বহুত আচ্ছা মেরে জান, ভেরি গুড!' হঠাৎ বোধহয় মনে পড়ে গেল যে ক্যামেরা চলছে না। নাচ থামিয়ে উৎসাহভরে ক্যামেরা ঘোরাতে শুরু করলেন আবার। এইভাবে আরো দশ মিনিট ধরে চলল ঐ অদ্ভুত নাচ। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেদিনকার মতো শুটিং শেষ করতে হল। বাহ্য জগতে ফিরে এসে দেখি বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে।

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত অবশ দেহে একটা সোফার উপর এলিয়ে পড়ে সদ্য ডাঙায় তোলা একটা বৃহৎ কাতলা মাছের মতো হাঁপাতে লাগলেন জাল সাহেব।

সামনে চেয়ে দেখি এরই মধ্যে কাপড় বদলাতে বীণা চলে গিয়েছে মেক-আপ রুমে। আশাহত দর্শকের দল ক্ষুণ্ণ মনে একে একে সরে পড়তে শুরু করেছে। অনুসন্ধানী চোখ দিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও মনমোহনকে কোথাও দেখতে পেলাম না। অবাধ্য হাসি সামলাতে অথবা পান-দোক্তা খেতে সে এরই মধ্যে কখন নিঃশব্দে চম্পট দিয়েছে। আমি কিন্তু তখনও হাসিনি। কী জন্যে জানি না চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু বাদে খানিকটা সুস্থ হয়ে সোফার উপর উঠে বসলেন জাল সাহেব। তারপর হাত ইশারায় সহকারীদের কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বোলো,

ক্যা বোলনে চাহতা থা?'

জগন্নাথ মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলল, 'এখন আর বলে কী হবে স্যার!'

বিস্ফারিত চোখে হুংকার ছাড়লেন জাল সাহেব, 'হোয়াট!'

সাহস করে এগিয়ে এসে অসিত বলল, 'সকাল থেকে যতবার কথাটা আপনাকে বলতে এসেছি, দুর দুর করে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব, 'মগর মামলা ক্যা হ্যায়?'

জগন্নাথ কুঁইকুঁই করে বলল, 'আজ সারাদিন খালি ক্যামেরায় ছবি তুলেছেন, ওতে ফিল্ম পরানোই হয়নি।'

কোনো জবাব না দিয়ে আবার সোফায় শুয়ে পড়লেন জাল সাহেব। আর আমি? কোনোরকমে দম বন্ধ করে এক রকম ছুটেই স্টুডিওর গেট পার হয়ে দু'হাত দিয়ে পেটটাকে চেপে ধরে হাসতে হাসতে বসে পড়লাম রাস্তার উপর।

স্টুডিও থেকে বাড়ি এসে যতক্ষণ জেগেছিলাম সবাইকে জাল সাহেবের ঐ বিচিত্র নাচ দেখালাম। মা পর্যন্ত হেসে খুন। রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম রায়বাহাদুরের কলেজে-পড়া মেয়ে গোপাকে। হাতে ফুলের মালা নিয়ে ছাদের আলসের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চোখ দুটো দিয়ে যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গোপা। ওর দৃষ্টিপথে পড়ার অনেক রকম চেষ্টাই করলাম, কিন্তু সব বৃথা। আমি যখন রিনিদের ছাদে পায়চারি করি ও তখন নীচু হয়ে খোঁজে নীচের রাস্তায় অথবা রিনিদের দোতলার জানলায়। আবার আমি যখন নীচে দোতলার জানলার ধারে দাঁড়াই, ও তখন চোখ তুলে খোঁজে রিনিদের ফাঁকা ছাদটায়!

ঘুম ভাঙল, না বাঁচলাম! জেগে দেখি, বেশ বেলা হয়ে গেছে। রবিবার, কারও কাজের তাড়া নেই, আরও কিছু সময় চোখ বুঁজে শুয়ে থাকলাম। উঠে মুখ-হাত ধুয়ে জগুবাজার থেকে একজোড়া জুতো কিনে আনলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে সেদিন একটু বেলাই হল। তারপর প্রসাধন-পর্ব শেষ করে যখন খিদিরপুরে রিনিদের বাড়ি রওনা হলাম তখন প্রায় বেলা একটা। হেমচন্দ্র স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ছোট্ট একটা গলি সোজা উত্তরমুখো গিয়ে যে বাড়িটার সামনে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে সেইটাই হল রিনিদের বাড়ি। কড়া নাড়তে না নাড়তেই রিনি এসে দরজা খুলে দিল।

বললাম, 'কী করে বুঝলি, আমি? আমি না হয়ে ইয়া দাড়িওয়ালা কাবুলিওয়ালাও তো হতে পারত!'

—'বা রে, তা হবে কেন! উপরের বারান্দা থেকে দেখলাম যে তুমি বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকছো। তাছাড়া আমি জানতাম তুমি আসবেই।' বলেই এমন একটা দুষ্টুমিভরা হাসি হাসল রিনি যে দেখলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়!

বাইরের দরজায় খিল লাগাতে লাগাতে বললাম, 'আজকাল বড্ড বেড়ে উঠেছিস,

দাঁড়া কাকাকে বলে মজা দেখাচ্ছি।'

—'বেশ, বেশ। দাও বলে তোমার কাকাকে।' অভিমানভরে দুমদুম করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল রিনি।

মনে মনে ভাবলাম, রিনির রাগ জল করার ওষুধ তো আমার হাতেই রয়েছে— পার্ল হোয়াইটের 'দি আয়রন ক্ল'।

সদর দরজা খুললেই পড়ে দরদালান। উত্তরমুখো দুখানা ঘর। একখানায় রান্না হয়, অন্যটি কাকিমার ভাঁড়ার। পশ্চিমদিকে একটা দরজা, সেটা খুললেই দেখা যায় লম্বা একখানা ঘর। সেইটা বাইরের ঘর। কাকার আফিসের লোকজন অথবা বন্ধুবান্ধব কেউ ছুটির দিনে এলে সেইটাতে বসে। পুবদিক দিয়ে উপরে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরেও ঠিক নীচের মতো চওড়া বারান্দা বা দরদালান, আর তিনখানা ঘর, ঠিক একতলার মাপে। বারান্দায় একখানা চওড়া তক্তপোশ পাতা, মাদুর বা শতরঞ্চি কিছু নেই। রিনি তারই একপাশে গুম হয়ে বসে একখানা খাতায় হিজিবিজি কাটছে।

বললাম, 'কাকা কোথায়·রে রিনি?'

কোনো জবাব না দিয়ে মুখ গুঁজে বসে রইল রিনি। বুঝলাম অভিমান হয়েছে। আস্তে আস্তে ওর পাশে বসে আদর করে কাছে টেনে এনে বললাম, 'দূর বোকা মেয়ে, দাদার কথায় রাগ করতে আছে? কাকা কোথায়?'

রাগ জল হয়ে গেল রিনির। চুপিচুপি পশ্চিমের বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে বলল— 'বাবা মা ঘুমোচ্ছে। ছুটির দিন হলেই বাবা দুপুরে লম্বা ঘুম দেয়।'

পিছন ফিরে দেখলাম, রিনির ছোট ভাই আর বোনটা একরাশ খাতাবই-এর মাঝখানে দিব্যি হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। আর কথা খুঁজে পাই না, চুপচাপ বসে রইলাম। বলি বলি করেও গোপার কথাটা রিনিকে কিছুতেই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, কেমন লজ্জা করতে লাগল। আর হতভাগা মেয়েটাও সেদিক দিয়ে একদম মাড়াল না। কী করি, অগত্যা ওদেরই একখানা পাঠ্যপুস্তক টেনে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। খুট করে জানলা খোলার আওয়াজ হতেই বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল রিনি দক্ষিণদিকের জানলার কাছে, তারপর ফিরে এসে কোনো কথা না বলেই আমার হাত ধরে টানতে শুরু করে দিল। কী একটা আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, মুখে একটা আঙুল দিয়ে আমায় কথা না কইতে ইশারা করল রিনি। তারপর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ছাদে উঠে দক্ষিণদিকের আলসের কাছে এসে হাত ছেড়ে দিল রিনি। রিনিদের বাড়ি থেকে মাত্র হাততিনেক ব্যবধান, তার পরেই দক্ষিণের সমস্ত আলো-হাওয়া গ্রাস করে বিরাটকায় দৈত্যের মতো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে রায়বাহাদুরের প্রাসাদোপম প্রকাণ্ড অট্টালিকা। রিনিদের ছাদ থেকে মুখোমুখি পড়ে

একটা দোতলার জানলা, তারই একটা লোহার গরাদ ধরে এলোচুলে রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যার মতো দাঁড়িয়ে আছে গোপা। পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার হলো না, আমার কল্পনায় আঁকা গোপার সঙ্গে হুবহু না হলেও অনেকখানি মিল আছে। গোপাই আগে হাসিমুখে নমস্কার জানাল, হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে অপলক চোখে চেয়ে রইলাম।

রিনি বলল, 'ছোড়দা।'

গোপা বলল, 'জানি।'

সমুদ্রের রহস্যভরা দুটি কালো হরিণচোখ আর আজানুলম্বিত কোঁকড়া মেঘবরণ চুলের পাহাড়, মাত্র এই দুটিতে যে নারীসৌন্দর্য কত গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে, গোপাকে চোখে দেখার আগে তা উপলব্ধি করা যায় না। শান্ত অসীম কাব্যসমুদ্রে কোন সে কালো মেয়ের কালো হরিণচোখ দুটি কী করে তুফান তুলেছিল, আজ তা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। আরও বুঝতে পারলাম, ধপধপে ফরসা রঙের সঙ্গে ঐ চোখ আর চুল ঠিক খাপ খায় না। গোপার রং খুব কালো না হলেও বেশ চাপা, নাক চোখ দেহের গড়ন এককথায় নিখুঁত। গোপা যেন চুম্বকের মতো শুধু আকর্ষণ করে, ইচ্ছে করলেও ফেরা যায় না। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে নির্লজ্জের মতো শুধু চেয়েই আছি, স্বপ্ন ভাঙল রিনির কথায়।

—'বারে, তোমরা তো বেশ লোক গোপাদি। এদিকে তো আলাপ করবার জন্য পাগল। যেই আলাপ করিয়ে দিলাম, ব্যস, আর কথা নেই, একদম চুপচাপ। যাই বাবা, সামনে এগজামিন, পড়াশুনা করিগে যাই। এখুনি বাবা উঠে যদি দেখেন আমি পড়ছি না, বকুনি লাগাবেন।'

গোপা হেসে জবাব দিল, 'তুমি আরো কিছুক্ষণ নির্ভয়ে এখানে থাকতে পারো রিনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার বাবা-মার রুদ্ধ দুয়ার এখনও খোলেনি।'

সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললাম, 'এতদিন একটা ভুল ধারণা বুকের মধ্যে যত্ন করে পুষে রেখেছিলাম। আজ আপনাকে দেখে সেটা শুধরে নিলাম।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল গোপা। ভীত শঙ্কিত চোখে শুধু বলল, 'কীসের ধারণা?'

আমি আজ মরিয়া। বললাম, 'এতদিন জানতাম সুন্দরী আখ্যা পেতে হলে রং ফরসা হওয়াটা এসেনশিয়াল। আজ বুঝলাম, মস্ত ভুল ধারণা।'

খুশি হলো কিনা বুঝলাম না, কিন্তু লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়ে নীচের গলিপথের দিকে চেয়ে রইল গোপা।

রিনি বলল, 'গোপাদি কী বলে জান ছোড়দা? বলে, তোমার ছোড়দা সীতা দেবী, ললিতা দেবী আরও কত সব সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে অভিনয় করেন। আমার মতো একটা কালো কুৎসিত মেয়ের সঙ্গে হয়তো ঘেন্নায় কথাই কইবেন না।'

বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই রিনিকে বললাম, 'ঐ কালো কুৎসিত মেয়ের কাছে

দাঁড়াবার যোগ্যতাও ওদের—'

কথাটা শেষ হল না। এরই মধ্যে কখন নিঃশব্দে জানলা বন্ধ করে সরে পড়েছে গোপা। সমস্ত উৎসাহ উত্তেজনা নিমেষে নিভে জল হয়ে গেল।

কাছে ঘেঁষে এসে চুপিচুপি বলল রিনি, 'গোপাদি ওভাবে চুপিচুপি জানলা বন্ধ করে সরে পড়ল কেন, কিছু বুঝতে পারলে ছোড়দা?'

ঐ বিরাট বন্দীশালার বন্ধ জানলাটার দিকে চেয়ে শুধু ঘাড় নাড়লাম।

রিনি বলল, 'মাকে গোপাদি বাঘের মতো ভয় করে। তাছাড়া, তিনি ভয়ানক সেকেলে। সিনেমা-থিয়েটার দেখা একদম পছন্দ করেন না। তার উপর যদি দেখেন তোমার সঙ্গে আলাপ করছে গোপাদি—। মায়ের সাড়া পেয়েই গোপাদি পালিয়েছে। এস ছোড়দা, নীচে যাই। এক্ষুণি বাবা-মা উঠে আসবেন।'

নীচে নেমে এলাম। রিনির ছোট ভাই ও বোনটা তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছে। একখানা ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক আমার হাতে গুঁজে দিয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে রিনি বলল, 'আমায় একটা ডিকটেশন দাও না ছোড়দা।'

তারপর গলাটা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল—' আজ আর গল্প শোনা হল না। বাবা-মা ঘরে কথা কইছেন, এক্ষুণি দরজা খুলবেন।'

ডিকটেশনের মাঝখানেই কাকিমা দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমাকে দেখেই হেসে বললেন, 'তবুও ভাল, গরিব কাকা-কাকিমার কথা মনে পড়েছে ছেলের।'

বললাম, 'ওসব পোশাকি ফরম্যালিটি শিকেয় তুলে রেখে দিয়ে শিগগির শিগগির এক থালা গরম লুচি, হালুয়া আর এককাপ চা খাওয়াও কাকিমা। ক্ষিধেয় একদম কথা বলতে পারছি না।'

হেসে ঝি মোক্ষদার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে নীচে নেমে গেলেন কাকিমা। ইতিমধ্যে কখন কাকা এসে পাশে বসেছেন জানতে পারিনি। রিনির ডিকটেশন শেষ করে সেই বইটারই পাতা ওল্টাতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ কোনো রকম ভূমিকা না করেই কাকা বললেন, 'এই যে সিনেমায় নামছিস, এর জন্যে মাসে মাসে কত দেবে ওরা তোকে?'

কাকার ঈর্ষার আগুনটা হাওয়া দিয়ে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম-- 'এখন দেড়শ টাকা করে দিচ্ছে, 'কালপরিণয়' ছবি রিলিজ হলে পাঁচশ করে দেবে।'

বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলে কাকা বললেন—'পাঁ-চ-শ!'

সহজভাবেই বললাম, 'হ্যাঁ, এ আর বেশি কী! সিনেমা দিন দিন যে রকম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে বছরখানেক বাদে হাজারখানেক টাকা মাসে অনায়াসে রোজগার করা যাবে।'

বাকশক্তি রহিত হয়ে গোপাদের প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে

বসে রইলেন কাকা।

টাটকা গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজার ক্ষিধে-বাড়ানো গন্ধ নীচ থেকে ভেসে এল। রিনির ছোট ভাইবোন দুটো আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। ঐভাবে গোপাদের বাড়ির দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চেয়েই কাকা বললেন, ' তুই বলিস কী? বি-এ, এম-এ পাশ করে একশ টাকা রোজগার করতে পারলে লোকে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। আর শুধু রং মেখে মাগিদের সঙ্গে নেচে-গেয়ে তোরা অত টাকা রোজগার করবি?'

বেশ বুঝতে পারলাম, কিছুদিনের জন্যে কাকার আহার-নিদ্রার রীতিমত ব্যাঘাত সৃষ্টি করে গেলাম।

নীচ থেকে রিনির ডাক পড়ল। বাপের সামনে থেকে উঠতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রিনি। চেয়ে দেখি, ছোট ভাইবোন দুটিও এই অছিলায় ঘুমজড়ানো কুৎকুতে চোখে সভয়ে বাপের দিকে চাইতে চাইতে রিনির পিছু নিয়েছে। অন্য সময় হলে এ-দৃশ্য দেখে হেসে ফেলতাম, কিন্তু কাকার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে সে ইচ্ছা দমন করলাম। কাটা ঘায়ে নুনের প্রলেপ দেবার এমন সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছা হল না। মুখখানা যথাসম্ভব কাঁচুমাচু করে হতাশার ভঙ্গিতে বললাম, 'টাকাটাই শুধু দেখলেন কাকা! সামাজিক বয়কট, তাচ্ছিল্য, শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ঘেন্না এইরকম কতগুলো ঝক্কি মাথায় নিয়ে ঐ টাকাটা রোজগার হবে সেটা একবার ভেবে দেখলেন না?'

অধৈর্য হয়ে একরকম চেঁচিয়েই উঠলেন কাকা, 'বাজে, মিথ্যে কথা। আমিও প্রথমে তাই মনে করেছিলাম। এখন দেখছি, ভুল করেছিলাম। এই তো আমার সামনের বাড়ির রায়বাহাদুর, সেদিন আফিস থেকে ফেরার সময় গেটের সামনে দেখা। প্রথমেই বলে বসলেন—ধীরাজ ভট্টাচার্য আপনার ভাইপো? চমৎকার চেহারা ছেলেটির, আর অভিনয়ও বেশ ভালই করেছে। বেশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি সিনেমা-থিয়েটারের একজন ভক্ত তাতো জানা ছিল না!

একগাল হেসে জবাব দিলেন রায়বাহাদুর — ভক্ত-টক্ত নই মশাই, 'গিরিবালা' ছবিটা প্রথমত রবি ঠাকুরের গল্প। তার উপর আমার মেয়ে গোপা তিন চারবার দেখেছে। সেই-ই একদিন জোর করে দেখিয়ে আনল। তা মন্দ লাগেনি মশাই।'

চুপ করে বসে রইলাম। কাকাই একটু পরে আবার শুরু করলেন, 'তাছাড়া, আমাদের আফিসের বড়বাবু থেকে শুরু করে প্রায় সবাই দেখে এসেছে। তাই ভাবছি, শিক্ষাদীক্ষার কোনো দামই রইল না। দেশটা দিন দিন রসাতলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

শিক্ষিত ভদ্রসমাজের হঠাৎ অধঃপতনে কাকার আক্ষেপোক্তি আরও হয়তো শুনতে হতো, বাঁচিয়ে দিল রিনি। সিঁড়ির মাঝ-বরাবর উঠে ডাকল, 'এস ছোড়দা, খাবার দেওয়া হয়েছে।'

কাকার সামনে থেকে উঠে আসবার একটা সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেলাম।

বাড়ি ফিরেই শুনলাম দু'তিনবার স্টুডিও থেকে লোক এসেছিল ডাকতে, দেখা না পেয়ে বলে গেছে, যখনই বাড়ি ফিরি অতি অবশ্য যেন একবার স্টুডিওতে গিয়ে পরিচালক জ্যোতিষ বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা করি। রবিবার হঠাৎ এরকম জোর তলব! সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে টালিগঞ্জের ট্রামে উঠে বসলাম। গেট পেরিয়েই দেখি অগতির গতি আমগাছতলায় কয়েকখানা ভাঙা চেয়ার ও টুল পেতে জটলা করছেন পরিচালক জ্যোতিষবাবু, মনমোহন, একাধারে গাঙ্গুলীমশায়ের সহকারী ও এডিটর জ্যোতিষ মুখুজ্যে এবং আরও দু' তিনজন গোল টুপি পরা অবাঙালি। আমায় দেখতে পেয়েই হৈহৈ করে উঠল মুখার্জি ও মনমোহন।

মুখুজ্যে বলল, 'এই যে ডুমুরের ফুল! এক দণ্ড বাড়িতে থাকো না, যাও কোথায়?'

আমি কিছু বলবার আগেই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খুঁকখুঁক করে খানিকটা হেসে নিল মনমোহন। তারপর বলল, 'বুঝলে মুখুজ্যে, এখন থেকেই ওকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না, এরপর 'কালপরিণয়' রিলিজ হলে কলকাতাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।' আবার সারা দেহ কাঁপিয়ে হাসতে লাগল মনমোহন। কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'ওহে বড় অ্যাক্টর! না হয় 'কালপরিণয়ে' ভাল অভিনয়ই করেছ। কিন্তু এ গরিবকে ভুলে যেও না। আমিই 'সতীলক্ষ্মী' ছবিতে তোমাকে প্রথম চান্স দিয়েছিলাম।'

বললাম, 'দয়া করে হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলবেন কি?'

মুখুজ্যে বলল, 'আসল কথাটা হলো জ্যোতিষবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ছবি তুলবেন ঠিক করেছেন। তাতে তোমায় নায়কের পার্ট, মানে হেমচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।'

বললাম, 'এরই জন্যে এত জোর তলব? দয়া করে হুকুম করলেই তো হতো।'

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'এই মাসেই বইটা আরম্ভ করতে চাই। কাজেই এখন থেকে তোড়জোড় না করলে শুরু করতে পারব না। এ তো আর সোশ্যাল বই নয়, রীতিমতো ঐতিহাসিক উপন্যাস। পোশাক-আশাক, গয়না-কাপড়, সিন-সিনারি সব সময়োপযোগী হওয়া চাই। সেইজন্যে তোমার পোশাকের মাপ নেবার বিশেষ দরকার। মেক-আপ রুমে কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের দর্জি মকবুল ফিতে-পেন্সিল নিয়ে বসে আছে, দয়া করে মাপটা দিয়ে এসো।'

নানা রকমের জামা সালোয়ার পাগড়ি প্রভৃতির মাপ দিয়ে যখন আমতলায় ফিরলাম তখন মনমোহন ও মুখুজ্যে সরে পড়েছে। একাই একখানা চেয়ারে বসে

সিগারেট খাচ্ছিলেন জ্যোতিষবাবু। আমায় দেখেই উঠে পড়ে বললেন, 'আর বসা নয়, চল বাড়ি যাই । রাত প্রায় ন'টা বাজে।'

পথে যেতে যেতে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'তুমি তো এক্ষুণি ভবানীপুরে নেমে যাবে। আমায় যেতে হবে সেই হাওড়ায়, গোলাবাড়ি থানার কাছে।'

বললাম, 'আপনি বসে না থেকে চলে গেলেই তো পারতেন।'

—'বাপ রে, হিরোকে একা রেখে চলে যাই আর কাল এসে শুনব আমার চাকরিটি খতম।'

হেসে ফেললাম। বললাম, 'আমাকে নিয়ে আপনারা এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন বলুন তো?'

ট্রাম স্টপেজের কিছু দূরে হঠাৎ থেমে চারদিক দেখে নিয়ে প্রায় আমার কানে কানে বললেন জ্যোতিষবাবু, 'বাড়াবাড়ি একটুও নয় ভাই। তোমাকে হেমচন্দ্রের পার্ট দিতে চাই শুনে গাঙ্গুলীমশাই প্রবল আপত্তি তুলে বললেন, না না, সে হবে না। 'কালপরিণয়ের' পরই আমি 'দেবীচৌধুরাণী' ধরব। ওকে ছাড়তে পারি না। শেষকালে ম্যাডানের মেজ ছেলে ফ্রামজীকে ধরে তবে পারমিশন পেলাম। সবে ঢুকেছ। এখানকার ক্লিকের ব্যাপার তো কিছু জান না। ধরো তুমি অনেক খুঁজেপেতে একটা ভালো হিরোইন যোগাড় করলে। অমনি আমি পিছনে লেগে গেলাম কী করে সেটিকে হাত করে তোমার নাগালের বাইরে নিয়ে আসব। শুধু কি তাই? তুমি একখানা ভাল ছবি তুললে হিংসেয় আমি জ্বলে-পুড়ে মরব, সবার কাছে তার নিন্দে করে বেড়াতেও ছাড়ব না।'

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'বলেন কী মশাই! একই কোম্পানিতে একসঙ্গে মিলেমিশে সবাই কাজ করছে, তার মধ্যেও এত নোংরামি?'

—'হ্যাঁ নোংরামি।' রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন জ্যোতিষবাবু। 'আর এরকম নোংরামি এক সিনেমা লাইনে ছাড়া আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। এর জন্যে দায়ী কারা জানো? কোম্পানি নয়, দায়ী আমরা। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় ক'জন বাঙালি যারা এই কোম্পানিতে কাজ করছি। শুনবে তবে—।' বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন জ্যোতিষবাবু। গলা নামিয়ে চুপিচুপি বললেন, 'স্টুডিওর দু'তিনজন চেনা লোক আসছে । ট্রামও রেডি, চল উঠে পড়া যাক।'

ট্রামে আর কোনও কথা হয়নি। জ্যোতিষবাবু সস্তা সিরিজের বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর ভিতর থেকে 'মৃণালিনী' উপন্যাসখানির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ট্রাম রসা থিয়েটারের (অধুনা পূর্ণ) সামনে দাঁড়াতেই নেমে পড়লাম।

রাত্রে খাওয়ার সময় বাবাকে খিদিরপুরে কাকার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ মাইনে নিয়ে যা যা কথাবার্তা হয়েছে খুলে বললাম। সব শুনে বাবা বললেন, 'এমনিতেই ও একটু ঈর্ষাকাতর। অত করে বাড়িয়ে না বললেও পারতে।'

স্টুডিওর কথা উঠতে বললাম, 'কালপরিণয়' ছবি রিলিজ হলে মনে হয় ভাল মাইনেতে ম্যাডানের পারমানেন্ট হয়ে যেতে পারব।'

বাবা বললেন, 'দ্যাখো, তাহলে তো সব দিক রক্ষে হয়, নইলে পেটও ভরল না, জাতও গেল।'

রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি ঘুমোতে পারলাম না। জেগে ছটফট করে কাটালাম। সব ছাপিয়ে গোপার বিচিত্র ব্যবহার মনের দুয়ারে বার বার এসে ঘা দিতে লাগল। সারাদিনের কথাবার্তাগুলো নিয়ে তোলপাড় করে ফেললাম কিন্তু এমন কোনো কথা খুঁজে পেলাম না যার অছিলায় গোপা ওভাবে জানলা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে পারে। আকাশ-পাতাল ভেবেও কোনও কূল-কিনারা না পেয়ে শেষকালে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন বেশ একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল। শুটিং নেই, অন্য কোনো জরুরি কাজের তাড়াও নেই। রবিবারেরও অনেক দেরি, আজ সবে সোমবার। সময় আর কাটতে চায় না। কী করি। দুপুরে খেয়েদেয়ে কষে এক ঘুম দিলাম। বেলা তিনটেয় উঠে দেখি তখনও রোদ পড়েনি। জুতো জামা পরে স্টুডিওর হেড আফিস ৫নং ধর্মতলা মুখো রওনা হলাম।

ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর এখন যেখানে নিউ সিনেমা, ঠিক তার উল্টোদিকে যে লম্বা প্রকান্ড বাড়িটা, সেইটার নীচের তলায় জে. এফ. ম্যাডান কোম্পানির প্রসিদ্ধ বিলিতি মদের দোকান। তারই শেষ প্রান্তে খানিকটা জায়গা কাচের পার্টিশন করা। সেইটা হল আফিস বা হেড কোয়ার্টার্স, ম্যাডানের জামাই রুস্তমজী সাহেব সেইখানে বসে কোম্পানির হরেকরকম ব্যবসার হিসাবপত্র রাখেন ও তদারকি করেন। সিনেমা ডিপার্টমেন্টটাও তারই মধ্যে নগণ্য একটি। মদের দোকানের পাশ দিয়ে উপরে ওঠবার সিঁড়ি , তারপরই উত্তরমুখো প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দা। ঐ বারান্দায় উঠলেই দেখা যায় দক্ষিণমুখো খোপ খোপ ছোট অনেকগুলো ঘর। কোনোটায় বসেন গাঙ্গুলীমশাই, কোনোটায় জ্যোতিষবাবু বা জাল সাহেব। তারপর দু'তিনটে ঘর, কাঁচিঘর বা এডিটিং রুম। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ওরই মধ্যে একটি ঘরে দেখলাম গাঙ্গুলীমশাই ও মুখুজ্যে। একরাশ ফিল্মের মধ্যে ডুবে বসে একটা লেন্স দিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করছেন ও পাশের একখানা খাতায় পেন্সিল দিয়ে কী সব নোট করছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, তখনও স্টুডিওতে এডিটিং রুম বলে কিছু ছিল না। ছবি তোলা হয়ে গেলে সেগুলো ডেভেলাপ করে সেই সব নেগেটিভ ফিল্ম নিয়ে আসা হতো ৫নং ধর্মতলায়। তারপর সেগুলো কাট-ছাঁট করে এডিট করা হতো।

সিগারেট খাওয়ার অছিলায় বাইরে বেরিয়ে এল মুখার্জি। বললাম, 'ছবি বেরোতে আর কতদিন দেরি মুখুজ্যে?'

নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখার্জি বলল, 'রোসো, আসল সিনটাই

তো বাকি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'আসল সিন কোনটা?'

নিঃশব্দে সিগারেটে দু' তিনটে টান দিয়ে বেশ রসিয়ে বলল মুখার্জি, 'কোর্ট সিন, মোক্ষদা হত্যার দায়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছ তুমি। হয় ফাঁসি নয় দ্বীপান্তর।'

বেশ একটু নার্ভাস হয়ে বললাম, 'কিন্তু মোক্ষদাকে রিভলভার দিয়ে গুলি করে মারল তো নরেশদা!'

আমার কথার জবাব না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করতে শুরু করল মুখার্জি—'মোক্ষদার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে একরকম ছুটেই তার ঘরে তুমি ঢুকেছিলে কিনা?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

—'তারপর যখন দেখলে মেঝেতে পড়ে আছে মোক্ষদা, রক্তে ভাসাভাসি, তখন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিলে কিনা?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঐ ভাবে বসবার পর যখন দেখলে মোক্ষদার ডান হাতে রয়েছে একটা রিভলভার তখন সেটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলে কিনা?'

চুপ করে রইলাম। মুখার্জি বলে চলল—'ঐ ভাবে রিভলভার হাতে হাঁদারামের মতো যখন বসেছিলে তুমি মৃতা মোক্ষদার পাশে, তখন দু'তিনজন লোক নিয়ে মোক্ষদার স্বামী নরেশদা মানে সারদা ঘরে ঢুকেছিল কিনা? এর পরও যদি বলতে চাও তুমি নির্দোষ, তাহলে আদালতে হাকিমকে বলো, আমাদের বলে কোনও ফল হবে না।' কেস জেতার পর বিজ্ঞ উকিলের মতো হাসতে লাগল মুখার্জি।

সিনটার একটু আভাস এইখানে দিয়ে রাখি। 'কালপরিণয়' ছবিতে সারদা হলো আমার দূর সর্ম্পকের জ্ঞাতি ভাই। তার স্ত্রী মোক্ষদা মনেপ্রাণে ভালবাসে আমাকে। নানা ছল-ছুতোয় ডেকে পাঠায়। কখনও কালীবাড়িতে, কখনও বা গঙ্গার ধারে। কিন্তু কোনও সুবিধে হয় না। আমি খাঁটি বাংলা ছবির নায়ক, পত্নীগত প্রাণ। অন্য স্ত্রীলোকের দিকে তাকাই সাধ্য কী আমার! মরিয়া হয়ে উঠল মোক্ষদা। একদিন অসুখের অজুহাতে ডেকে পাঠাল ওদের বাড়িতে। তখন মোক্ষদার স্বামী বাড়ি নেই। বারে বসে মদ খাচ্ছে। সারদা হলো ছবির ভিলেন। কাজেই সব রকম পাপ কাজ তাকে করতেই হবে। এদিকে ঘরের মধ্যে মোক্ষদার প্রেম নিবেদন পুরোদমে চলছে। মোক্ষদা মরিয়া হয়ে আলিঙ্গন করতে ছুটে আসে। আমি ঘৃণাভরে কঠিন হাতে ওর হাত দুখানা সরিয়ে ঠেলে ফেলে দিই। সেই সঙ্গে আউড়ে যাই চোখা চোখা ধর্মের বুলি—যথা, তোমার মতো কুলটার নরকেও স্থান পাওয়া কষ্টকর, আর এক মিনিটও এই পাপপুরীতে থাকলে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব, ইত্যাদি। এইসব ভাল ভাল

কথাগুলো বলে আমি চাই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে, মোক্ষদা যেতে দেয় না, পথ আগলে দাঁড়ায়। আমাদের এই সব প্রেমালাপের মাঝখানে টলতে টলতে সারদা বাড়ি আসে এবং লুকিয়ে কথাগুলো শোনে এবং আমি মোক্ষদাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই গুলি করে মোক্ষদাকে। এবং চক্ষের নিমেষে মৃতা স্ত্রীর হাতে রিভলভার গুঁজে দিয়ে অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে লোক ডেকে আনে।

'গিরিবালা' রিলিজের পর ভিলেন-এর ভূমিকায় নরেশদার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাই এ ছবিতেও শয়তান সারদার ভূমিকাটি ওঁকেই দেওয়া হয়। মোক্ষদার চরিত্রটিও বেশ কঠিন, তাই বেছে বেছে পোড় খাওয়া পেশেন্স কুপারকে ঐ ভূমিকা দেওয়া হয়।

চারদিক চেয়ে আমার আরও কাছে এসে বলল মুখার্জি, 'কাউকে বোলো না যেন, সিনটা রিয়্যালিস্টিক করবার জন্য আমরা সত্যিকারের আদালতে শুটিং করবার ব্যবস্থা করছি। সেইজন্যই তো একটু দেরি হচ্ছে হে।'

বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে বললাম, 'বল কী মুখুজ্যে, রিয়্যাল কোর্ট সিন!'

—'শুধু কি তাই? আরও একটা কথা। না, থাক ভাই। তুমি আবার পাঁচজনকে বলে দেবে আর গাঙ্গুলীমশাই আমার উপর চটে যাবেন।'

মুখুজ্যের হাত দুটো চেপে ধরে বললাম, 'দিব্যি গালছি, কাউকে বলব না। বল না ভাই, কী কথা?'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে মুখার্জি বলল, 'অধ্যাপক চ্যাটার্জিকে দিয়ে 'কালপরিণয়'-এর টাইটেল লেখাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। একটু সবুর করো, দ্যাখো না কী করি!'

কাঁচিঘর থেকে মুখুজ্যের ডাক পড়ল। তাড়াতাড়ি আধখাওয়া সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল মুখার্জি।

'কালপরিণয়' ছবিটা দেরি করে রিলিজ হওয়ার দুঃখটা অনেকখানি কমে গেল মুখুজ্যের কথায়। বারান্দার উপর দিয়ে পশ্চিমমুখো হাঁটতে শুরু করলাম। দু'তিনটে বন্ধ ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের কাছে এসে দেখি, ঘর ভর্তি মেয়ে আর তার মাঝখানে সাদা কোটপ্যান্ট পরে এক গাল হাসি নিয়ে বসে আছেন পরিচালক জ্যোতিষবাবু। উঁকি দিয়ে চলে যাব কিনা ভাবছি, কানে এল, 'আরে এসো ধীরাজ, তোমার জন্যেই এত আয়োজন আর তুমি কিনা উঁকি দিয়ে সরে পড়তে চাইছ!'

এর পরে চলে আসা সম্ভব নয়, আর ইচ্ছাও ছিল না। ঘরে ঢুকে পড়লাম।

গাঙ্গুলীমশাই হচ্ছেন রাশভারি লোক, কম কথা বলেন। জ্যোতিষবাবু ঠিক তার উল্টো। মনে যা আসে মুখে তা বলতে আটকায় না। এর জন্যে এক এক সময় বিষম অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। কিন্তু মনটা সাদা, সেখানে ঘোর-প্যাঁচ কিছু নেই।

জড়সড় হয়ে জ্যোতিষবাবুর পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লাম। কোনওরকম দ্বিধা না করে হাত দিয়ে মেয়েগুলোকে দেখিয়ে বললেন জ্যোতিষবাবু, 'ভাল করে দ্যাখো, এর মধ্যে কোনটি তোমার পছন্দ।'

নির্লজ্জ প্রশ্ন— ভারি লজ্জা পেলাম। দেখলাম, জ্যোতিষবাবুর সামনে পান-দোক্তা খাওয়া দাঁতগুলো বের করে বেহায়ার মতো হেসে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে মেয়েগুলো। বুঝলাম, খাস পাড়া থেকে আমদানি।

বেশ বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কী যা তা বলছেন!'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আমার দিকে কিছু সময় চেয়ে থেকে বললেন জ্যোতিষবাবু, 'নায়ক, অথচ সামান্য কথার আঘাতেই মুষড়ে পড়ো? এর পরে দেখবে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে সমস্ত উপলব্ধি হারিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছ। প্রথম প্রথম ওরকম হয়।'

মেয়েদের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। নায়িকা হবার যোগ্যতা ওদের মধ্যে কারও নেই। বয়স খুব বেশি না হলেও ও পাড়ার একটা বিশেষ ছাপ এরই মধ্যে ওদের অনেকের মুখে স্থায়ী আসন পেতে নিয়েছে।

মনের ভাব বুঝতে পেরেই বোধহয় জ্যোতিষবাবু বললেন, 'রোজ এরকম ঝুড়ি ঝুড়ি আনাচ্ছি, কিন্তু মৃণালিনীকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

জরুরি কাজের অছিলায় জ্যোতিষবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়েই দেখি গাল ভর্তি পান-দোক্তা নিয়ে দরজার পাশে উৎকর্ণ হয়ে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে আছে মনমোহন। আমাকে দেখেই হাসতে গিয়ে বিষম খেতে খেতে অতিকষ্টে সামলে নিয়ে হাত ইশারায় একটু দূরে ডেকে বলল, 'মেসোমশায়ের কাণ্ডটা দেখেছিস!'

বললাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা কী বলতো?'

তাচ্ছিল্য ভরে মনমোহন বলল, 'কে জানে, রোজ গাদা-গাদা মেয়ে আসছে, আর বেলা দশটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত বাছাই চলছে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী পার্ট ওদের দেবে বলতো?'

—'ঝি-এর, নয়তো এক্সট্রার। হয়তো কোনো পার্টই দেবে না। এত করে মেসোমশাইকে বললাম যে, আমার একটি জানাশোনা ভাল মেয়ে আছে, তাকে একবার দেখুন। তা দেখা দূরের কথা, উল্টে আমায় কতকগুলো গালাগালি দিয়ে বলে দিল, মেয়েদের সিলেকশনের সময় আমি যেন সেখানে না থাকি।'

মনমোহনের ব্যথা কোথায় বুঝলাম। হেসে শুধু বললাম, 'দাউ টু মনমোহন?'

একটু থতমত খেয়ে আবোল তাবোল যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল মনমোহন যে, এটা নিছক পরোপকার ছাড়া আর কিছুই নয়। জানা-শোনা মেয়ে, চেহারা ভাল, অবস্থা খারাপ। যদি তার কিছু উপকার করতে পারে এই আর কী। আরও অনেক

কিছু হয়তো বলত মনমোহন, বাধা দিয়ে বললাম, 'এক কাজ কর তুমি। ভরসা করে আমার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দাও। আমি যদি জ্যোতিষবাবুকে অনুরোধ করি, আশা করি ঠেলতে পারবেন না।'

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মনমোহন আমার মুখের দিকে। তারপর দুর্বার হাসিতে ওর সারা দেহ কেঁপে উঠল। আমার দিকে ঐ ভাবে এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি দু'পা পিছু হটে ঘুঁষি বাগিয়ে বললাম, 'খবরদার!' আর না এগিয়ে বসে পড়ল মনমোহন। হাসির রেশ কিছুটা কমলে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে বলল, 'দরকার নেই ওর ফিলিমে নেমে।'

মনমোহনের হাসিতে এবার আমিও যোগ দিলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে তাকাই ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে । বড় বড় কালো অঙ্কের সংখ্যাগুলো নির্দয়ভাবে মনে করিয়ে দেয় রবিবারের এখনও অনেক দেরি, আজ সবে বুধবার। হতাশায় চোখের পাতা দুটো আপনিই বুঁজে আসে, চুপ করে শুয়ে থাকি। কখনও ভাবি, উইক-ডেজের মধ্যে একবার খিদিরপুরে সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে এলে কেমন হয়? তখনই মনে পড়ে দুপুরে রিনি থাকবে স্কুলে আর কাকা আফিসে। বাড়ি থাকবেন শুধু কাকিমা আর মোক্ষদা। সুতরাং না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে ভাবলাম যাই একবার হেড অফিসে, সময়টা তবু কাটবে। বোধহয় একটু সকাল সকালই এসে পড়েছিলাম। জ্যোতিষবাবুর ঘর খালি, তখনও এসে পৌছননি। একখানা চেয়ার টেনে বসে ড্রয়ার থেকে 'মৃণালিনী' বইখানা বার করে লাল নীল পেন্সিলে দাগানো পাতাগুলোর উপর চোখ বুলোতে লাগলাম।

কানে এল গুরুগম্ভীর আওয়াজ, 'কুড ইউ প্লীজ টেল মি হোয়ার ক্যান আই মীট ডাইরেক্টর ব্যানার্জি?'

প্রশ্নকারিণী বছর চল্লিশের একটি প্রৌঢ়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'দিস ইজ হিজ চেম্বার। হি ইজ একসপেকটেড এনি মোমেন্ট। প্লীজ টেক ইয়োর সীট।'

বসলেন না। ঐভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে ডাকলেন, 'লোলা!'

বছর আঠারো-উনিশের একটি গোলগাল মেয়ে মহিলাটির পাশে এসে দাঁড়াল। এ রকম গোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলাম। মুখ থেকে শুরু করে দেখলাম, লোলার সর্বাঙ্গ নিটোল গোল। ইচ্ছে করেই টাইট ফিটিং পাতলা গাউনটা পরেছে কিনা জানি না, মনে হচ্ছিল একটু জোরে হাসলে বা হাঁচলে কিংবা কোনও রকমে লোলাকে একটু ইমোশনাল করে দিলেই গাউনটা ফেটে চৌচির হয়ে কাপড়ের টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

লোলাকে সঙ্গে নিয়ে মহিলাটি ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। লোলা বসল না, একখানা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে ঘরময় চোখ বুলিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'মামি, লুক!'

ওর বিস্ফারিত চোখ অনুসরণ করে দেখলাম, একখানা ছবিওয়ালা বাংলা ক্যালেন্ডার। যমুনার তীরে কদম গাছে নীল রঙের কেষ্ট পা ছড়িয়ে বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন, আশেপাশে ডালে ঝোলানো রয়েছে অনেকগুলো রং-বেরঙের শাড়ি ও ডুরে কাপড়। নীচে যমুনায় হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে গোপিনীর দল এক হাতে কোনও রকমে লজ্জা রক্ষা করে অন্য হাতে কৃষ্ণের কাছে কাপড় চাইছে।

এর আগে অনেকবার ছবিটা দেখেছি কিন্তু আজ যেন ওর অন্য একটা রূপ চোখের সামনে বেশি করে ফুটে উঠল।

লোলার মা কষে এক ধমক দিয়ে উঠলেন—'ডোন্ট বি সিলি লোলা, সিট ডাউন!'

একটু অপ্রস্তুত হয়েই যেন চেয়ারটায় বসে পড়ল লোলা, তারপর এই প্রথম আমার দিকে চেয়ে দেখল। ড্যাবড্যাবে সরল চাউনি। বুঝলাম, মায়ের কড়া শাসনে এখনও ও-চোখে অন্য পুরুষের ছায়া পড়বার সুযোগ পায়নি।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন জ্যোতিষবাবু। সোলার টুপিটা মাথা থেকে খুলে একরকম ছুঁড়ে ফেললেন টেবিলের উপর, তারপর হাতের লাল ফিতে বাঁধা ফাইলটা খুলতে খুলতে বললেন—'হাওড়া পুলের উপর গাড়ি জ্যাম। বল কেন আর দুর্ভোগের কথা।'

লোলার মাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'হিয়ার ইজ ডাইরেক্টর ব্যানার্জি।'

লোলার মা'র গোমড়া মুখ হাসিতে ভরে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম মিসেস সিমসন, দিস ইজ মাই ডটার লোলা।'

করমর্দনের পালা শেষ করে লোলার দিকে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জ্যোতিষবাবু।

মিসেস সিমসন বললেন, 'হামিদের কাছে শুনলাম, আপনি আগামী নতুন ছবির জন্যে হিরোইন খুঁজছেন, তাই আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছি।'

হামিদ কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের একজন দালাল। মেয়ে সংগ্রহ করাই ওর কাজ।

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'ওর কোনও ফটো আছে কি?'

বলা বাহুল্য, কথাবার্তাগুলো ইংরেজিতেই হচ্ছিল। ফটোর কথায় মিসেস সিমসন দ্বিধাভরে মাথা নাড়লেন দেখে, লোলা উৎসাহভরে বলে উঠল, 'মামি, আমার সেই বেদিং কস্টিউম পরে তোলা ছবিটা—'

শুধু একটা চাউনি। কথার চাইতে যে কত বেশি কাজ হয় ওতে, মিসেস সিমসনের ছোট একটা চাউনিতে নিমেষে সংকুচিত হয়ে লোলাকে মুখ নিচু করে

বসতে দেখে সেদিন হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করলাম।

মিসেস সিমসন বললেন, 'না, কোনও ছবি ওর তোলা নেই। যদি বলেন তো একটা তুলে আপনাকে দেখাতে পারি।'

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'বেশ কথা, ছবিটা তুলে পরের সপ্তাহে আমাকে দেখাবেন।'

বিদায় নমস্কার করে মা-মেয়েতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে বসে সিগারেট ধরালেন জ্যোতিষবাবু। বললাম, 'নেবেন না মেয়েটাকে জানি। মিছিমিছি ছবি তুলিয়ে আনতে বললেন কেন?'

আমার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে সিগারেটে দু'তিনটে টান দিলেন জ্যোতিষবাবু, তারপর বললেন, 'মিছিমিছি নয়, ওর একটা হিল্লে আমি করে দেব।'

কিছু না বুঝতে পেরে চুপ করে চেয়ে রইলাম।

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'ঐ হিউম্যান-রোলারকে আমি ইউটিলাইজ করতে পারব না এটা ঠিক। যে পারবে, তার হাতেই তুলে দেব।'

হেঁয়ালির কথা। বললাম, 'কে?'

'—জাল সাহেব।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসির বেগ একটু কমে এলে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'সাধারণ ফটোটায় যদি দেখি কাজ হল না, তখন ঐ বেদিং কস্টিউম পরা ছবিটা জাল সাহেবকে দেখাতে বলব। ব্যস, নির্ঘাৎ।'

আবার হাসতে যাব, একজন বেয়ারা ঘরে ঢুকে সেলাম করে একটা সাদা কাগজের চিরকুট জ্যোতিষবাবুর হাতে দিল। একবার চোখ বুলিয়েই জ্যোতিষবাবু বললেন, 'যা ভেবেছি তাই— একে আসতে দেরি, তার উপর হিরোইন এখনও ঠিক হয়নি। আজ রুস্তমজী সাহেবের কাছে নির্ঘাৎ বকুনি।' বেয়ারাটার দিকে চেয়ে বললেন, 'যাও, গিয়ে বল, আমি যাচ্ছি।' আবার সেলাম করে বেয়ারাটা চলে গেল।

ফাইলটা ফিতে দিয়েবেঁধে নিয়ে যাবার সময় জ্যোতিষবাবু বললেন, 'বসো ধীরাজ, আমি আধঘন্টার মধ্যে আসছি।'

হাসি-গল্পে তবু সময়টা কাটছিল। এখন করি কী? মনের অগোচরে পাপ নেই, সামনে বারান্দাটার উপর একটা সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে গোপিনীদের বস্ত্রহরণের ছবিটা আবার নতুন চোখে দেখতে লাগলাম। কতক্ষণ ঐভাবে ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ কী একটা আওয়াজে চমকে ফিরে দেখি, পান-দোক্তাভরা মুখে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হাসছে মনমোহন। লজ্জা পাইনি বললে মিথ্যা বলা হবে। ওটা চাপা দেওয়ার জন্যে হেসে বললাম, 'আজকাল কাজকর্ম ছেড়ে এ-ঘর ও-ঘরে আড়ি পেতে বেড়াস কেন বলতো?'

ইচ্ছে থাকলেও কথা কইবার উপায় ছিল না মনমোহনের। খপ করে আমার

একখানা হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল বারান্দার পশ্চিম কোণে। রেলিং-এর কাছে এসে হাত ছেড়ে দিয়ে কাছের একটা নর্দমায় গাল-ভর্তি পিক ফেলে চোখ ইশারায় সামনের একখানা ঘর দেখিয়ে চুপি চুপি বলল, 'দেখ!'

দেখলাম।

সামনে দক্ষিণ দিকে ছোট একটা ঘরে একটা চেয়ারে ন্যাশনাল ড্রেসে, মানে কালো পার্শি কোট ও লম্বা টুপি মাথায়, বসে আছেন ম্যাডানের শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান-পরিচালক জাল সাহেব। সামনে একটা ছোট টেবিল, তার পাশে আর একখানা চেয়ারে বসে আছেন— দেখেই বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল আমার। বসা অবস্থাতেই, অনুমান করা মোটেই শক্ত নয়, লম্বা ছ'ফুটের বেশী। মাথায় পাতলা রঙিন ওড়না, চোখে সুরমা, ঠোঁটে রং। পরনে সালোয়ার, আর তার উপর হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো জরিদার ঘাঘরা বা ঐ জাতীয় ঢিলে জামা পরে বসে আছে এক বিরাট—।

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে মনমোহন বলল, 'পাঠানী, লাহোর থেকে আমদানি করেছে জাল সাহেব।'

হাঁ করে চেয়ে আছি। হাসিখুশিতে জাল সাহেবের মুখখানা সিঁদুরের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ভাঙা-ভাঙা উর্দুতে কী একটা বলতেই দেখলাম, পাঠানী কপট ক্রোধে ঘুঁষি বাগিয়ে হাত তুলেছে জাল সাহেবকে মারতে। হাতের কব্জি দেখেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। মনে হল, যে কোনো ব্যায়ামবিদের ঈর্ষার বস্তু। হঠাৎ উদ্যত ঘুঁষি-বাগানো হাতখানা নামিয়ে একটা আঙুল দিয়ে জাল সাহেবের বুকে একটা খোঁচা দিয়ে হাসিতে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল পাঠানী। জাল সাহেবের তো কথাই নেই। ভয় হচ্ছিল, হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে না যায়।

অবাক হয়ে বললাম, 'করছে কী ওরা?'

মনমোহন বলল, 'রিহার্সাল দিচ্ছে।'

কী রিহার্সাল দিচ্ছে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। জাল সাহেবের সব কাজেই একটা অরিজিন্যাল টাচ থাকবেই। তবুও সংশয়ভরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাংলাদেশের হিরোইনরা কী দোষ করল যে লাহোর থেকে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মনমোহন বলল, 'শুধু বাংলা? বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা জাল সাহেবকে হিরোইন না দিতে পেরে লজ্জায় মুখ নিচু করে আছে। শেষকালে কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের একজন মুসলমান অভিনেতা দোস্ত মুহম্মদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে জাল সাহেব নিজে লাহোর গিয়ে দিনপনেরো থেকে ঐ মৈনাক পর্বত ঘাড়ে করে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন।'

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী এমন ছবি, যাতে ঐ হস্তিনীকে হিরোইন না করলে চলত না! নাম কী ছবিটার?'

উত্তরে এমন একটা খটমট উর্দু নাম করল মনমোহন যা উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায়, চেষ্টা করেও নামটা মনে রাখতে পারিনি। বললাম—'ওর নাম কী?'

মনমোহন বলল, 'গুলজার বেগম। দেখছিস না, এসেই নরক গুলজার করে বসেছে!' হঠাৎ দৃষ্টি নামিয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে মনমোহন বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ— টেবিলটার নীচে চেয়ে দ্যাখ।'

দেখলাম গুলজার বেগমের বেডরুম স্লিপার পরা পা দুটো নিয়ে জাল সাহেব ফুটবল খেলছে আর হাসিতে ফেটে পড়ছে।

অজ্ঞাতে একটা মারাত্মক অপরাধ করে ফেললাম, সশব্দে হেসে উঠলাম। পরমুহূর্তে দেখি হাসি থামিয়ে দু-জোড়া ক্রোধরক্তিম চোখ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর জাল সাহেব চেয়ার থেকে উঠে সবলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে দুজনে পরস্পরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। একটু বিরক্ত হয়েই মনমোহন বলল, 'দিলি তো হেসে সব মাটি করে? নাঃ, তোকে ডেকে আনাটাই ভুল হয়েছে।'

হেসে জবাব দিলাম, 'আরও কিছু দেখবার আশা করছিলি নাকি?'

কোনও জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে জাল-গুলজারের সীমানা ছাড়িয়ে পূর্বদিকের রেলিং ধরে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়াল মনমোহন। অপরাধীর মতো আমিও পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা, তোর কাজ হল কাঁচি দিয়ে ফিল্ম কেটে আঠা দিয়ে সেগুলো জুড়ে দেওয়া। সে সব ছেড়ে সবসময় এর ওর তার পেছনে ঘুরে ঘুরে অকারণে তাদের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করে বেড়াস কেন বলতে পারিস?'

বর্ষার আকাশ মনমোহন—এই রোদ্দুর, এই বৃষ্টি। মেঘ কেটে গেল, খুঁতখুঁত করে খানিকটা হেসে নিল। তারপর বলল, 'এমনি। বন্ধ ঘরে বসে একরাশ ফিল্ম কাটা আর জোড়া আমার ভালই লাগে না। শুধু মেসোমশায়ের ভয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে বসি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'জাল সাহেবের এই নতুন ছবিটার গল্প জানিস?'

সবজান্তা মনমোহন তখনি উৎসাহভরে মাথা নেড়ে বলতে শুরু করল, 'অদ্ভুত গল্প। শুনবি? সাধারণ গল্পে কী হয়, হিরোরাই সব বীরত্বের কাজ করে। যুদ্ধ জেতে, দুশমনকে শায়েস্তা করে, এই তো? জাল সাহেবের এ গল্পে ঠিক তার উল্টো। হিরোইনই সব। নায়ক বুদ্ধুর মতো মার খেয়ে বাড়ি আসে আর তখন নায়িকা একখানা তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে অগুনতি শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করে একাই চার-পাঁচশ লোককে কচুকাটা করে বুক ফুলিয়ে ফিরে আসে। বুঝলি কিছু?'

বোকার মতো মাথা নাড়লাম। হেসে ফেলল মনমোহন। তারপর বলল, 'আরে মুখ্যু, এটা বুঝলি না? 'ঝাঁসীর রাণী' নাটক থেকে এ আইডিয়াটা জাল সাহেবের মাথায় ঢুকেছে। সাহেবদের বুঝিয়েছে, এ ছবি শিওর হিট।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছবিটা কি ঐতিহাসিক?'

একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল মনমোহন, 'না, সামাজিক। হিরো-হিরোইন খুব গরিব, গাঁয়ের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের পায়ের কাছে কুঁড়েঘরে বাস করে। সীমান্তের একদল ডাকাত মাঝে মাঝে গ্রামে এসে হানা দেয়, গাঁয়ের লোকজনদের মেরে তছনছ করে। সেই সময় আমাদের এই গুলজার বেগম তলোয়ার হাতে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এবার বুঝলি হাঁদারাম?'

জাল সাহেবের বন্ধ দরজাটার দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম।

মনমোহন বলল, 'সেদিন কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের অডিটরিয়ামে বসে গল্পটা পড়া হচ্ছিল। পিছনে অন্ধকারে একখানা চেয়ারে বসে যা শুনেছিলাম, তাই তোকে বললাম।'

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'হতভাগ্য নায়ক কাকে দেওয়া হল? এর জন্য আবার না জাল সাহেবকে কাবুল কান্দাহার পাড়ি দিতে হয়।'

মনমোহন বলল, 'দূর, তা কেন? কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের তালগাছের মতো লম্বা বিশ্রী চেহারার দোস্ত মুহম্মদ, সেই হিরো। আরে সেই বেটাই তো ভুজুং দিয়ে গুলজার বেগমকে আনতে জাল সাহেবকে লাহোর পাঠাল। ও বেশ জানে গুলজার বেগম ছাড়া ওর ভাগ্যে নায়কের পার্ট পাওয়া অসম্ভব। আর তা ছাড়া অন্য কোনও গোপন ব্যাপারও হয়তো আছে, এখনও জানতে পারিনি।'

—'কত মাইনে ঠিক হল?'

—'মাসে পাঁচশ টাকা।'

অবাক হয়ে যাচ্ছি, হাত তুলে বাধা দিয়ে মনমোহন বলল, 'শুধু এই? তবে শোন। দিন চারেক আগে দুপুরের দিকে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছি। একখানা মাল বোঝাই লরি এসে দাঁড়াল। গোটা তিন-চার বদনা, ঘটি, গোটা তিনেক গড়গড়া, গোটা সাতেক বড় বড় বেডিং, ছোট বড় কাপড়ের পোঁটলা গোটা আষ্টেক, তা ছাড়া অনেকগুলো ছোট বড় অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি হাঁড়ি, দুটো ঝুড়িতে চিনে মাটির প্লেট, চায়ের কাপ — আর কত নাম করব! লরিটার পিছনে তিনখানা ট্যাক্সি, তাতে লোক ঠাসা। প্রথমে ভাবলাম বোধহয় কোরিন্থিয়ান থিয়েটার পার্টি বায়নায় বিদেশ যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি, একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে নামল জাল সাহেব। আগে শুনেছিলাম হিরোইন আনতে জাল সাহেব লাহোর গিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। একরকম ছুটেই নীচে নেমে গেলাম।

ফুটপাথের উপর থেকে একবার উঁকি দিয়েই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। দেখলাম,

তিনখানা ট্যাক্সিতে গুড়ের কলসির মতো ঠাসা গুলজারের সংসার। ওখানে দাঁড়িয়ে কানাঘুষো শুনে শুনে দেখলাম, ওর নানী, ফুফু, ভাবী, গোটা তিনেক ভাই, তাদের আন্ডা-বাচ্ছা সব মিলিয়ে সতেরো-আঠারো জন। জাল সাহেব লরির কাছে এসে মাল নামাতে হুকুম করলেন— এমন সময় দেখি, মদের দোকানটার বাইরে এসে দাঁড়ালেন রুস্তমজী সাহেব। জাল সাহেব তাড়াতাড়ি কাছে এসে ওদের দেখিয়ে কী যেন বললেন। কোনও জবাব না দিয়ে রুস্তমজী সাহেব ঢুকে পড়লেন কাচের পার্টিশন দেওয়া ঘরে। হাত মুখ নেড়ে কী সব বলতে বলতে জাল সাহেবও সঙ্গে গেলেন। একটু পরে দেখি, গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে এলেন জাল সাহেব। তারপর গাড়িগুলোকে হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে বলে গুলজার বিবির ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন।'

হঠাৎ থেমে গিয়ে পকেট থেকে দলাপাকানো একটা কাগজ বার করল মনমোহন। তারপর সেটা খুলে একটা পান বার করে মুখে পুরে দিল। অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'কোথায় নিয়ে গেল ওদের?'

হেসে নিয়ে অন্য পকেট থেকে একটা দোক্তার কৌটো বের করে খানিকটা মুখে দিয়ে বলল মনমোহন, 'রাস্তার দুধারে টু-লেট দেখতে দেখতে মৌলালিতে মনের মতো বাড়ি পাওয়া গেল। সেইখানেই ঐ রাবণের গুষ্ঠি নিয়ে তুলল। বাড়িভাড়া, খাওয়াখরচ, গুলজারের জন্য একখানা গাড়ি ইত্যাদি সব খরচ কোম্পানির। তা ছাড়া মাসে পাঁচশ টাকা মাইনে। বাংলা ছবির হিরো হয়ে কী ঘোড়ার ডিম হবে বলতে পারিস?'

বললাম, 'এ সব দেখে শুনে কী মনে হচ্ছে জানিস?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মনমোহন।

ম্লান হেসে বললাম, 'না থাক, বলব না।'

ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে। সপ্তরথী মিলে ঘিরে ফেলেছে কিশোর অভিমন্যুকে, আজ আর অর্জুন-তনয়ের নিস্তার নেই। এমন সময় দেখা গেল পাশ দিয়ে চলেছে একখানা খিদিরপুরের ট্রাম। অস্পষ্ট নয়, পরিষ্কার পড়লাম—ট্রামের পাশে বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'খিদিরপুর, প্রথম শ্রেণী, ভাড়া ছ'পয়সা।' সেকেন্ড ক্লাসের গায়েও লেখা 'দ্বিতীয় শ্রেণী, ভাড়া পাঁচ পয়সা।'

ম্যাডান কোম্পানির তোলা 'মহাভারত' ছবিটা টিকিট কেটে দেখেছিলাম বছরখানেক আগে এম্প্রেস থিয়েটারে। আর সব ভুলে গেলেও অভিমন্যু-বধ দৃশ্যটা স্পষ্ট মনে আছে। তখনকার দিনে পায়োনিয়ার বলতে একমাত্র ম্যাডান কোম্পানিকে ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করাও যেত না। একমাত্র ওঁরাই যা খুশি ছবি তুলে মানুষকে আনন্দ দেবার অছিলায় প্রচুর পয়সা রোজগার করতেন। ব্যতিক্রম দেখা গেল নরেশচন্দ্র মিত্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির তোলা দুখানি ছবিতে— 'মানভঞ্জন' ও 'আঁধারে আলো'। তারপর

জ্যোতিষবাবুর ম্যাডান কোম্পানির হয়ে তোলা 'সতীলক্ষ্মী' ছবি তখনকার দিনে কর্নওয়ালিস (অধুনা শ্রী) থিয়েটারে একাদিক্রমে চৌদ্দ সপ্তাহ চলেছিল। ভাল রকম সাড়া জাগিয়ে এল পি. এন. গাঙ্গুলীর পরিচালনায় তোলা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। এই একখানা ছবিতে কাজ করেই দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সীতা দেবী অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

তখনকার দিনে প্রযোজক হওয়াটা মোটেই ব্যয়সাধ্য বা কষ্টকর ছিল না। মাত্র দশ-বারো হাজার টাকা হলেই যে কেউ একখানি ছবি তুলে প্রযোজক হয়ে বসতে পারত। স্টুডিও ভাড়া করার প্রয়োজন কিছু নেই বা সেট-সেটিং-এর বালাই নেই। সামাজিক ছবি হলে পোশাকআশাকের খরচাও নেই। শুধু র-ফিল্ম আর একটা ক্যামেরা ভাড়া করা। ক্যামেরাম্যানের মাইনে আর প্রধান ভূমিকায় যারা নামবে তাদের কিছু টাকা এবং কলকাতার বাইরে গেলে বাড়িভাড়া, থাকা-খাওয়ার খরচা। ব্যস, ছবি হয়ে গেল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি.জি.) এই সময়ে দমদমে খানিকটা জমি লিজ নিয়ে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্মস নামে এক লিমিটেড কোম্পানি খাড়া করে ছবি তুলতে শুরু করেন। অধুনা বিখ্যাত পরিচালক দেবকী বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়া এইখানেই অভিনেতা ও পরিচালক হয়ে যোগদান করেন। বাংলা ছবির বাজার বেশ সরগরম হয়ে উঠল। কলকাতার চারধারে সব নতুন নতুন কোম্পানি গজিয়ে উঠতে লাগল, বেশির ভাগই দু'-একখানা ছবি তুলে পটল তুলল। যারা টিঁকে গেল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস। ঘনশ্যামদাস চওখানি নামে একজন ধনী মাড়োয়ারী কালিপ্রসাদ ঘোষকে পরিচালক নিযুক্ত করে কয়েকটি ছবি তোলেন। তার মধ্যে 'শঙ্করাচার্য', 'অপহৃতা', 'কণ্ঠহার', 'নিষিদ্ধ ফল' প্রভৃতি তখনকার দিনে জনসমাদর লাভ করেছিল। আর্য ফিল্মস নাম দিয়ে সুবিখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ এই সময় দুর্গাদাসকে নিয়ে একখানা ছবি তোলেন। ছবিটির নাম 'বুকের বোঝা'। বিখ্যাত পরিচালক নীতিন বসুর এইটাই প্রথম ছবি।

বর্তমান রিগ্যাল সিনেমার ঠিক সামনের রাস্তার উপর একখানা বড় ঘর ভাড়া নিয়ে টেবিল চেয়ার সোফা সাজিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা উপলক্ষে বসতেন হরেন ঘোষ। ব্যবসা কতদূর কী হত বোঝা না গেলেও ঐ ঘরে প্রায় সব সময়ই অধুনাবিখ্যাত ফিল্মের চাঁইদের আড্ডা দিতে দেখা যেত। মধ্য কলকাতার আড্ডা হিসাবে তখন ঐ ঘরটি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। ওখানে নিয়মিত যাঁদের দেখা যেত, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, ছোটাই মিত্তির, অমর মল্লিক, চারু রায়, প্রফুল্ল রায়, অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম চন্দ্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশরঞ্জন দাশ, পি. এন. রায় প্রভৃতি তাঁদের অন্যতম। বলা বাহুল্য হবে না, পরবর্তীকালে বিখ্যাত নিউ থিয়েটার্সের পরিকল্পনা ঐ আড্ডাঘরেই জন্মলাভ করে। ইতিমধ্যে চারু রায়

ও প্রফুল্ল রায় যথাক্রমে 'চোরকাঁটা' ও 'চাষার মেয়ে' নামে দুখানি ছবি ওখান থেকেই শেষ করেন।

নির্বাক বাংলা ছবির বাজারে বেশ খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। উত্তর ও মধ্য কলকাতা ছাড়াও আশেপাশে নিত্য নতুন মাশরুম কোম্পানি গজিয়ে উঠতে লাগল। পিছনে পড়ে রইল শুধু দক্ষিণ কলকাতা। তা কি হয়? পূর্ণ থিয়েটারের মালিক মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমান স্বত্বাধিকারী তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) বেশ তৎপর হয়ে উঠলেন। গ্রাফিক আর্টস নামে একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে চারু রায় ও প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় তিনখানি ছবি পর পর তোলেন — 'বঙ্গবালা', 'বিগ্রহ', 'অভিষেক'। তখনকার বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান দেবী ঘোষ স্থায়ীভাবে এই কোম্পানিতে যোগদান করেন। আর একটি বিশেষ কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার। বিখ্যাত অভিনেত্রী উমা দেবী এই প্রতিষ্ঠানেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে প্রচুর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি লাভ করেন ও পরে নিউ থিয়েটার্সে স্থায়ীভাবে যোগদান করেন।

নির্বাক 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মুক্তির পর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। এরকম অসম্ভব জনপ্রিয়তা ক্বচিৎ দেখা যায়। টাকাকড়ির ব্যাপারে এই সময় মতান্তর হওয়ায় দুর্গাদাস ম্যাডানের চাকরি ছেড়ে হরেন ঘোষের সঙ্গে যোগদান করেন। বাইরে তখন দুর্গাদাসের একাধিপত্য। তবু ওরই মধ্যে দু' একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নায়কের অফার পেলাম। মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। এদিকে আশা আছে ম্যাডানে গাঙ্গুলীমশাই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেবেন, আবার ওদিকেও প্রলোভন রয়েছে ভাল টাকার, মানে ম্যাডানে 'গিরিবালা'য় ও 'কালপরিণয়ে' যা পেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি টাকা। কী করি? অগত্যা বাবাকে গিয়ে সব বললাম। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বাবা বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার ওসব অফার না নেওয়াই ভাল। হাজার হোক ম্যাডান একটা বনেদী প্রতিষ্ঠান। ওরা বরাবর ছবি তুলে যাবে। তাছাড়া গাঙ্গুলীমশাই যখন বলেছেন তখন একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।'

তাই হল। সব ছেড়ে ম্যাডানের মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলাম।

আর একটা পরিবর্তন এই সময়ে লক্ষ্য করলাম। আগে, মানে বছরখানেক আগে, যাঁরা বায়োস্কোপে অভিনয় করি বললে নাক সিঁটকে সরে যেতেন, এখন তাঁরা দেখা হলে বায়োস্কোপের খুঁটিনাটি খবর জানবার জন্য ছুতোয়নাতায় আলাপ জমাবার চেষ্টা করেন। সামাজিক জীবনে বয়কটের গণ্ডিটা যেন ঢিলে হয়ে উঠল। একটা ঘটনার কথা বলি।

আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে অমরেশবাবু বলে এক ভদ্রলোক ভাড়া থাকতেন। উপর-নীচে চারখানা ঘর। বাইরের দরজা খুলে বেরোলেই নজর পড়ে উপরের

দুটো জানলার দিকে। দেখতাম পনেরো থেকে বাইশ বছরের চারটি বয়স্কা মেয়ে একটু সাড়া পেলেই এসে দাঁড়ায় ওই জানলা দুটোয়। যে দিন দরজা খুলে বেরিয়ে ওদের দেখতে পেতাম না, সেদিন দুষ্টুমি করে মাকে অথবা ছোট ভাইবোনদের উদ্দেশ্য করে গলা ছেড়ে বলতাম, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও, আমি স্টুডিওতে যাচ্ছি।' ব্যস, আর দেখতে হতো না। হয়তো খেতে বসেছিল, সেই অবস্থায় এঁটো হাতে চার বোনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। কিছুদিন বাদে ওদের দাঁড়ানোটা, আর আমার কোথাও বেরোবার আগে চেয়ে দেখাটা, একটা নেশার মতো হয়ে উঠল। মেয়েরা দেখতে যে খুব অপরূপ সুন্দরী তা নয়, তবুও সব মিলিয়ে ও-বয়সে মন্দ লাগত না। আশেপাশের বাড়ির অনেকেই জেনে গেল ব্যাপারটা। সবাই যেন মজা দেখে আর কৌতূহল চেপে অপেক্ষা করে থাকে একটা অঘটনের আশায়।

অমরেশবাবু পোস্ট আফিসের কেরানী। দশটা-পাঁচটার ডিউটি। তাছাড়া সকাল-বিকেল দুটো টিউশনি করেন। সংসারে নিজে, স্ত্রী, আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আটটি মেয়ে। চারটি বিয়ের যোগ্যা আর চারটি ছোট, বাড়িতে বাপের কাছেই পড়াশুনা করে। বড় মেয়ে চারটির বিয়ের কথা নিয়েও কানাঘুষো শুনলাম। কেউ বলে অমরেশবাবু হাড়-কেপ্পন, পয়সা খরচের ভয়ে বিয়ে দিচ্ছেন না। একথাও সবাই জানে যে ভদ্রলোক পোস্ট আফিসে টাকা জমিয়েছেন যথেষ্ট, তবুও টাকার নেশা প্রবল। স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে বঞ্চিত করে শুধু টাকা জমিয়েই চলেছেন। কেউ বলে ওসব নয়, লোকটা ভয়ানক ধড়িবাজ, কারো সঙ্গে একটা লটঘট পাকিয়ে ফাঁকতালে বিয়েটা দেবার মতলব। হাতে বেশ পয়সা আছে অথচ খরচ করবে না। বাড়িতে অতগুলো লোক, কিন্তু একটা ঠিকে ঝি পর্যন্ত রাখে না লোকটা পয়সা খরচের ভয়ে। সব কাজ মুখ বুঁজে করেন অমরেশবাবুর স্ত্রী। আমাদের পাড়ার আশেপাশে অনেকেই আমায় অ্যাভয়েড করে চলতেন। হয়তো ভাবতেন, বেশি আলাপ রাখলে একদিন যে লটঘটের অপেক্ষায় অমরেশবাবু বসে আছেন, অপ্রত্যাশিত ভাবে সেইটা আগে তাঁদেরই সংসারে ঘটে যাবে, নয়তো অন্য কী ভাবতেন তাঁরাই জানেন।

সেদিন স্টুডিও বন্ধ। পাঁচটার পর সিনেমায় যাব বলে সেজেগুজে বেরোচ্ছি, অভ্যাসমতো উপরে চেয়ে দেখি চারজোড়া হাসি-মাখা চোখ সজাগ প্রহরীর মতো ঠিক ডিউটি দিচ্ছে। আমার ছোট ভাইবোন দুটি স্কুলের পর পার্কে গেছে খেলতে, বাবাও স্কুল থেকে এসে টিউশনিতে বেরিয়ে গেছেন। ঝি-চাকরের বালাই নেই। বাড়িতে আছেন শুধু মা। দরজা বন্ধ করে দেবার জন্য অগত্যা বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকেই ডাকলাম, তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন। যাবার জন্য পা বাড়াতেই দেখি উপরের জানলায় মেয়েরা নেই। কোন যাদুমন্ত্রে নিমেষে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখানে দুটো কঠিন হাত দিয়ে লোহার রড দুটো ধরে ক্রুদ্ধ

চোখে দাঁড়িয়ে আছেন অমরেশবাবু। মনে হল শাপভ্রষ্ট দুর্বাসা চোখ দিয়ে ভস্ম করার ক্ষমতা হারিয়ে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের মতো রুদ্ধ আক্রোশে লোহার রডে মাথা খুঁড়ে মরছে। মনে মনে হেসে আস্তে আস্তে চলে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠেই চোখে পড়ল জানলা দুটো পুরু কালো পর্দায় আগাগোড়া ঢাকা। সে আবরণ ভেদ করে ভেতর থেকে হয়তো বাইরের সব কিছু দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে দেখা অসম্ভব। সাময়িক একটু দমে গেলেও কিছুদিন বাদে পর্দা প্রথায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। বেরিয়েই অভ্যাসমতো পর্দার দিকে তাকাই। দেখতে না পেলেও বেশ অনুভব করি চারজোড়া চোখের উপস্থিতি। আর একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করলাম। আগে সকালে বা বিকেলে অমরেশবাবুকে বাড়িতে দেখতে পাওয়া যেত না। ইদানীং দেখলাম আফিসের সময়টা ছাড়া সব সময়ে তিনি বাড়িতে। কখনো উপরে ঘুরছেন আর বেশীর ভাগ সময় নীচে বাইরের ঘরের দরজা খুলে বসে আছেন। অবাক হয়ে ভাবলাম, ব্যাপার কী? আমার জন্যে ভদ্রলোক টিউশনি ছেড়ে বাড়ি বসে মেয়েদের পাহারা দিতে শুরু করলেন নাকি? একদিন রাত্রে খাওয়ার সময় মার কাছে শুনলাম অমরেশবাবু প্রায়ই উপরের ঘরে দাঁড়িয়ে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, 'আগে যদি জানতাম থিয়েটার-বায়োস্কোপের লোক এ পাড়ায় থাকে, তাহলে কখনো এ বাড়ি ভাড়া নিতাম না। বাড়ি দেখছি, পেলেই উঠে যাব।' বাবা নির্বিকার। মা কথার সূত্র ধরে খানিকক্ষণ হা-হুতাশ করে গেলেন। রাগে ভেতরটা আমার রি-রি করে জ্বলতে লাগল। রাত্রে ভাল করে ঘুমোতে পারলাম না। মনে মনে কাতরভাবে বললাম—এর শোধ নেবার একটা সুযোগ তুমি আমায় করে দাও ভগবান। কথাটা বোধহয় ভগবান শুনেছিলেন।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি বেয়ে বড় রাস্তায় পড়তে হলে অমরেশবাবুর বাইরের ঘরের দরজার সামনে দিয়ে যেতে হয়।

কয়েকদিন পরে যাবার সময় কানে এল, 'শুনুন।'

থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখি বাইরের ঘরের দরজার কাছে চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে হাতে দৈনিক খবরের কাগজটা দলা পাকিয়ে ধরে এক অপরূপ ভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অমরেশবাবু। বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'আমায় কিছু বলছেন?'

তেমনিভাবেই অমরেশবাবু বললেন, 'খুব ব্যস্ত না থাকেন তো দয়া করে একটু বসুন। কয়েকটা কথা জানতে চাই।'

একবার ভাবলাম বলি যে, দাঁড়াবার সময় নেই। কিন্তু কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। কোনও জবাব না দিয়ে ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। সামনে চুপচাপ বসে খবরের কাগজ নিয়ে উসখুস করতে লাগলেন অমরেশবাবু।

বললাম, 'কী জানতে চান বলুন? বেশীক্ষণ বসতে পারবো না, কাজ আছে।'

একটু ইতস্তত করে অমরেশবাবু বললেন, 'আমাদের আফিসের কয়েকটি সহকর্মীর কাছে শুনেছিলাম যে শিশির ভাদুড়ী নাকি প্রফেসারি ছেড়ে দিয়ে যোগ দিয়েছে আপনাদের থিয়েটার-বায়োস্কোপের দলে? নরেশ মিত্তিরও তো শুনতে পাই বি. এল. পাশ, প্র্যাকটিস ছেড়ে বায়োস্কোপ করে বেড়াচ্ছেন।'

সংযত কণ্ঠে বললাম, 'ঠিকই শুনেছেন, এইটা শোনবার জন্যেই কি ডেকেছেন?'

—'হ্যাঁ, কীসের লোভে বলতে পারেন সুনাম, ইজ্জত, প্রতিপত্তি ছেড়ে মনুষ্যজীবনের অমূল্য সম্পদ চরিত্রটি খোয়াতে ওঁরা এই বিপথে পা বাড়িয়েছেন?'

সহজভাবেই বললাম, 'টাকা।'

অবাক হয়ে অমরেশবাবু বললেন, 'টাকা! টাকাটাই কি জীবনের সব চাইতে বড় হল?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই, টাকা থাকলে আপনার ঐ অমূল্য সম্পদগুলো আপনিই এসে হাজির হয়। কষ্ট করে খুঁজে বেড়াতে হয় না। এতখানি বয়স হল এটাও আপনাকে বলে দিতে হবে?'

ঘরের মধ্যে জানলার খড়খড়িটা যেন একটু ফাঁক হল। নারীকণ্ঠের একটু অস্ফুট চাপা গুঞ্জনও যেন কানে এল, কটমট করে জানলার দিকে একবার দেখে নিয়ে একটু উত্তেজিত ভাবেই অমরেশবাবু বললেন, 'আপনিও তো শুনলাম ছ'বছরের পুলিশের চাকরি ছেড়ে—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'ছেড়ে নয়, ছাড়িয়ে দিয়েছে।'

'—সে কী, কেন!' অবাক হয়ে বললেন অমরেশবাবু।

হেসে জবাব দিলাম, 'অমূল্য সম্পদটির জন্য। মগের মুলুকে খোদ গভর্নমেন্টের চাকরি করতে গিয়েও ওটা অক্ষত রাখতে পারলাম না। একটা গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে কেলেঙ্কারির ভয়ে পালিয়ে এলাম। উপরওয়ালা জানতে পেরে দূর করে তাড়িয়ে দিল। এখন বেশ আছি মশাই।'

দেখলাম ভদ্রলোক বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন, এরকম একটা উত্তর উনি আশাই করতে পারেননি। আমি তখন মরিয়া, মাথায় খুন চেপে গেছে। বললাম, 'এসব খবর রাখেন আর এটা রাখেন না যে, যাঁদের অনুকরণ করে আমরা বেঁচে আছি, বিশেষ করে ঐ বায়োস্কোপ-থিয়েটারে, তাঁদের দেশে নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 'স্যার' প্রভৃতি সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? এমন কি রাজা-রাণীও তাঁদের নেমন্তন্ন করে এক টেবিলে বসে খানা খেতে ইতস্তত করেন না?'

একটু আগে অবাক হয়ে যে হাঁ করেছিলেন, দেখলাম সেটি বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে অমরেশবাবু ঠায় তেমনি আমার দিকে চেয়ে বসে আছেন। হাসি পাচ্ছিল, অতি কষ্টে চেপে বললাম, 'আজ দুজন শিক্ষিত গুণীলোক বায়োস্কাপ করতে

নেমেছে শুনেই নাক সিঁটকোচ্ছেন। কিন্তু যেদিন ঐ দুয়ের সংখ্যা দুশোয় দাঁড়াবে সেদিন এতখানি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধে কথা কইতে আপনার রুচিতে বাধবে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অমরেশবাবু বললেন, 'কখনোই না। বায়োস্কোপ-থিয়েটারের লোক কোনোদিনই কারও সম্মান পাবে না। আর ঐ সব চরিত্রহীনদের জীবনের মূল্যই বা কী?'

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে উঠে অমরেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'একটু আছে। বায়োস্কোপ-থিয়েটারের লোক হলেই চরিত্রহীন হবে কি হবে না এ নিয়ে আপনার মতো লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আর সে প্রবৃত্তিও আমার নেই। শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি, পৃথিবীতে মানুষের খোলস নিয়ে জন্মে শেয়াল কুকুরের মতো কত অগুনতি জানোয়ার খেয়েদেয়ে বংশবৃদ্ধি করে সবার অগোচরে রোজ টুপটাপ করে মরে যাচ্ছে—তাতে হচ্ছে কী? ঐ অসংখ্য চরিত্রবান জীবগুলোকে মনেই বা রাখছে কে? আপনার কথাই ধরুন। ভগবান না করুন, কাল যদি হঠাৎ হার্টফেল করে আপনি মারা যান, দোর বন্ধ করে কাঁদবে আপনার একপাল মেয়ে আর স্ত্রী। ব্যস, চুকে গেল। আর এদিকে দেখুন, কাল যদি শিশির ভাদুড়ী কিংবা নরেশ মিত্তির এমনকি কাল কা যোগী আমিই হঠাৎ মরে যাই, খবরের কাগজগুলোয় খুব ছোট্ট করে হলেও খবরটা বেরোবে, আর খুব কম করে দু'শ লোক শ্মশানে গিয়ে এইসব চরিত্রহীনদের উদ্দেশে সমবেদনার একফোঁটা চোখের জল, নয়তো একটা মৌখিক 'আহা' অন্তত বলে আসবে। এইটাই কি কম লাভ?'

দেখলাম রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছে অমরেশবাবুর। চেষ্টা করেও কথা কইতে পারছেন না। শুনেছিলাম পূর্ববঙ্গে বাড়ি, বহুদিন এদেশে আছেন বলে কথাবার্তায় কিছুই ধরা যায় না। শুধু উত্তেজিত হয়ে উঠলে বা রাগলে দু'একটা দেশের কথা বেরিয়ে পড়ে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেও পারলেন না, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'বোঝলাম, আপনি অখন যাইতে পারেন!'

বিজয়ী সেনাপতির মতো হেসে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অনেকদিন বাদে মনটা হাল্কা হয়ে গেল। আনন্দাতিশয্যে নগদ তিন আনা খরচা করে চড়কডাঙার মোড়ে লক্ষ্মীর চায়ের দোকানে ঢুকে এক আনার একটা বড় মটন চপ, আর দু' আনার একটা ডিমের ডেভিল খেয়ে ফেললাম।

দিনতিনেক বাদে একদিন সকালে উঠে অবাক হয়ে দেখলাম অমরেশবাবুর জানলা-দরজা সব বন্ধ। ব্যাপার কী? বাড়িওয়ালার কাছে শুনলাম আট মাসের বাড়িভাড়া মেরে দিয়ে ভদ্রলোক রাতারাতি অমূল্য সম্পদ বাঁচাতে অজ্ঞাতবাসে চলে গেছেন।

খুব খুশি হতে পারলাম না, হাজার হোক এতদিনের অভ্যাসটা—।

শনিবার সকাল সকাল খেয়ে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে রইলাম। আজ 'কালপরিণয়' ছবির কোর্ট সিনটা নেওয়া হবে। এইটাই শেষ শুটিং। বেশ একটু বেলায় গাড়ি নিয়ে এল মুখার্জি, এসেই হতাশ ভাবে বলল, 'নাঃ, হল না।'

—'কী হলো না?'

—' আলিপুর কোর্ট থেকে আসছি। অনেক চেষ্টা করে দেখলাম কোর্টের ভিতর রিফ্লেকটার ও তিন চারখানা বড় আয়না দিয়েও আলো ঢোকানো যাবে না।'

বললাম, 'তা হলে উপায়?'

বিজ্ঞের হাসি হেসে মুখার্জি বলল, 'উপায় একটা করেছি বৈকি! আমার আগেই সন্দেহ ছিল, সেইজন্য খরবুজ মিস্ত্রিকে সঙ্গে করে তিন-চারদিন আগে আলিপুর আদালত ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি। সে তৈরি করেছে কাঠের ফ্রেম, আর তার উপর কাপড় এঁটে রং লাগিয়েছেন দীনশা ইরাণী। কাল সারাদিন ধরে সিনটা ফিট করেছি। চল দেখবে। সিনটা দেখলেই মনে হবে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারকক্ষটিকে যেন আলাদিনের মতো স্রেফ তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে ম্যাডানের সিমেন্ট করা ফ্লোরটার উপর।'

দীনশা ইরাণী, বর্তমানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর নাম করা রেকর্ডার জে. ডি. ইরাণীর পিতা। তখনকার দিনে উনি ছিলেন ম্যাডানের একসক্লুসিভ আর্ট ডাইরেক্টর ও পেন্টার। কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের ও স্টুডিওর যাবতীয় সিনসিনারি ওঁরই নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি হতো।

স্টুডিওতে পৌঁছে তাড়াতাড়ি মেক-আপ রুমের দিকে চলে গেলাম। টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর পিছনে রেলিং-এর গা ঘেঁষে যে ছোট্ট লাল রঙের ঘরখানা দেখা যায় সেইটাই ছিল তখন সবেধন নীলমণি মেক-আপ রুম। বর্তমানে ওটাকে ইলেকট্রিক জেনারেটিং রুম করে ব্যবহার করা হয়।

মেক-আপ রুমে তিল ধারণের স্থান নেই। সাদা প্যান্ট আর কালো কোট গিসগিস করছে। মুখার্জি এসে বলল, 'কোনো রং নয়, শুধু পাউডার আর কালো পেন্সিল দিয়ে চোখ-ভুরু এঁকে ছেড়ে দাও।'

এখানে বলা দরকার মাস দুই থেকে মেক-আপের জিনিসপত্তরও বদলে গেছে। সবেদা পিউড়ির পরিবর্তে চালু হয়েছে জার্মানীর লিচনার কোম্পানির স্টিক পেন্ট, গায়ের রং অনুসারে শেড নম্বর দেওয়া। কাজল দিয়ে চোখ-ভুরু আর আঁকতে হয় না। এসেছে কালো পেন্সিল। আলতার স্থান অধিকার করেছে লিপস্টিক। প্রথম প্রথম ভয়ানক অসুবিধা হতো, পরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

আমার ওসব বালাই ছিল না। তিন-চারদিন না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে

ভুসো কালি মাখিয়ে ঘন করে নিলাম যাতে আগের সিনের সঙ্গে কন্টিনিউইটি ব্যাহত না হয়। তেল-না-মাখা রুক্ষ চুলগুলো ফাঁপিয়ে আরও উস্কোখুস্কো করে নিলাম। তারপর রাজবেশ, সেই ছেঁড়া তালি দেওয়া কোটটি আর শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়।

পোশাক পরে ভুসো কালি আঙুলে করে চোখের নীচটায় লাগাতে যাচ্ছি, কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে মুখার্জি বলল, 'এদের মধ্যে বেশির ভাগই সত্যিকারের উকিল। আলিপুর বটতলা থেকে ধরে এনেছি।'

চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দিতে হবে?'

'এক পয়সাও না। ছবিতে নামছে এই ঢের। আবার পয়সা!' উকিলদের আর একবার তাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মুখার্জি।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই শুটিং শুরু হল, প্রথমে নেওয়া হল একটা লঙ শট কোর্টের অ্যাটমসফিয়ারের জন্যে। তারপর সব ক্লোজ শটে নেওয়া হল— আমার, নরেশদার ও হাকিমের সিনগুলো। পাঁচটার মধ্যেই শুটিং শেষ হয়ে গেল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে ক্যালেন্ডারের দিকে চেয়ে মনে করতে হল না যে আজ আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত রবিবার। দাড়ি কামিয়ে, মাথায় বেশ করে তেল মেখে, সাবান দিয়ে স্নান করে খেয়েদেয়ে বারোটার আগেই রওনা হয়ে পড়লাম খিদিরপুরে। রিনিদের বাইরের দরজায় কড়া নাড়তে না নাড়তেই দরজা খুলে গেল। সামনে বিষাক্ত সাপ দেখলে যে অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই এক পা পিছু হটে অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে রিনি নয়, রায়বাহাদুরের মেয়ে গোপা!

আমার অবস্থা দেখে গোপা হেসে বলল, 'দয়া করে ভেতরে আসুন। আমাদের রান্নাঘর থেকে ওখানটা পরিষ্কার দেখা যায়।'

লজ্জা পেয়ে ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করতেই হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল রিনি। গোপাকে জড়িয়ে ধরে বলল—'কেমন, বলিনি গোপাদি, আজ ছোড়দাকে বোকা বানিয়ে দেব?'

বাকশক্তি ফিরে এল। কপট রাগের ভান করে বললাম, 'চলো উপরে, কাকাকে বলে আজ মজা দেখাচ্ছি তোমার।'

কিছুমাত্র না দমে আবার হাসতে লাগল রিনি।

গোপা বলল, 'ছোট ভাইবোনেদের নিয়ে রিনির মা-বাবা সকালে আফিসের এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্নে গেছেন। ফিরতে সেই সন্ধ্যে। বাড়িতে আছে শুধু রিনি আর মোক্ষদা।'

রিনি বলল, 'মোক্ষদা আবার কানে কম শোনে।'

তিনজনেই হেসে উঠলাম। রিনি বলল, 'বারে, এইখানে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা

কইবে নাকি? উপরে চল।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললাম, 'তোকে একা রেখে কাকা-কাকিমা গেল যে বড়?'

রিনি বলল, 'এমনিই কি গিয়েছে, আমার যে জ্বর। তাছাড়া সামনে এগজামিন, পড়াশুনার ক্ষতি হবে যে!'

বললাম, 'পড়াশুনা যা করছিলি তাতো নিজের চোখেই দেখলাম। আর জ্বর—'

উপরে উঠে দেখি তক্তপোশের উপর একটা মাদুর পাতা, একটা মাথার বালিশ ও চাদর রয়েছে একপাশে। বুঝলাম সত্যিই রিনি অসুস্থ। গোপা তাড়াতাড়ি ওদের বাড়ির দিককার জানলাটা বন্ধ করে দিল। তারপর মাদুরটার একপাশে বসে বলল, 'বসুন।'

সকালে আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানিনা। দূর থেকে শুধু দেখা নয়, একেবারে পাশে বসে কথা কওয়া! দুরুদুরু বক্ষে একপাশে অপরাধীর মতো বসে পড়লাম। এরই মধ্যে দেখি রিনি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বালিশটা মাথায় দিয়ে শুয়ে একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে।

গোপা বলল, 'আপনি আমায় এ বাড়িতে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছেন, না? মাসিমা, মানে রিনির মা, যাবার সময় আমায় ডেকে বললেন, 'মেয়েটা একলা রইল, যদি পারো দুপুরে এসে ওর ইংরেজি পড়াটা একটু দেখিয়ে দিও।'

বালিশ থেকে মাথা তুলে ফোঁস করে উঠল রিনি, 'ওঃ, সেই জন্যেই বুঝি তুমি সুড়সুড় করে চলে এসেছ গোপাদি? জান ছোড়দা, তুমি আসবার আগে অন্তত চার-পাঁচবার জিজ্ঞাসা করেছে গোপাদি, তোমার ছোড়দা আসবেন তো রিনি?'

'— আঃ রিনি!' বাধা দিল গোপা। লজ্জা পেয়ে আবার শুয়ে পড়ল রিনি।

মুখ নীচু করে মাদুরটার একটা ধার নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে গোপা বলল, 'হ্যাঁ সত্যি, আপনি না এলে আজ ভারি দুঃখ পেতাম। আমার সেদিনকার ব্যবহারে আপনি আমায় অভদ্র ইতর এই রকম অনেক কিছু ভেবে নিয়েছেন হয়তো, আর ভাবাটাই স্বাভাবিক। তাই সব কথা আপনাকে জানিয়ে ক্ষমা চাইব বলে রিনিকে আপনি আসবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'

বললাম, 'আপনি কেন এর জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে করে মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছেন? রিনি আমাকে বলেছে কেন ওভাবে হঠাৎ আপনি জানলা বন্ধ করে চলে গিয়েছিলেন।'

গোপা বলল, 'রিনি আন্দাজ করেছিল মাত্র, সব কথা না শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন না।'

মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আমার মতো একজন সমাজের তুচ্ছ

অবজ্ঞাত নায়কের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য গোপার মতো মেয়ের এত মাথাব্যথা কেন? সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকম যুক্তি দিয়েও কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবলাম, দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্র দেবা ন জানন্তি, আমি তো কোন ছার!

গোপা বলে চলল, ' আমাকে দেখে ভাবছেন কলেজে-পড়া মেয়ে, গায়ে পড়ে সিনেমার নায়কের সঙ্গে আলাপ করে, নিশ্চয়ই বাড়ির অভিভাবকরা খুব লিবারেল। ভুল, মস্ত ভুল ধারণা। আমার মা উগ্র সেকেলেপন্থী। তাঁর মতে চলতে হলে আরো দু'তিনটে যুগ পিছু হটে যেতে হয়। তিনি চান মেয়েরা বেশি লেখাপড়া শিখবে না। থেমে থমকে বড় জোর সুর করে রামায়ণ-মহাভারতটা পড়বে আর গোয়ালা ও ধোপার হিসেবটা রাখবে। পুরুষের সান্নিধ্য একদম পরিহার করে চলবে। বয়স দশ-এগারো হলেই অভিভাবকরা বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করবেন। সেই থেকে দেড় হাত ঘোমটা টেনে শ্বশুরবাড়ি আসবে। শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামীর সেবা থেকে শুরু করে মায় রান্না পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় কাজ নিজের হাতে তুলে নেবে। ছেলেপিলে হলে তাদের মানুষ করবে এবং বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেলে প্রাণপণে চেষ্টা করে আগে মরে ইহলোকে সতীত্বের ডঙ্কা বাজিয়ে পরলোকে স্বর্গের সিঁড়ির ধাপগুলো আঁচল দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবে।'

রিনি হেসে উঠল। ওর দিকে একবার দেখে নিয়ে শান্তকণ্ঠে আবার শুরু করল গোপা, 'আমার বাবা কিন্তু ঠিক উল্টো। তিনি চান মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবে, সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর নিজে দেখে পছন্দমতো বিয়ে করবে। সংসারে অনটন বুঝলে স্বামীর সঙ্গে চাকরির সন্ধানে বেরোতেও দ্বিধা করবে না।'

একটু থেমে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল গোপা। আমার জিজ্ঞাসু চোখের ভাষা বুঝতে পেরেই বোধহয় বলতে শুরু করল, 'আমি যথাসম্ভব আমার বাবার মতবাদকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করি, মায়ের ভয়ে সব সময় পেরে উঠিনা। তাইতো সেদিন মায়ের সাড়া পেয়ে হঠাৎ জানলা বন্ধ করে সরে গিয়েছিলাম। কাজটা খুব অশোভন ও অন্যায় হয়েছিল স্বীকার করছি, কিন্তু সাংসারিক অশান্তি ও কেলেঙ্কারি এড়াবার ওছাড়া আর পথও বা কী ছিল বলুন তো?'

এস্রাজে পাকা দরদী হাতের দরবারী কানাড়ার আলাপ শুনছিলাম এতক্ষণ। থেমে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবছিলাম শ্রোতার আসনে বসে অনায়াসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারি শুধু কাছে বসে গোপা যদি কথা বলে যায়। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ গোপার। চেয়ে দেখি এরই মধ্যে কখন রিনি উঠে গেছে। নির্জন বারান্দায় পাশাপাশি বসে আছি শুধু আমি আর গোপা। চুপ করে থাকি, কিছু বলবার চেষ্টা করি, কথা খুঁজে পাই না।

হঠাৎ রিনির কথায় চমক ভাঙে, নীচ থেকে উঠে সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে

টোল-খাওয়া গালে দুষ্টুমির হাসি মাখিয়ে রিনি বলল, 'তোমাদের দুজনকে ওভাবে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জান?'

শঙ্কিত চোখে দুজনে তাকাই রিনির দিকে, না জানি দুষ্টু মেয়েটা কী কথা বলে ফেলে।

আমাদের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হেসে রিনি বলে, 'না বাবা, বলব না। জানি ছোড়দা খুশিই হবে কিন্তু গোপাদি যদি রাগ করে?'

বেশ রেগেই বললাম, 'শুধু গোপাদি নয়, আমিও ভীষণ রাগ করব রিনি। এরকম ফাজলামি যদি কর, আর কখনও তোমাদের বাড়ি আসব না।'

তুই থেকে 'তুমি' সম্বোধনে রিনির মুখের হাসি নিমেষে মিলিয়ে গেল। ও বেশ বুঝতে পারল আমি সত্যিই রাগ করেছি।

মুখখানা কাঁচুমাচু করে কাছে এসে বলল, 'আমায় মাফ কর ছোড়দা।'

আদর করে কাছে টেনে নিয়ে গোপা বলল, 'ওরে দুষ্টু মেয়ে, মনে হওয়া সব কথাগুলো যদি সবাই ভাষায় রূপ দিয়ে প্রকাশ্যে ছেড়ে দিত, পৃথিবীতে তাহলে এতদিনে বিপ্লব শুরু হয়ে মানুষের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়ে যেত।'

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসে গল্প করছেন, ওদিকে আপনার মা যদি বাড়িতে দেখতে না পেয়ে—' ইচ্ছে করেই শেষ করলাম না কথাটা।

একটু গম্ভীর হয়ে গোপা বলল, 'আজ অমাবস্যা, সেদিক থেকে কোনো ভয় নেই।'

কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলাম। রিনিও দেখি বেশ একটু অবাক হয়ে চেয়ে আছে। গোপা বলল, 'অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই দুটো দিন আমরা মায়ের প্রভাবমুক্ত।' কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।

কপট গাম্ভীর্যের আবরণ খসে গেল, হেসে ফেলল গোপা। বলল, 'বুঝতে পারলেন না? আমার মা খুব মোটাসোটা মানুষ। কাজেই সায়েটিকা বাতের হাত থেকে নিস্তার পাননি। অমাবস্যা আর পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা খুব বেড়ে যায়, মা একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আর ঐ সময়ে পেয়ারের ঝি হরিমতি ছাড়া আর কারও মায়ের ঘরে প্রবেশ নিষেধ।'

তিনজনে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। হঠাৎ জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে হাসি থেমে গেল রিনির। ভয়ে পাংশু মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সর্বনাশ! গোপাদি, মা-বাবা!'

উঠে উঁকি দিয়ে দেখি, রিনির মা-বাবা ছোট ভাইবোনকে নিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে গলির পথ ধরছেন। এতক্ষণ সময়ের হিসেব ছিল না। সন্ধ্যে হয় হয়। এ অবস্থায় রিনির মা-বাবা আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখলে যা ভাববেন, কল্পনা করেও

আঁতকে উঠলাম।

—'কী হবে গোপাদি?'

—'তোমাদের ঝি মোক্ষদা কোথায়?'

—'এই তো একটু আগে তাকে বার করে বাইরের দরজা দিয়ে এলাম। আজ বাড়িতে রান্নার হাঙ্গামা নেই বলে মা ওকে এ-বেলা ছুটি দিয়ে গেছেন।'

অদ্ভুত বুদ্ধিমতী মেয়ে গোপা। এক মিনিট চিন্তা করে বলল, 'নিচে চল শিগগির, আমি ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে থাকব, তোমার মা-বাবাকে দরজা খুলে দাও। ওঁরা উপরে এলে আমি বেরিয়ে যাব, তারপর দরজা বন্ধ করে তুমি উপরে উঠে আসবে।'

কথা শেষ হবার আগেই বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল। রিনি ও গোপা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। চুপ করে তক্তপোশের একপাশে বসে রইলাম। কাকা আগে এলেন, আমায় দেখে একটু অবাক হয়েই যেন বললেন, 'এই যে, তুমি কতক্ষণ?'

যা কপালে থাকে, বলে ফেললাম, 'এই ঘন্টাখানেক আগে। বাড়িতে কেউ নেই, তাই রিনি বলল, মা-বাবা না আসা পর্যন্ত যেতে পারবে না।'

পেছন থেকে কাকিমা বললেন, 'তা বেশ করেছিস। ঐ একফোঁটা মেয়েকে একলা বাড়িতে রেখে গেছি। আমি অনেকক্ষণ থেকে ছটফট করছি আসবার জন্যে, তো ওঁর আর গল্পই শেষ হয় না।'

দরকারি অদরকারি দু'চারটে সাংসারিক কথাবার্তার পর বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম যখন, রায়বাহাদুরের পেটা ঘড়িতে তখন ঢং-ঢং করে সাতটা বাজছে।

ট্রামে সারাটা পথ শুধু গোপার কথাই ভাবতে ভাবতে এলাম। বাড়ি আসতেই বাবা বললেন, 'এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস (বর্তমান মিনার্ভা সিনেমা) থেকে গাঙ্গুলীমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। বলেছেন যতই রাত হোক তাঁর সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

ভাবলাম ব্যাপারটা কী? 'কালপরিণয়' শুটিং তো শেষ—তবে কী?

বাবা বললেন, 'বোধহয় ভাল খবর হবে, তোমার জন্যে হয়তো একটা মাস-মাইনে ঠিক করেছেন।'

বাবার অনুমানই ঠিক বলে মনে হল। বহুবার একটা বাঁধা মাইনে করে দেবার জন্যে গাঙ্গুলীমশাইকে জ্বালাতন করেছি। তাছাড়া 'গিরিবালা' ও 'কালপরিণয়' ছবি দুটোতে কাজ ভালই করেছি, সুতরাং একটা ভাল মাইনে আশা করা খুব অন্যায় নয়। কাপড়চোপড় না ছেড়েই বাবা-মা'র পায়ের ধুলো নিয়ে ধর্মতলার ট্রামে উঠে বসলাম।

এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসের লবিতে ঢুকেই বাঁ হাতে পড়ে একটা বুকিং কাউন্টার। তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা বড় ঘর। সেইটাই গাঙ্গুলীমশাইয়ের আফিস।

সিনেমার ম্যানেজারি, স্টুডিওর শুটিং-এর যাবতীয় প্রাথমিক কাজকর্ম এখানে বসেই করেন তিনি।

ঢুকেই দেখি ঘরভর্তি লোক। নমস্কার করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু বাদে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'একটু ঘুরে এস ধীরাজ, বড্ড ব্যস্ত।'

বেরিয়ে লবিতে এসে দাঁড়ালাম। আগামী ছবিগুলোর ফটো দেওয়ালে চারদিকে বোর্ডে টাঙানো, ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখতে লাগলাম। একটা বোর্ডের কাছে এসে দেখি নির্বাক বিখ্যাত ছবি 'শো-বোট' এর কতকগুলো পুরোনো ফটো, উপরে বড় বড় ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে—' সাউন্ড সিনক্রোনাইজড, চল্লিশ পারসেন্ট টকি।' টকি জিনিসটাই তখনও ভাল করে বুঝিনি। শুধু লোকপরম্পরায় ও দু'একটা ইংরেজি সিনেমায় দেখতাম,আমেরিকা ছবিকে কথা কওয়াবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তারিখটা দেখলাম সামনের শনিবার। হঠাৎ দেখি ব্যস্তসমস্তভাবে মুখার্জি বেরিয়ে আসছে গাঙ্গুলীমশাইয়ের ঘর থেকে। অকূলে কূল পেলাম যেন। ডাকতেই কাছে এসে দাঁড়াল মুখার্জি। বললাম, 'সাউন্ড সিনক্রোনাইজড, চল্লিশ পারসেন্ট টকি, এগুলোর মানে কী মুখুজ্যে?'

কোনও জবাব না দিয়ে অনুকম্পাভরা দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল মুখার্জি। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'না, তুমি একেবারে হোপলেস। চল্লিশ পারসেন্ট টকি মানে ছবিটা পুরোপুরি সবাক নয়, এটাও বুঝতে পারলে না?'

বললাম, 'তা বুঝেছি, নির্বাক 'শো-বোট' আমি দেখেছি, বোর্ডের স্টীল ছবিগুলো দেখেও মনে হচ্ছে এটা সেই পুরোনো ছবিটা। তাহলে ও কথাগুলোর মানে কী?'

মুখুজ্যে বলল, 'নির্বাক ছবিটায় পল রোবসনের গান শুনতে পেয়েছিলে কি?'

বললাম,'না।'

মুখুজ্যে বলল, 'এটায় পাবে।'

চল্লিশ পারসেন্ট টকি কথাটার মানে বুঝলাম এতক্ষণে। বললাম, 'আর ঐ যে লেখা আছে সাউন্ড সিনক্রোনাইজড, ওটার মানে?'

সামনে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চেয়ে কী যেন ভাবল মুখার্জি, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'ওসব সায়েন্সের গোলমেলে ব্যাপার, তুমি বুঝবে না।' বলেই যাবার জন্যে পা বাড়াল মুখার্জি। একরকম ছুটে গিয়েই ধরলাম ওকে। বললাম, 'ঐ দুটো কথার মধ্যে বিজ্ঞানের কী বাঘ-ভালুক লুকিয়ে থাকতে পারে—বুঝতে পারছি না, বল না ভাই মুখুজ্যে?'

দাঁড়িয়ে আশেপাশে চারদিকে দেখে নিয়ে চুপিচুপি বলল মুখার্জি, ' সত্যি কথাটা বলতে কী, ঐ 'সাউন্ড সিনক্রোনাইজড' কথাটার মানে আমি নিজেই ভাল বুঝতে পারিনি।' বলেই কর্পোরেশন বিল্ডিং-এর উত্তর দিকের রাস্তা ধরে হনহন করে হাঁটতে

শুরু করল মুখার্জি।

খুব ছোটবেলায় ঠাকুরদার কাছে শোনা একটা গল্প মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

অনেক-অনেকদিন আগে,বোধহয় ইংরেজ আমলেরও আগে,বাংলাদেশের একটি ছোট গ্রামে গল্পটির জন্ম হয়। গাঁয়ের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত; দু'একজন একটু-আধটু লিখতে পড়তে পারে। বিদেশে যাওয়া দূরের কথা, বেশির ভাগ লোকই গাঁয়ের বাইরে পা বাড়ায়নি। কিন্তু তাতে তাদের কোনোদিন কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের যত দুরূহ সমস্যাই হোক না কেন, এককথায় জলের মতো মীমাংসা করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারতেন গ্রামের মাত্র একটি লোক। তিনি গাঁয়ের মোড়ল শ্রীবিষ্ণুপরমেশ্বর গড়গড়ি। বয়স একশো দশ পার হয়ে গেলেও মোড়ল অথর্ব বা অকর্মণ্য হয়ে পড়েননি। প্রায়ই দেখা যেত ষোল বেহারার পাল্কি চড়ে মোড়ল চলেছেন কোনো না কোনো ব্যাপারের মীমাংসা করতে। মোট কথা মোড়ল যা করবে তাই। তাঁর উপর কথা কইবার সাহস বা ক্ষমতা কারও ছিল না।

গাঁয়ের শেষ প্রান্তে পথের ধারে এক বিরাট গর্ত। বোধহয় পুকুর কাটবার মতলবে শুরু হয়ে কী কারণে বন্ধ হয়ে যায়। দৈবাৎ একটা দলছাড়া হাতি কী করে যেন ঐ গর্তে পড়ে যায়। নিশুতি রাতে একটা বিকট আর্তনাদ শুনে কৌতূহলী গাঁয়ের লোক সব জড়ো হয় গর্তের চারপাশে। গর্তের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার দেখে ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। চোখে দেখা দূরে থাক, এরকম একটা বিরাট জীবের অস্তিত্বও এতদিন ওদের কল্পনাতীত ছিল। সবাই মিলে ঐখানে বসেই গবেষণা শুরু করে। অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়েও যখন কোনও মীমাংসায় পৌঁছনো গেল না, তখন ওদের মধ্যে একজন বলল, 'আমরা তো আচ্ছা মুখ্যু, আমাদের সবজান্তা মোড়ল বেঁচে থাকতে এই রকম একটা জটিল ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করছি!'

অকূলে কূল পাওয়া গেল। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল—'ডাক মোড়লকে!'

তখনই লোক ছুটল মোড়লের বাড়ি। একঘন্টার মধ্যে পাল্কি চড়ে মোড়ল এসে হাজির। পাল্কি থেকে নেমে বেশ কিছুক্ষণ হাতিটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল মোড়ল। চারপাশে অগণিত জনতা রুদ্ধনিশ্বাসে চুপ করে আছে। হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল মোড়ল, সে কান্না আর থামে না। জনতা প্রথমটা মোড়লকে ওভাবে কাঁদতে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল, পরে একটু একটু করে সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ল সে কান্না। পরে যারা এল, কিছু না বুঝে তারাও তার সঙ্গে কাঁদতে শুরু করল। প্রায় আধঘন্টা পরে রীতিমতো পরিশ্রান্ত হয়ে কান্না থামিয়ে আবার হাতিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মোড়ল। নিস্তব্ধ জনতা

মোড়লের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কান্নার মতোই হঠাৎ এবার হাসতে শুরু করল মোড়ল। প্রথমটা আস্তে, তারপর একটু একটু করে বাড়তে লাগল হাসি। কিছু না বুঝে জনতাও হাসতে শুরু করল। ভাবল মোড়ল যখন হাসছে, তখন হাসবার ব্যাপার একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। সারা গাঁয়ে প্রতিধ্বনি তুলে হাসির ঝড় বয়েই চলল।

হাসতে হাসতে বসেই পড়েছিল মোড়ল। খানিক বাদে হাসি থামিয়ে কাউকে কিছু না বলে পাল্কিতে উঠে বেহারাদের যাবার ইশারা করতেই জনতার মধ্যে অস্ফুট চাপা গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে গেল। কেউ সাহস করে কিছু বলতে পারে না, এদিকে মোড়লও চলে যায়। অগত্যা সাহস করে একজন এগিয়ে আসে পাল্কির কাছে। মোড়ল বলে, 'কী চাও?'

লোকটা ভয়ে ভয়ে বলে, 'কিছু তো বলে গেলে না মোড়ল?'

'বলবার কিছু নেই বলে বলিনি।' বেশ রেগেই বলে মোড়ল।

লোকটা বলে, 'কিন্তু তুমি ওভাবে কাঁদলেই বা কেন, আর শেষকালে হেসে কিছু না বলেই বা যাচ্ছ কেন, এটা বলে যাও!'

মোড়ল বলল, 'কাঁদলাম এই জন্যে যে, আমি মরে গেলে তোদের মতো হাঁদা-গঙ্গারামদের উপায় কী হবে!'

লোকটি খুশি হয়ে বলল, 'বেশ, কিন্তু শেষকালে হাসলে কেন মোড়ল?'

মোড়লের রেখাবহুল কুঞ্চিত মুখখানায় একটু হাসির আভাস দেখা গেল। 'হাসলাম কেন শুনবি?'

বলে হাতিটার দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে মোড়ল বলল, 'ও ঘোড়ার ডিম আমিও চিনতে পারলাম না।'

নিঃশব্দে নিজের মনে দাঁড়িয়ে হাসছিলাম। দেখলাম পার্টিশনের দরজা ঠেলে গাঙ্গুলীমশাই বাইরে বেরিয়ে আসছেন। হাসি থামিয়ে এক-পা দু-পা করে ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

লবির পশ্চিমদিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। নিঃশব্দে দুজনে উপরে উঠে বারান্দায় দুখানা চেয়ারে বসলাম। চারপাশে কেউ কোথাও নেই। পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বার করে তা থেকে একটা সিগারেট নিয়ে কেসটার উপর ঠুকতে ঠুকতে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'তোমার কথা ফ্রামজী সাহেবকে বললাম ধীরাজ। সাহেব সামনের সপ্তাহেই আমেরিকা চলে যাচ্ছে। ভাবলাম, যাবার আগে তোমার একটা কিছু করে নেওয়া দরকার—'

কথাটা শেষ করলেন না গাঙ্গুলীমশাই। সিগারেটটা ধরিয়ে দু'তিনটে টান দিয়ে আবার শুরু করলেন, 'সাহেব পারমানেন্ট লোক নিতেই রাজি হয় না। অনেক

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোমার অভিনয়ের সুখ্যাতি করতে খানিকটা নিমরাজি হয়েছে। কিন্তু মাইনে খুব কম দিতে চাইছে। এখন তুমি যা ভাল মনে হয় কর।'

আশা-নিরাশার দোলনায় দুলতে দুলতে সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত?'

সামনের ছোট গোল টেবিলটার উপর অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'ষাট টাকা মাসে।'

মনে হল কে যেন আমাকে দোতলার বারান্দা থেকে সবলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে নীচের কংক্রিটের রাস্তাটার উপর। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'ষাট টাকা মাসে?'

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সাহেব ওর বেশী কিছুতেই রাজী হল না।' হঠাৎ হাতঘড়িটা দেখে উঠে দাঁড়ালেন গাঙ্গুলীমশাই। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন, 'এঃ, দশটা বেজে গেছে, বড় ছেলেটার জ্বর দেখে এসেছি। আচ্ছা আমি চললাম।'

কাঠের সিঁড়িগুলোয় বিরাট পায়ের প্রতিধ্বনি তুলে নীচে নেমে গেলেন গাঙ্গুলীমশাই। ইচ্ছে থাকলেও উঠবার ক্ষমতা ছিল না। চুপ করে বসে রেসের আপসেট ঘোড়ার মতো ভাগ্যের এই ডিগবাজির কথাই ভাবতে লাগলাম। হপ্তাখানেক আগে কার্তিক রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা নিজেরাই ফ্রামজীর সঙ্গে দেখা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেড়শ টাকা মাইনেতে ম্যাডানের পারমানেন্ট স্টাফে ভর্তি হয়ে যান। রোজ একবার করে এসে কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের অডিটরিয়মে বসে দু'-চারটে খোস গল্প করে চাকরি বজায় রেখে বাড়ি চলে যান।

গাঙ্গুলীমশাইকে চাকরির তাগাদা দিতে প্রায় রোজই একবার করে হেড আফিসে যেতে হতো। এখানেই ভানুদার সঙ্গে আলাপ। চমৎকার মানুষ। শিক্ষিত, অমায়িক, সদালাপী। একবার আলাপ হলে চেষ্টা করেও সহজে ভোলা যায় না।

আজও স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথাগুলো। আমায় দেখেই ভানুদা ডেকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ভায়া, পাকাপাকি ব্যবস্থা কিছু হল?'

ম্লান হেসে জবাব দিলাম, 'না, গাঙ্গুলীমশাই বললেন এখনও ফ্রামজীর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পাননি, সাহেব খুব ব্যস্ত।'

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন ভানুদা, 'আমরা ভাই চুনোপুঁটি, সুপারিশ পাব কোথায়? নিজেরাই সাহস করে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললাম—ছবিতে নামতে চাই। ফ্রামজী কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে চটপট বলে গেলাম। ব্যস, চাকরি হয়ে গেল। মাসে দেড়শ' টাকা মাইনে, দু-একটা ছবিতে কাজ দেখে পরে বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। দু-দুখানা বাঘা ছবির নায়ক, তার উপর মুরুব্বি ধরেছ বড় রুই গাঙ্গুলীমশাইকে। ব্যস্ত হয়ো না ভাই, ধৈর্য ধরে একটু সবুর করো, মেওয়া ফলবেই।'

এত দুঃখেও হাসি এল। ভাবলাম ভানুদার সঙ্গে দেখা হলে বলব, 'মেওয়া ফলেছে ভানুদা। তবে দেরি একটু বেশি হয়েছে বলে খাওয়ার অযোগ্য, ভেতরটা পচা।'

মনে পড়ল খিদিরপুরে কাকার সঙ্গে এই মাইনের কথা নিয়ে আলোচনার সময় আমার দম্ভভরা উক্তিগুলো। সব ছাপিয়ে বাবার কথাগুলো বারবার কানে ভেসে আসছিল। গাঙ্গুলীমশাই যখন কথা দিয়েছেন, একটা ভাল ব্যবস্থা হবেই।

দরোয়ান সামনে এসে দাঁড়াল। ফিরে চাইতেই সেলাম করে বলল, 'হুজুর, সাড়ে এগারা বাজ গিয়া, আভি ফটক বন্ধ হোগা।'

উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। জনবিরল পথ। হাঁটতে হাঁটতে ট্রামের রাস্তায় এসে দেখি লোক ভর্তি একখানি ট্রাম সবে ছাড়ছে, বোধহয় শেষ ট্রাম। একটু চেষ্টা করলে হয়তো ওটাতে যেতে পারতাম, প্রবৃত্তি হল না। চুপ করে একটা টেলিগ্রাফের পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে নিঝুম অন্ধকার গড়ের মাঠ। দূরে তারার মালার মতো অস্পষ্ট ল্যাম্পপোস্টের মাথার আলোগুলো, উদ্দেশ্যহীনভাবে সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজ্যের চিন্তা বিদ্রূপের রূপ ধরে ঘিরে ফেলল।

স্টুডিওর সহকর্মীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ—বড় মুরুব্বি ধরে, দুখানা ছবিতে হিরো সেজে, তোর মাইনে হল ষাট টাকা?

কাকার অযাচিত তিরস্কার—তখন আমার কথা শুনলে না রাঙাদা, এখন ভোগো, অমন গভর্নমেন্টের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তুমি ওকে বায়োস্কোপ করতে অনুমতি দিলে কীসের আশায় শুনি?

মায়ের অনুযোগভরা আক্ষেপ—ইচ্ছে করে ছেলেটার পরকালটা ঝরঝরে করে দিলে তুমি, তুমি কী?

নীরবে সব অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে চুপ করে বসে আছেন মৌন সন্ন্যাসী আমার বাবা। বাবার মুখের দিকে চেষ্টা করেও চাইতে পারলাম না, চোখ বুঁজে ফেললাম। অনেকক্ষণ একভাবে অন্ধকারের দিকে চেয়েছিলাম বলে, নয়তো মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে চোখ দুটো ভারী হয়ে গিয়েছিল, দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে গালের পাশ দিয়ে পড়ে গেল। সমস্ত দেহের ভার ঐ পোস্টটার উপর দিয়ে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকার মাঠের ভিতর দিয়ে গোপা যেন এসে সামনে দাঁড়াল। কিছু বলবার আগেই গোপা বলল—সেদিন একটা দরকারি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই বলতে এসেছি।

সাহস হল না জিজ্ঞাসা করি কী কথা।

গোপা বলল—আমাদের ড্রাইভার বটুক দাস কী করে জেনেছে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, আমাকে খুব ধরেছে আপনাকে বলে সিনেমায় ঢুকিয়ে দেবার

জন্যে। সত্তর টাকা মাইনে পায়, তাতে নাকি কুলোয় না। ওর ধারণা বায়োস্কোপ করলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে।

এই চরম অপমানটুকুর জন্যই যেন প্রতীক্ষা করছিলাম। ম্লান হেসে চারদিকে তাকালাম, পাশ দিয়ে লুঙ্গি পরা একটি মুসলমান টলতে টলতে গজল গেয়ে চলেছে—

'প্রীত রাখো না রাখো, তুঁহারি মরজি,
বদনামি তো হো গয়ি উমর ভরকি।'

ওপারের ফুটপাথ থেকে আওয়াজ এল—'এই, ইধার আও।'

গান থেমে গেল। লুঙ্গি পরা লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখল, তারপর হাত দুটো উপরে তুলে বুড়ো আঙুল দুটো প্রশ্নকর্তার উদ্দেশে নাড়তে নাড়তে বলল—কুছ নেহি জমাদারসাব। কথাটা শেষ করে আর দাঁড়াল না লোকটা। সহজ মানুষের মতো দ্রুত পা চালিয়ে সামনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। দু'-এক পা এগিয়ে সামনের রাস্তার দিকে এসে দাঁড়ালাম। ওপারে ফুটপাথের একটা অন্ধকার লাইটপোস্টের নিচ থেকে একটি লালপাগড়ি দু'হাতে খৈনি ডলতে ডলতে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। লালপাগড়ি কাছে এলে দেখলাম বয়স চল্লিশের উপর। মোটা গোঁফ দুটো হাত দিয়ে নাকের দু'পাশে উঠিয়ে দেওয়া। কাছে এসে আমায় আপাদমস্তক সন্দেহভরা দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'যাওগে কিধার?'

বললাম, 'ভবানীপুর।'

প্রশ্ন, 'আপকে সাথ অওর কোই হ্যায়?'

বললাম, 'না।'

বিশ্বাস করল না লালপাগড়ি। সামনের অন্ধকার ভেদ করে ঝুঁকে আশেপাশে বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে আবার প্রশ্ন, 'যাওগে ক্যায়সে?'

বললাম, 'ট্রামে।'

বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় করে আমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে কোনও বিশেষ গন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করল লালপাগড়ি। কিছু না পেয়ে বেশ খানিকটা নিরাশ হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আরও রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল—'রাত এক বাজ গিয়া, টেরাম-উরাম সব বনধ হো গিয়া, খেয়াল নেহি?'

চেষ্টা করেও জবাব দেবার কোনও কথাই যখন খুঁজে পাচ্ছি না, ত্রাণকর্তারূপে দেখা দিল একখানা বাতি-নেভানো খালি গরুর গাড়ি। গাড়োয়ান একটা ময়লা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, গলায় ঘন্টা-বাঁধা ঘরমুখো গরু দুটো সারাদিনের গাধার খাটুনির পর টুংটাং শব্দ করে রাস্তার মাঝখান দিয়ে বেশ জোরেই হেঁটে চলেছে। গাড়ির নীচে দড়ি বাঁধা ছোট্ট চৌকো লণ্ঠনের বাতিটা দুলুনির চোটে অথবা হাওয়া লেগে নিভে গেছে। নিশ্চিত শিকারের সম্ভাবনায় লালপাগড়ি হুঙ্কার

ছাড়ল, 'এই ভঁইসা, গাড়ি রোখখো!'

রোখা দূরে থাক, গরু দুটো আচম্বিতে হেঁড়ে গলার আওয়াজ পেয়ে আরও জোরে পা চালিয়ে দিল দক্ষিণমুখো। ছুটে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনেক কসরত করে গাড়ি থামালো লালপাগড়ি। ভাবলাম এই সুযোগ। আর এখানে থাকা কোনো দিক দিয়ে নিরাপদ হবে না। গাছের ছায়ায় ঢাকা আলো-অন্ধকার ফুটপাথ ধরে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বাড়ি পৌঁছলাম যখন, পাশের একটা বাড়ির দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজছে। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলাম, এত রাতে কড়া নেড়ে সবাইকে জাগাবো? দরজা একটু ঠেলতেই খুলে গেল। দেখলাম বাবা উঠোনে পায়চারি করছেন। শুধু একটু থমকে দাঁড়ালাম। কোনো প্রশ্ন করলেন না বাবা। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে কোনো রকমে জুতো খুলে কাপড়জামা না ছেড়েই অন্ধকারে বিছানাটার উপর শুয়ে পড়লাম।

জেগেই ছিলাম, সময়ের হিসাব ছিল না। খানিকক্ষণ বাদে বাবা অন্ধকারে আস্তে আস্তে এসে আমার বিছানার পাশে বসলেন, তারপর একখানা হাত আমার মাথায়-পিঠে বুলোতে বুলোতে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ধীউ বাবা! সুখ-দুঃখ এ দুটো যদি ভগবানের দান বলে স্বীকার করো, তাহলে সুখের বেলায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে যাও, আর দুঃখ দেখে ভীরুর মতো কেঁদে-কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাও কেন? ওতে দুঃখ আর অশান্তিটাই বাড়ে, আর কোনো লাভ হয় না।'

নিঃশব্দে কাঁদছিলাম, মাথার বালিশের খানিকটা জায়গা ভিজে গিয়েছিল। একটু চুপ থেকে বাবা বললেন, 'তোমার আসতে দেরি দেখেই আমি খানিকটা অনুমান করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে হয়েছে কী? সমস্ত ব্যাপারটা আমায় খুলে বলতো।'

ধরা গলায় বললাম, 'মোটে ষাট টাকা মাইনে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি বাবা।'

বোধহয় বাবাও কল্পনা করতে পারেননি, অন্ধকারে বাবার চাপা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজও যেন শুনতে পেলাম। একটু পরে বললেন, ' তা, এর জন্যে তুমি এত কাতর হয়ে পড়েছ কেন? অবিশ্যি তোমার একটা ভাল মাইনে, মানে দু'শ-আড়াইশ টাকা হলে আমি একটু বিশ্রাম পেতাম। ভোরে উঠে এক কাপ চা খেয়ে ছুটতে হয় টিউশনি করতে, বেলা দশটার মধ্যে দুটো টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরে নাকে-মুখে কোনো রকমে দুটো ভাত গুঁজে দৌড়ই স্কুলে, চারটের পর বাড়ি এসে এক কাপ চা খেয়ে আবার ছুটি টিউশনি করতে। ফিরতে এক-একদিন রাত দশটা বেজে যায়। তাই ভাবছিলাম এই গাধার খাটুনি থেকে এবার হয়তো খানিকটা রেহাই পাব। কিন্তু মানুষ যা ভাবে সব সময় তা যে হয় না, এটা জেনেও কুহকিনী আশার ছলনায় পড়ে যে ভুলটা করেছিলাম, এ তারই শাস্তি।'

একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন, 'একটা কথা তুমি কোনো দিনই

ভুলে যেও না ধীউ বাবা, সংসারে দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর থেকে যারা বড় হয়, তারাই সত্যিকারের মানুষ হয়। জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে শুধু তারাই। নইলে রুপোর চামচে মুখে করে জন্মে যে সব আলালের ঘরের দুলালরা ঐশ্বর্যের গদ্দির উপর বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কতটুকু মূল্য তাদের জীবনের? যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যে সৈনিক বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে, জয়ের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে শুধু সে-ই। নইলে দাঁড়ানো মাত্রই যদি অপরপক্ষ নতি স্বীকার করে অথবা শান্তির প্রস্তাব করে বসে, সে যুদ্ধ জয়ের কোনো গৌরব বা আনন্দ নেই। আজ আমি তোমায় এই আশীর্বাদ করছি, জীবনযুদ্ধে দুঃখ-দারিদ্র্যের কাছে নতি স্বীকার না করে তুমি বড় হও, সত্যিকারের মানুষ হও। তখন পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাবে পায়ে মাড়িয়ে আসা কাঁটাগুলো ফুল হয়ে হাসছে।'

বাবার কথায় মনে অনেকখানি শান্তি পেলাম, বিছানায় উঠে বসে শান্ত কণ্ঠে বললাম—'স্টুডিওর সবাই জেনে যাবে আমার মাইনের কথাটা। ওদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করে—'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না বাবা। বললেন, ' তাও আমি ভেবে দেখেছি ধীউ বাবা। তুমি হাসিমুখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ মাথা পেতে নিয়ে হেসেই জবাব দিও, কী জানিস, টাকা রোজগারটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করে এ লাইনে আসিনি, এসেছি শিল্পের সাধনা করে বড় শিল্পী হতে। নইলে ছ'বছরের পুলিসের চাকরি ছেড়ে এ পথে আসতাম না। আর তা ছাড়া আমার রোজগারে সংসার চলে না, চলে বাবার রোজগারে। বাবা এখনো বেঁচে। দেখো আর কোনো দিন তারা তোমার মাইনের কথা তুলে ঠাট্টা করবে না। রাত শেষ হতে চলল। এবার তুমি শুয়ে পড়।'

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন বাবা, 'আর 'কালপরিণয়ে'র পারিশ্রমিক দেড় বছরে দেড়শ টাকার চেয়ে এটা অনেক ভাল— নয় কি?'

ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাবা চলে গেলেন। বন্ধ ঘরে জমাট অন্ধকারে বাবার কথাগুলো বেরোবার পথ না পেয়ে দৈববাণীর মতো আমার চারপাশে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল। যুক্তকরে বাবার উদ্দেশে প্রণাম করে শুয়ে পড়লাম।

কেউ না ডাকতেই ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখি দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলোর আভাস এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। বাড়ির ভিতর সব চুপচাপ, কারও সাড়াশব্দ নেই। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতেই দমকা হাওয়ার মতো এক ঝলক কড়া রোদ আমার সর্বাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুঝলাম বেলা অন্তত দশটা। আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর ঢুকলাম। দেখি উঠোনে একটা বেশ বড় রুই মাছ কুটছেন মা। আর সামনে রকের উপর বই খুলে পড়বার অছিলায় পা ঝুলিয়ে বসে আড়চোখে তাই দেখছে আমার ছোটভাই রাজকুমার আর বোনটা। আমার

সাড়া পেয়েই একনজর দেখে নিয়ে মা বললেন,'যা চট করে স্নান করে নে। কাল রাতে তো কিছু খাসনি। আমি এখুনি মাছের ঝোলটা চড়িয়ে দিচ্ছি।'

অবাক হবার কিছু নেই, আজ সব কিছুতেই বাবার প্রচ্ছন্ন প্রভাব স্পষ্টই অনুভব করলাম। প্রাত্যহিক বাজার করার ভার ছিল আমার উপর, আজ বাবাই সেটা করে এনেছেন। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তাড়াতাড়ি স্নান করতে চলে গেলাম।

দুপরে খেয়েদেয়ে কষে এক ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙল বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজে। উঠে দোর খুলে দেখি মনমোহন। বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, 'তুই?'

গম্ভীর ভাবে মনমোহন বলল, 'কথা আছে, একটু বাইরে আয় না।'

বললাম—'দাঁড়া, জামাটা পরে আসি।'

ঘরে এসে আলনার উপর থেকে একটা ছিটের শার্ট গায়ে দিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই হরিশ পার্ক। দুজনে নিঃশব্দে পথটুকু হেঁটে ছোট পার্কের মধ্যে একটা খালি বেঞ্চের উপর বসলাম। দুজনেই চুপচাপ। হাসি আসছিল মনমোহনের অবস্থা দেখে। স্বভাবসিদ্ধ হাসি অতি কষ্টে দমিয়ে রেখে আমায় সমবেদনা জানাতে এসেছে, বেচারা!

বললাম, 'কীরে, কী কথা বলবি বল?'

মনমোহন বলল, 'আমি অবাক হয়ে গেছি ভাই। গাঙ্গুলীমশাই যে এরকম একটা ব্যাপার করতে পারেন কল্পনাও করতে পারিনি। মেসোমশাই বললেন, এ আমার জানাই ছিল, যেদিন সাহেবের পারমিশন নিয়ে ওকে হেমচন্দ্রের পার্ট দিয়েছি, সেইদিন থেকেই উনি চটেছেন।'

হেসে বললাম, 'চটাচটির কথা নয় মনু, আমি অদৃষ্টবাদী, ভাগ্য ছাড়া পথ নেই।'

চুপ করে কী যেন ভাবল মনমোহন, তারপর বলল, 'মেসোমশাই বলছিলেন—'

বললাম, 'কী?'

'তিন চারদিন বাদেই ফ্রামজী আমেরিকা যাচ্ছে। ও চলে গেলেই তোমাকে নিয়ে রুস্তমজী সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। ওঁর খুব বিশ্বাস রুস্তমজী কখনোই এতবড় একটা অন্যায় হতে দেবেন না।'

বললাম, 'কিন্তু তোমার মেসোমশাই ভুলে যাচ্ছেন যে, গাঙ্গুলীমশাই ওদের ডান হাত। তিনি যে ব্যবস্থা একবার করে দিয়েছেন তার রদবদল ফ্রামজী কিছুতেই করবেন না। কিংবা ধরে নিলাম কিছু করলেন, তখন গাঙ্গুলীমশাই-এর মানটা কোথায় থাকবে সেটা ভেবে দেখেছ কি?'

অকাট্য যুক্তি। চুপ করে রইল মনমোহন। বেশ খানিকক্ষণ বাদে হতাশ হয়ে বলল, 'নাঃ, তাহলে আর কোন উপায় নেই। ও মাইনেতে তুমি কেন, কোনও

ভাল আর্টিস্টই কাজ করবে না। অথচ তিন-চারদিনের মধ্যেই মেসোমশাই শুটিং শুরু করতে চান। এই অল্প সময়ের মধ্যে নতুন হিরো কাকেই বা নেবেন—।'

হেসে একখানা হাত দিয়ে ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'জ্যোতিষবাবুকে বোলো নতুন হিরো খুঁজতে হবে না, আর রুস্তমজী সাহেবের কাছে মাইনে বাড়ানোর সুপারিশও করতে হবে না। 'গিরিবালা' ও 'কালপরিণয়ের' বিখ্যাত নায়ক আমিই 'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করব।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাইল মনমোহন।

বললাম, ' সত্যি, ঠাট্টার কথা নয়। শুটিং-এর দিন গাড়িটা পাঠাতে বোলো—হাজার হোক অতবড় কোম্পানির হিরো, মাইনে যাই হোক, ট্রামে-বাসে তো আর যেতে পারিনা!'

অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মনমোহন।

ম্যাডান স্টুডিওর দক্ষিণ-কোণ ঘেঁষে গড়িয়াহাট রোডের উপর বহুদিনের জীর্ণ পুরোনো একখানি চালাঘর। বেশ খানিকটা দূর থেকে উগ্র গন্ধে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে ওটা তাড়ির আড্ডা। সকাল থেকে শুরু করে রাত্রি আটটা-নটা পর্যন্ত হৈ-হল্লা, মারামারি আর অবিরাম গান চলে দোকানটিতে। পচা তাড়ির দুর্গন্ধে এক-এক সময় স্টুডিওতে কাজ করাও কষ্টকর হয়ে পড়ত। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যেতাম এই ভেবে যে, দোকানটি ম্যাডান স্টুডিওর সীমানার মধ্যে হলেও কেউ প্রতিবাদ করে না বা ওদের তুলে দেবার জন্যে চেষ্টাও করে না।

সেদিন 'মৃণালিনী' ছবির শুটিং-এ মেক-আপ রুমে সবে এসে বসেছি, কানে এল তাড়ির আড্ডার বেসুরো গোলমাল। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার মনে করে মেক-আপ করেই চলেছি, হঠাৎ দেখি স্টুডিওর সব কর্মী, এমনকি মেক-আপ ম্যান পর্যন্ত ছুটেছে গেটের দিকে। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি! অসমাপ্ত মেক-আপ নিয়ে মেক-আপ রুমের দরজায় দাঁড়ালাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম দোকানটা, সামনে রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক। একটু বাদেই দেখি পুবদিক থেকে চার-পাঁচটা খাকি পোশাক পরা পুলিশ ছুটে চলেছে দোকানমুখো। কৌতূহলে ছটফট করতে লাগলাম। মুখে খানিকটা রং মাখা, নইলে নিজেই চলে যেতাম। গেটের দিক থেকে পরিচালক জ্যোতিষবাবুকে এদিকে আসতে দেখা গেল। একরকম ছুটে গিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম,'ব্যাপার কী?'

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'ব্যাপার আবার কী! নতুন কিছুই নয়। দুজনে তাড়ি খেতে খেতে ঝগড়া হয়। একজন আরেকজনের মাথায় তাড়ির কলসি ভেঙেছে। মাথা ফেটে চৌচির।'

বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বললাম,'সাহেবরা ইচ্ছে করলেই তো ঝেঁটিয়ে দূর

করে দিতে পারেন। কী জন্যে এই সব নোংরা উৎপাত সহ্য করতে ওদের পুষে রেখেছে বলতে পারেন?'

—'পারি, কিন্তু বলব না।' অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন জ্যোতিষবাবু।

—'আপনাদের এসব হেঁয়ালির কথা বুঝি না মশাই, পুলিশও কিছু করতে পারে না?'

—'না।'

গেটের কাছে একটা শোরগোল শুনে দুজনে ফিরে চাইলাম। চার-পাঁচটা লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলেছে থানামুখো, পিছনে হুজুগপ্রিয় জনতা মজা দেখতে চলেছে সঙ্গে।

জ্যোতিষবাবু বললেন,'ঐ তো নিয়ে চলেছে, কাল সকালে এসে দেখো জমজমাট আড্ডা, যেন কিছুই হয়নি।'

বললাম, 'দোহাই আপনার মিঃ ব্যানার্জি, দয়া করে আসল কথাটা বলবেন কি?'

—'আসল কথা?'

চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিলেন জ্যোতিষবাবু, তারপর আমায় আরও খানিকটা দূরে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বললেন, 'তাড়ির দোকান নিয়ে বেশি কৌতূহল দেখিও না। শুধু এইটুকু জেনে রেখো ওদের পেছনে মুরুব্বি হলো আমাদের সাহেবরা। নিজের চোখে দেখলে ওদের ধরে নিয়ে গেল থানায়। সন্ধ্যের মধ্যেই সাহেবদের যে-কেউ এসে জামিন হয়ে ওদের ছাড়িয়ে নেবে। তারপর কোর্টে কেস উঠলে যা ফাইন হবে তাও দিয়ে দেবে।'

হাঁ করে শুধু চেয়েই আছি। জ্যোতিষবাবু হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, 'এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না? সাহেবরা ছেলেবুড়ো সবাই তাড়ি খায়। তাড়িটা ওদের ডালভাতের মতো নিত্য-প্রয়োজনীয় পানীয়। ভোরবেলায় টাটকা তাড়ির জোগান দেয় ঐ দোকান। এবার বুঝলে আসল কথাটা? এখন যাও, আর দেরি কোরো না, বেলা সাড়ে আটটা বাজে। মেক-আপটা সেরে ফেল। আজ যেতে হবে বজবজের দিকে।'

মেক-আপ শেষ করে হেমচন্দ্রোচিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে বেরোতেই নটা বেজে গেল। ছোট প্রাইভেট গাড়িটায় আমি, জ্যোতিষবাবু আর ক্যামেরাম্যান চার্লস ক্রীড, পিছনে একটা বড় ভ্যানে ক্যামেরা ও তার সাজসরঞ্জাম, গোটা দশ-বারো রিফ্লেক্টার, পাঁচ-ছ'টা বেতের মোড়া, একটা বড় শতরঞ্জি, ডাব সোডা লেমনেড আর সব সহকর্মীরা।

দিন পনেরো হল 'মৃণালিনী'র শুটিং আরম্ভ হয়েছে। রোজ শুটিং থাকে না, হপ্তায় দু'তিন দিন শুটিং পড়ে। প্রথম দিন এসেই ক্যামেরায় যতীন দাসকে না দেখে তার বদলে সাত ফুট লম্বা চওড়া বিরাটকায় আইরিশম্যান চার্লস ক্রীডকে দেখে অবাক

হয়ে জ্যোতিষবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যতীনকে নিলেন না কেন?'

জ্যোতিষবাবু বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন, 'কেন নেব? গাঙ্গুলীমশাই 'দেবীচৌধুরাণী' ছবিতে নিয়েছেন যতীনকে?'

কিছু বুঝলাম না, চুপ করে রইলাম।

জ্যোতিষবাবু বললেন,'ইটালীর জাহাজ কলকাতার জেটিতে ভিড়তে না ভিড়তেই কোত্থেকে খবর পেয়ে ইটালীর নামকরা ক্যামেরাম্যান টি. মারকনিকে একেবারে ছোঁ মেরে গাঙ্গুলীমশাই নিয়ে তুললেন ৫নং ধর্মতলা স্ট্রীটে। সেদিন আবার ফ্রামজী আমেরিকা চলে যাচ্ছেন। দু'মিনিটের মধ্যে দেখি মারকনির কাঁধে হাত দিয়ে বিজয়গর্বে ফ্রামজীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন গাঙ্গুলীমশাই। শুনলাম মারকনি শুধু গাঙ্গুলীমশাইয়ের ছবি তুলবে। যাকে বলে এক্সক্লুসিভ। মাসে ছশ টাকা মাইনে। তুমিই বলো ধীরাজ, আমি তাহলে কেন পঞ্চাশ টাকার ক্যামেরাম্যান যতীন দাসকে দিয়ে 'মৃণালিনী' তুলব? খুঁজতে লেগে গেলাম, তারপর ক্রীড সাহেবকে রাজী করিয়ে ধরে নিয়ে গেলাম রুস্তমজীর কাছে। চারশ টাকায় সব ঠিক করে পরদিন থেকে শুরু করলাম শুটিং।'

কথা শেষ করে বিজয়ী সেনাপতির মতো সোজা হয়ে সিগারেট ধরালেন জ্যোতিষবাবু। বেচারী যতীনের জন্যে একটি সমবেদনার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই করবার রইল না।

চার্লস ক্রীড একজন নামকরা মেকানিক। ক্যামেরা, প্রোজেক্টিং মেসিন এইসব সারাতে ক্রীড সাহেবের জোড়া তখন কলকাতায় ছিল না। সদালাপী নিরহংকার মানুষ, অল্প সময়ের মধ্যেই চট করে হৃদ্যতা হয়ে যায়।

জ্যোতিষবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত জায়গা থাকতে বজবজে এমন কী লোকেশান পেলেন?'

ফলাও করে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত-মুখ নেড়ে কথা বলা জ্যোতিষবাবুর একটা সহজাত অভ্যাস। বললেন, 'চারদিকে ধূ-ধূ করছে তেপান্তর মাঠ। দূরে, বহু দূরে দেখা যায় একটা বড় পুকুর, কাছে গেলে দেখা যাবে শান-বাঁধানো ঘাট। ঘাটের দু'পাশে দুটি বিশাল বটগাছ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে পথশ্রান্ত হেমচন্দ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে।'

আতঙ্কিত হয়ে বললাম, 'এই কাঠফাটা রোদ্দুরে ঐ ধূ-ধূ করা তেপান্তর মাঠ ভেঙে হাঁটতে হবে আমাকে!'

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'ইয়েস।'

বললাম, 'হেমচন্দ্র তো রাজা, লোকজন হাতি ঘোড়া এমন কি একটা ছাতা পর্যন্ত না নিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন কেন, বুঝলাম না।'

—'বুঝিয়ে দিচ্ছি।' বলে মহা উৎসাহে বলতে শুরু করলেন জ্যোতিষবাবু, 'কোনো

গুরুতর রাজনৈতিক কারণে সকলের অগোচরে ছদ্মবেশে, মানে রাজকীয় পরিচ্ছদ একটা চাদরে ঢেকে হাতি ঘোড়া লোকজন কিছু না নিয়ে সাধারণ নাগরিকের মতো একাকী হেঁটে চলেছেন হেমচন্দ্র গুরুদেব মাধবাচার্যের সন্ধানে। সাধারণ রাজপথ। নগর-গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেলে হয়তো কেউ চিনে ফেলতে পারে তাই সাধারণের অগম্য মাঠঘাট ভেঙে চলেছেন তিনি। ঐ বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বটগাছতলায় একটু বিশ্রাম করে, শান বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে ঘাটে নেমে অঞ্জলি করে জলপান করে তৃষ্ণা অপনোদন করবে তুমি। তারপর—'

বাধা দিয়ে বললাম—' অজানা পুকুরের ঐসব নোংরা জল আমি কিন্তু খেতে পারবো না বাঁড়ুয্যেমশাই।'

একটু ভেবে নিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই, খাওয়ার ভঙ্গী কোরো— তাহলেই আমি ক্যামেরায় ম্যানেজ করে নেব।'

—'পুকুরের জল খেয়ে তারপর কী করব?'

—'বাঁ পাশের রাস্তা ধরে সটান ঢুকবে গিয়ে জঙ্গলে, কিন্তু পুকুরের পাড় ঘেঁষে এমনভাবে হাঁটবে যাতে তোমার ছায়া পড়ে পুকুরের জলে।'

একে কাঠফাটা রোদ্দুর তার উপর শুটিং-এর যা ফর্দ শুনলাম তাতে খুশি হবার কথা নয়। চুপ করে বসে হতভাগ্য হেমচন্দ্রের কথা ভাবছিলাম, কানে এল—'পুওর ধীরাজ!'

চেয়ে দেখি আমার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছেন ক্রীড সাহেব। বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, ' আপনি বাংলা বুঝতে পারেন?'

তেমনি হাসতে হাসতেই ক্রীড সাহেব বললেন, ' ইয়েস, কিনটু বালো বুলটে পারে না।'

হাসি গল্পে বাকি সময়টা কেটে গেল। আমরা লোকেশানে পৌছে গেলাম। বহুদিন আগে বোধহয় কারও বাগানবাড়ি ছিল। এখন বাড়ির চিহ্নও নেই। ধূ ধূ করছে মাঠ, সেই মাঠ ভেঙে সামনে পড়ে শান-বাঁধানো পুকুরটা।

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'কাল ছ-সাতজন লোক পাঠিয়ে পুকুরটার শ্যাওলা তুলিয়ে ঘাট পরিষ্কার করে রেখে গেছি।' এ লোকেশানের একমাত্র সম্পদ হলো ঘাটের দু'পাশে দুটি বটগাছ। তারই ছায়ায় শতরঞ্জি মোড়া বিছিয়ে সবাই বসলাম।

মামুলি শুটিং। শুধু হাঁটা, কোনও বৈচিত্র্য নেই। রোদ্দুরের তাপ বেড়ে উঠলে মাঝে মাঝে বটগাছতলায় এসে বসি। ডাব, সোডা, লেমনেড খাই। আবার হাঁটি। এইভাবে বেলা চারটে পর্যন্ত শুটিং চলল। সব গোছগাছ করে স্টুডিওতে গিয়ে মেক-আপ তুলে পোশাকআশাক ছেড়ে বাড়ি আসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল।

শোবার ঘরে তক্তপোশের পাশে ছোট গোল টেবিলটার উপর একখানা খামের চিঠি, অপরিচিত মেয়েলি হাতের লেখা। আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ভয়ে ভয়ে চিঠি খুললাম। খিদিরপুর থেকে রিনি লিখেছে—

শ্রীচরণকমলেষু,

ছোড়দা, আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হইতে চলিল, তুমি আমাদের বাড়ি আসো না। ব্যাপার কী? গোপাদির কলেজ বন্ধ, প্রায় রোজই আমাকে পড়াইতে আসেন। তিনিও তোমার কথা বলেন। আমরা কী এমন অপরাধ করিয়াছি যাহার জন্য তুমি কোনো খবর পর্যন্ত দাও না? লক্ষ্মী ছোড়দা, এ রবিবারে আসা চাই-ই কিন্তু। আমরা তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিব। ইতি—তোমার স্নেহের,

পার্ল হোয়াইট

ছোট্ট চিঠি। বক্তব্যও অস্পষ্ট নয়, তবুও একবার দু'বার তিনবার পড়লাম চিঠিখানা। খিদিরপুর যাবার আকুল আহ্বান যে একা শুধু রিনির নয়, এটা বুঝতেও কষ্ট হয় না। সংকল্প সেদিনই রাত্রে চৌরঙ্গি রোডে দাঁড়িয়ে ঠিক করে ফেলেছিলাম। কুহকিনী আশা তবুও মনটাকে দোলা দিতে লাগল। ভাবলাম যাই না রবিবার, গোপাকে সব কথা খুলে বলে আমার তাসের অট্টালিকা চিরদিনের মতো ভূমিসাৎ করে দিয়ে আসি। পরক্ষণেই মনে হল সে দৃঢ় মনোবল আমার নেই, আর তা ছাড়া তাতে লাভই বা কী! তার চেয়ে বরং রিনিকে লিখে দিই —পার্ল হোয়াইট, তোমার চিঠি পেলাম। ইচ্ছে থাকলেও অদৃষ্টের নিষ্ঠুর বিধানে যাদের হাত-পা বাঁধা, সেই সব অসহায় হতভাগ্য জীবগুলোর মধ্যে তোমার ছোড়দা অন্যতম। না, ঠিক হচ্ছে না। এই লিখি— তোমার গোপাদিকে বোলো, কুঁড়েঘরে শুয়ে অট্টালিকায় বাস করার স্বপ্ন দেখা ভাল, তাতে কারও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু বিপদ হয় তখনই, যখন কুঁড়েঘরের বাসিন্দা স্বপ্নকে সত্য মনে করে অট্টালিকার পানে হাত বাড়ায়—।

হঠাৎ মনে হল খুব কবিত্ব করে চিঠি তো লিখছি কিন্তু চিঠিটা দেব কাকে? রিনিকে? রিনিকে দেওয়া মানে কাকা-কাকিমার হাতে সে চিঠি পড়বেই। তখন? চিঠি দিয়ে ক্ষণিক সান্ত্বনা হয়তো পাব, কিন্তু আমাকে উপলক্ষ করে দুটো সংসার-অনভিজ্ঞা সরল মেয়ের জীবনে যে অশান্তি ও বিপ্লবের আগুন জ্বলবে তা নিভতে অনেক সময় লাগবে। মন ঠিক করে ফেললাম—রিনির চিঠির জবাবও দেবো না, খিদিরপুরেও আর যাবো না। টুকরোটুকরো করে রিনির চিঠিটা জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলাম। চেয়ে দেখি, শুটিং থেকে এসে জামাকাপড় ছাড়িনি। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ মনে নেই—জেগেই ছিলাম। চমক ভাঙল মায়ের কথায়। বিছানার কাছে মা দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তোর আজ হল কী? শুটিং থেকে এসে মুখ হাত ধুলি না, খাবার খেলি না। এদিকে রাত ন'টা বাজে। এখন দয়া করে খেয়ে নিয়ে আমায় রেহাই দাও। সারাদিনের পর একটু জিরিয়ে বাঁচি।'

সত্যিই লজ্জা পেলাম। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে খেতে চলে গেলাম। খেয়ে-দেয়ে বাইরের অন্ধকার রকটায় চুপ করে বসে রইলাম। একটু বাদে ঢং ঢং করে দশটা

বাজল। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাবা এখনও টিউশনি থেকে ফেরেননি। মা-ও না খেয়ে বাবার জন্যে বসে আছেন। সাধারণত ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে ফেরেন, আজ এত দেরি হবার কারণ কী? বাইরের দরজায় কে কড়া নাড়ল, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি বাবা। বাবার সাড়া পেয়ে মা-ও সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বাবা মাকে বললেন,' তোমরা খেয়ে নাও, আমি কিছু খাব না। জ্বরটা একটু বেশি বলেই মনে হচ্ছে।'

গায়ে হাত দিয়ে দেখি বেশ গরম। বাবার সঙ্গে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলাম। জুতো জামা খুলে দিতেই বাবা শুয়ে পড়লেন। কাছে বসে কপালটায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্বরটা কবে থেকে হচ্ছে?'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাবটা মা-ই দিলেন, 'আজ চার-পাঁচ দিন রোজ বিকেলে স্কুল থেকে এসেই শুয়ে পড়েন। গায়ে হাত দিয়ে দেখি গরম। বিশ্রাম নিতে বললে বলেন—ও কিছু নয়, শীতকালে বিকেলবেলায় ওরকম হয়।'

বললাম, 'আমায় এসব জানাওনি কেন?'

মা বললেন, 'উনি বলতে দেননি। বলেন, মিছিমিছি ওকে ব্যস্ত কোরো না।'

লজ্জায় ধিক্কারে মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। স্বার্থপরের মতো নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-অভিমান নিয়েই মত্ত হয়ে ছিলাম, আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজনই মনে হয়নি।

বাবাকে বললাম, 'কাল থেকে আপনাকে কমপ্লিট রেস্ট নিতে হবে বাবা, আমি সকালেই ডাঃ এন. এন. দাসকে ডেকে আনব।'

ডাঃ এন. এন. দাস বাবার বিশেষ বন্ধু এবং তখনকার দিনে ভবানীপুর অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। পূর্ণ থিয়েটারের বিপরীতে পপুলার ফার্মেসী ওঁরই প্রতিষ্ঠিত।

ম্লান হেসে বাবা বললেন, 'দাসকে একবার ডাকতে পারো, তবে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সামনে ছেলেদের বাৎসরিক পরীক্ষা, খুব ক্ষতি হবে। তাছাড়া সামান্য জ্বরে তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

বললাম, 'সামান্য হোক আর যাই হোক, কাল থেকে ভাল ভাবে না সেরে ওঠা পর্যন্ত আপনি স্কুল বা টিউশনিতে যেতে পারবেন না।' মা-ও আমার সঙ্গে যোগ দিলেন দেখে বাবা দু' একবার ক্ষীণ আপত্তি তুলে চুপ করে গেলেন।

মিত্র ইনস্টিটিউশনের দীর্ঘ কুড়ি বছর চাকরির মধ্যে বাবা খুব কমই ছুটি নিয়েছিলেন। পরদিন পনেরো দিনের একটা ছুটির দরখাস্ত হেডমাস্টারমশাইকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করে এলাম। ঠিক হলো দুজন উঁচু ক্লাসের ছাত্র বাড়িতে এসে পড়ে যাবে, বাকি দুজন যারা নীচু ক্লাসে পড়ে তাদের সন্ধ্যার পর আমি গিয়ে পড়িয়ে আসব।

সব শুনে মা বললেন, 'সবই তো হলো, কিন্তু রাত জেগে পড়াশুনোটা বন্ধ

করতে পার?’

বাবার এই রাত জেগে পড়াশুনোর পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। বাবা আমার ঠাকুর্দার একমাত্র ছেলে। শৈশবে মাতৃহীন, কাজেই ছোটবেলা থেকেই ভীষণ একগুঁয়ে ও খেয়ালি ছিলেন। তখন স্কুলে পড়েন, এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাত্র এক বছর বাকি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রবল ভাবে শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশে। বাবাও মেতে উঠলেন। স্কুল ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর্দাকে বললেন, ম্লেচ্ছভাষা পড়ব না, দেবভাষা পড়ব। যে কথা সেই কাজ। কৃষ্ণনগরে গিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্কৃত টোলে ভর্তি হয়ে পড়লেন। কুমার ক্ষৌণিশচন্দ্র তখন খুব ছোট। পরে বাবা তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এর পরের বিচিত্র ইতিহাস বর্তমান কাহিনীতে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক—তাই বর্তমানেই ফিরে যাচ্ছি।

মিত্র ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার সতীশচন্দ্র বোস বাবাকে খুব ভালোবাসতেন। দুজনের বন্ধুত্বও ছিল প্রগাঢ়। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি একদিন স্কুলের ছুটির পর বাবাকে নিভৃতে ডেকে বললেন, ভারি বিপদে পড়েছি ললিতবাবু, স্কুল ইন্সপেক্টর সার্কুলার পাঠিয়েছেন হাইস্কুলে ননম্যাট্রিক মাস্টার রাখা চলবে না। আপনাকে ছাড়তেও প্রাণ চায় না অথচ আইন মানতে গেলে রাখতেও পারছি না। কী করি বলুন তো? একটু চুপ করে থেকে বাবা বললেন, সার্কুলার ঠিক কবে থেকে কার্যকরী হবে? সতীশবাবু বললেন, বছরখানেক তো বটেই, আরও ছ'মাস চেষ্টা করলে বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। বাবা বললেন, ঠিক আছে আপনি ভাববেন না। এর পরই রাত জেগে পড়তে শুরু করলেন বাবা। দিনে একদম সময় পেতেন না, রাতে জেগে পড়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ১৯২২ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিঙে ছেলের বয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে পরীক্ষা দিলেন। ওর মধ্যে বাবার কয়েকটি ছাত্র ছিল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বার হলে দেখা গেল, বাবা ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছেন। তখনকার দিনের কয়েকটি নামকরা দৈনিকে এ সম্বন্ধে সরস মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটখানি হেডমাস্টার সতীশবাবুর হাতে দিয়ে বাবা বললেন, ‘নেশা যখন একবার লাগিয়ে দিয়েছেন তখন এতেই মামলা শেষ হলো না— প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে বি.এ. পর্যন্ত পাস করে তবে থামব। অদ্ভুত অধ্যবসায় ও মেধা ছিল বাবার। আমরা বয়সের কথা উল্লেখ করলে বলতেন—পড়াশুনার কি বয়স আছে রে। যে সময়ের কথা বলছি, বাবা তখন প্রাইভেটে আই.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমনিতেই বাবা খুব রোগা ছিলেন। আজ লক্ষ্য করে দেখলাম যেন আরও রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মাথার বালিশ ও তোশকের নীচে লুকিয়ে রাখা আই.এ. কোর্সের বইগুলো জড়ো করে নীচে নেমে এলাম।

রাজ্যহারা মগধ রাজকুমার হেমচন্দ্র। লোকালয় ছেড়ে মানুষের অগম্য বন জঙ্গল ভেঙে হেঁটেই চলেছেন। অবশেষে দেখা গেল দূরে গুরুদেব মাধবাচার্যের ক্ষুদ্র পর্ণকুটির। কুটিরের নিকটবর্তী হয়ে হেমচন্দ্র দেখলেন বাইরে কুটির সংলগ্ন উঠোনে মৃগচর্মাসনে বসে আচার্য চক্ষু মুদ্রিত করে জপে নিযুক্ত আছেন। যুক্তকরে হাঁটু গেড়ে বসে গরুড়পক্ষীর মতো হেমচন্দ্র গুরুদেবের ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

জ্যোতিষবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন,'কাট!'

ক্রীড সাহেব ক্যামেরার হাতল ঘোরানো বন্ধ করলেন। আমি ঐ অস্বস্তিকর হাঁটু ভেঙে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁচলাম। মাধবাচার্য মৃগচর্মের নীচে লুকিয়ে রাখা একটা চৌকো টিনের কৌটো থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে পরমানন্দে টানতে লাগলেন।

শুটিং হচ্ছিল স্টুডিওর পূর্ব দিকের জঙ্গলে। বাঁশ খড় লতাপাতা দিয়ে স্টুডিওর মিস্ত্রিরা তিন-চারদিন ধরে তৈরি করেছে এই ঘরখানি। দূর থেকে দেখলে আঁকা ছবির মতো দেখায়। মাটির দেয়াল। মাটি উঁচু করে দাওয়া। সামনে খানিকটা জায়গায় ঘাসগুলো কোদাল দিয়ে চেঁছে গোবর নিকিয়ে হয়েছে উঠোন। পাশে ছোট্ট একটা মাটির বেদীর উপর তুলসী গাছ। ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটিরখানি। চারপাশে ঘন গাছ-আগাছার জঙ্গল। ঘরের মধ্যে ধ্যানে বসলে আলো পাওয়া যাবে না। অগত্যা বাধ্য হয়েই গুরুদেবকে উঠোনে মৃগচর্ম বিছিয়ে বসতে হয়েছে। মাধবাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন কার্তিকচন্দ্র দে। বিরাট দেহ, প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। সাদা দাড়ি গোঁফ, মাথায় বিরাট জটা। পরনে গেরুয়া কাপড় ও আলখাল্লা, তার উপর বাঘছাল আঁটা। দেখলে ভক্তি দেশ ছেড়ে পালায়, আসে ভয়।

জ্যোতিষবাবু ক্রীড সাহেবকে ক্যামেরা কাছে আনতে বললেন। এবার ক্লোজ শটে নেওয়া হবে ডায়লগগুলো। একটু পরেই ক্রীড সাহেব বললেন,' ইয়েস, আই অ্যাম রেডি মিঃ ব্যানার্জি।' আবার সেই আগের মতো হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসলাম। জ্যোতিষবাবু বললেন, ' স্টার্ট!' ক্রীড সাহেব ক্যামেরার হাতল ঘোরাতে শুরু করলেন।

গুরুদেবের ধ্যানভঙ্গ হল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে আমার দিকে চাইলেন। ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললাম, 'গুরুদেব! আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভৃত্যের প্রতি আর কী আদেশ করেন? যবন গৌড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব বিধিলিপি। নচেৎ বিনা বিবাদে যবনেরা গৌড় জয় করিল কী প্রকারে?'

মাধবাচার্য—'বৎস, দুঃখিত হইও না। দৈব নির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি—'

গুরুদেব আর বলতে পারলেন না। নিস্তব্ধ জঙ্গলে যেন কাঁটার মতো গলায় মাধবাচার্যের গম্ভীর গলাকে চাপা দিয়ে কে বলে উঠল, 'চুপ কর, আঃ চুপ কর!'

চমকে আমি ও কার্তিকবাবু জ্যোতিষবাবুর দিকে তাকালাম। ক্যামেরার হ্যাতল বন্ধ করে ক্রীড সাহেবও অবাক হয়ে চারদিকে চাইছেন। জ্যোতিষবাবু গর্জন করে উঠলেন, 'তোমরা অ্যাক্টিং থামিয়ে ক্যামেরার দিকে চাইলে কেন?' বললাম, 'বাঃ, আমরা ভাবলাম অভিনয় ঠিক হচ্ছে না বলে আপনিই আমাদের থামতে বললেন!'

'—আমি তো কিছুই বলিনি!' অবাক হয়ে বললেন জ্যোতিষবাবু। তবে বলল কে? সবাই পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। নিস্তব্ধ জঙ্গলে কারও মুখে কথা নেই।

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'এমন শটটা মাটি হয়ে গেল। এখন আবার রিফ্লেক্টার সাজিয়ে শট নিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। কী যে করি!' হঠাৎ ক্যামেরার পিছনে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন জ্যোতিষবাবু—'এত ভিড় কেন? শুটিং-এর লোক ছাড়া এখানে কেউ থাকবে না। আপনারা দয়া করে বাইরে যান।'

বাইরের অচেনা অনেকগুলি দর্শক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ক্যামেরার পিছনে। জ্যোতিষবাবুর কথায় নিতান্ত অনিচ্ছায় একে একে সরে পড়ল সবাই।

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। শটটা যেখানে বন্ধ হয়েছে সেইখানে কেটে মাধবাচার্যের বাকি দরকারি কথাগুলো টাইটেলে লিখে জুড়ে দেব। ভালই হল।'

ক্যামেরা আরো কাছে আনা হল। বারো-তেরোখানা রিফ্লেক্টার আশেপাশে সাজিয়ে ক্রীড সাহেব প্রস্তুত হলেন।

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'তাড়াতাড়ি এই শটগুলো সেরে নিতে হবে, নইলে এ জঙ্গলে বেশিক্ষণ রোদ্দুর পাওয়া যাবে না। তারপর সন্ধ্যের সময় আসল সিনটা নেওয়া হবে। তোমরা সংলাপগুলো ভাল করে মুখস্থ করে নাও, যেন আটকে না যায়।'

কার্তিকবাবু ও আমি রীতিমতো তালিম নিতে শুরু করে দিলাম। জ্যোতিষবাবু 'মৃণালিনী' বইটায় লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া সংলাপগুলো প্রম্পট করতে শুরু করলেন। আবার শুটিং আরম্ভ হল।

হেমচন্দ্র—'গুরুদেব, আপনি আশামাত্রের আশ্রয় লইতেছেন। আমিও তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমি কী করিব আজ্ঞা করুন।'

মাধবাচার্য—'আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এ নগর মধ্যে তোমার আর অবস্থান করা অকর্তব্য। কেননা, যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সংকল্প করিয়াছে। আমার আজ্ঞা, তুমি অদ্যই এ নগর ত্যাগ করিবে।'

হেমচন্দ্র—'কোথায় যাইব?'

—'চুলোয়!'

আবার সেই কণ্ঠস্বর। আরো তীব্র, আরো ক্রুদ্ধ।—' শালারা জ্বালায়ে মারল, দূর হ! নইলে এক্কেরে মাইর‍্যা ফালামু।'

উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে জ্যোতিষবাবুর দিকে চাইলাম। জ্যোতিষবাবুও দেখলাম বেশ হকচকিয়ে গেছেন। হাঁ করে চারদিকে চাইতে চাইতে বললেন, 'এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার! কে এইভাবে শুটিং ডিস্টার্ব করছে? বাইরের লোক যারা ছিল, সব সরিয়ে দিয়েছি। আমার ইউনিটের কারও সাহস হবে না। তবে?'

মাধবাচার্যরূপী কার্তিকবাবু হেঁড়ে গলায় বললেন, 'ভূত!'

জঙ্গলের থমথমে নীরবতা মুহূর্তের জন্যে হালকা হাসিতে কেঁপে উঠল। জ্যোতিষবাবু বললেন, 'জঙ্গলটা একবার ভাল করে দেখতো—মনে হয় ওর ভিতর লুকিয়ে থেকে কোনও দুষ্টু লোক এইসব করছে।' দু'তিন জন সেটিং-এর লোক জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে এল, কোথাও কেউ নেই। শুধু কয়েকটা শেয়াল ছুটে পালিয়ে গেল আর কতকগুলো ছোটবড় পাখি বৃক্ষান্তরে উড়ে গিয়ে বসল।

জ্যোতিষবাবু জঙ্গলের চারপাশে চার-পাঁচজনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আবার রিফ্লেক্টার ঠিক করে শুটিং আরম্ভ হল। ক্লোজ-শটে মিড-শটে আমার আর কার্তিকবাবুর সিনগুলো ঘন্টাখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। আর কোনো রকম ডিস্টার্বেন্স হল না।

হেমচন্দ্রের কাছে মৃণালিনীর বিবাহ এবং পরে ব্যোমকেশের সব বৃত্তান্ত শুনে গুরুদেব খুশি হয়ে হেমচন্দ্রকে সস্ত্রীক মথুরায় গিয়ে বাস করবার নির্দেশ দিলেন। ঠিক হল মাধবাচার্য এখান থেকে সোজা কামরূপ চলে যাবেন এবং উপযুক্ত সময় এলে হেমচন্দ্রকে কামরূপাধিপতি দূত পাঠিয়ে আহ্বান করবেন। মৃগচর্ম, কমণ্ডলু প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিসগুলো নিয়ে মাধবাচার্য উঠে দাঁড়ালেন। হেমচন্দ্রও প্রণাম করে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, হঠাৎ মাধবাচার্য বললেন—'দাঁড়াও!'

সিনটা এইখানে কাট হল। জ্যোতিষবাবু বললেন—'ব্রেক ফর লাঞ্চ।' কাছে গিয়ে বললাম—'সিনটা তো শেষ হল না বাঁড়ুয্যেমশাই, কাট বললেন কেন?'

হেসে জবাব দিলেন জ্যোতিষবাবু, 'পরিচালক হও, তখন বুঝতে পারবে।'

স্টুডিওর বাবুর্চি আহমেদ-এর রান্না খুব ভাল। সেদিন খেলাম মাংসের চাপাটি, মুগের ডাল, মুরগীর কারি জাতীয় একটা প্রিপারেশন। সরু সুগন্ধি চালের ভাত আর বড় একটা মর্তমান কলা। খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। বললাম, 'দুপুরের ভূতুড়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?'

একটু ভেবে নিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, ' সত্যি কথা যদি শুনতে চাও, আমাদেরই মধ্যে কেউ কাছ থেকে ঐরকম আওয়াজ করেছে। ক্যামেরার আওয়াজ, তার উপর অতগুলো রিফ্লেক্টার। হঠাৎ অন্যদিকে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—এ অবস্থায় ধরা না পড়ে একটু মজা করা খুব আশ্চর্য নয়। আচ্ছা, কালকের মধ্যেই আমি রিয়েল কালপ্রিটকে বার করব।'

খাওয়া-দাওয়ার পর প্রসঙ্গ বদলে গেল, বললাম, 'খালি তো আমাকে নিয়েই শুটিং চালাচ্ছেন। আপনার নায়িকা মৃণালিনীর তো দর্শন আজও পেলাম না।'

বেশ একটু গম্ভীর হয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, ‘পাবে,পাবে, ধৈর্য ধর। একদিন শুটিং করে চার পাঁচদিন বন্ধ দিচ্ছি কীসের জন্যে? শুধু মৃণালিনীকে তালিম দেওয়ার জন্যে। যেদিন শুটিং না থাকে, ডরিসকে হেড আফিসে এনে রীতিমতো ট্রেনিং দিচ্ছি। এরপর যখন বাজারে ছাড়ব, সবার তাক লেগে যাবে।’

অবাক হয়ে বললাম, ‘ডরিস! বাঙালি মেয়ে নয়?’

মাথা নেড়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, ‘নো, কিন্তু এ মেয়ে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালি মেয়েকে লজ্জা দেবে— এ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করলাম। আরও একটা বিশেষ কারণে হুট করে নামাচ্ছি না।’

বললাম, ‘কী কারণ?’

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আশেপাশে একবার দেখে নিয়ে চুপিচুপি বললেন জ্যোতিষবাবু, ‘ভাংচি দেবে।’

চুপ করে রইলাম। দ্বিগুণ উৎসাহে জ্যোতিষবাবু শুরু করলেন, ‘মেয়েটির নাম মিস ডরিস স্মিথ। কিন্তু বাংলা ছবির নায়িকার ও নাম তো চলবে না, দাও না একটা প্রাণমাতানো বুককাঁপানো মিষ্টি বাংলা নাম।’

ম্লান হেসে বললাম—‘মাফ করবেন স্যার, ফিরিঙ্গি মেয়েদের দেখলে আমার এমনিতেই বুক কেঁপে ওঠে। আপনিই যা হয় একটা নাম দিয়ে দিন না!’

চিন্তিত মুখে আকাশের দিকে চেয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন জ্যোতিষবাবু। মনে হল নাম-সাগরে তলিয়ে গেছেন।

চুপচাপ বসে চারদিকে চাইছি, হঠাৎ দেখি, উত্তরদিকে একটা আমগাছের আড়াল থেকে বকের মতো গলাটা বাড়িয়ে হাসছে মনমোহন। আস্তে আস্তে উঠে এক-পা দু-পা করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা আঙুল মুখে দিয়ে আমাকে চুপ করতে বলে একরকম টেনেই নিল গাছটার আড়ালে। বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, ‘কী মনমোহন, এতক্ষণ ছিলি কোথায়?’

—‘এখানে।’

—‘এখানে ছিলি, অথচ এতক্ষণ দেখতে পেলাম না, ব্যাপার কী?’

এতক্ষণ বাদে শুরু হল মনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ হাসি। বলল, ‘মেসোমশাই মানা করে দিয়েছে শুটিং-এ আসতে। আমি কিন্তু আগাগোড়া তোদের শুটিং দেখেছি।’

অবাক হয়ে বললাম, ‘কী করে?’

হাত দিয়ে আমগাছটার উঁচু ডালটা দেখিয়ে মনমোহন বলল, ‘ওখানে বসে। হ্যাঁরে, তোদের মাধবাচার্য কি পূর্ববঙ্গের ভাষায় সংলাপ বলছে?’

—‘কেন বলতো?’

—‘ডালে বসে পাতার আড়াল থেকে অতদূর স্পষ্ট দেখা না গেলেও মনে হল মাধবাচার্য ভয়ানক রেগে গিয়ে তোকে বাঙাল ভাষায় তড়পাচ্ছে।’

রহস্যের মাঝখানে একটুখানি ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলাম যেন।

বললাম, 'ছিঃ মনমোহন, কাজটা ভাল করিসনি, জ্যোতিষবাবু ভীষণ চটে গেছেন।'

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল মনমোহনের। বলল, 'কী বলতে চাইছিস তুই?'

বললাম, 'আমি অবিশ্যি তোর নাম বলব না, কিন্তু উনি যদি কোনোরকমে জানতে পারেন—।'

কথা কেড়ে নিয়ে মনমোহন বলল, 'কী জানতে পারেন, আমি গাছ থেকে লুকিয়ে শুটিং দেখেছি, এই কথা?'

জবাব দেবার আগেই শুটিং-এর ডাক পড়ল। তাড়াতাড়ি জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। সূর্য গাছের আড়ালে ঢাকা। মাধবাচার্যের কুটিরের চারপাশে অন্ধকার হয়ে আসছে। মনে মনে ভাবলাম, এই আলোতে শুটিং হবে কী করে!

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'একটু অন্ধকার না হলে এ সিনটা নেওয়া বৃথা হতো। সেই জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।'

এরই মধ্যে দেখলাম, জ্যোতিষবাবুর সহকারী জয়নারায়ণ মাধবাচার্যের দাওয়ায় মাটির পিলসুজের উপরে রাখা একটি মাটির প্রদীপ তেল-সলতে দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। ব্যাপারটা ঠিক তখনও বুঝতে পারিনি। প্রদীপ জ্বালা হলে জ্যোতিষবাবু কার্তিকবাবু ও আমাকে ডেকে বললেন, 'সিনটা ভালো করে শুনে বুঝে নাও কী করতে হবে তোমাদের। আগের শটে তোমাকে 'দাঁড়াও' বলেছেন মাধবাচার্য। এবার শট আরম্ভ হলেই তিনি দাওয়ার উপর থেকে মাটির প্রদীপটা হাতে করে নিয়ে সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে কুটিরের ঐ খড়ের চালায় আগুন লাগিয়ে দেবেন। তুমি ধীরাজ অবাক হয়ে বলবে, 'গুরুদেব, এ কী করছেন!' তখন কার্তিকবাবু বলবেন—'বৎস হেমচন্দ্র, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি বড়ই জটিল, পিছনে যবন সৈন্য আমাদের অনুসরণ করছে, এমতাবস্থায় কোনও চিহ্ন রেখে যাওয়া মূর্খতার পরিচায়ক—তাই এ স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে কুটির ভস্মীভূত করে যাচ্ছি।' তারপর তোমরা যখন দেখবে যে, আগুন বেশ জ্বলে উঠেছে তখন আস্তে আস্তে ক্যামেরার ডান পাশ দিয়ে সিন থেকে আউট হয়ে যাবে। বুঝেছ?'

দু'জনে উৎসাহভরে মাথা নাড়লাম।

জঙ্গলের উপর একটু একটু করে পাতলা অন্ধকার নেমে আসছে। জ্যোতিষবাবুর নির্দেশমতো কুটিরে আগুন লাগিয়ে আমরা সরে এলাম। শুকনো বাঁশ-খড়-দরমা দেখতে দেখতে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। সমস্ত জঙ্গলের উপর কে যেন ধামা ধামা আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। তন্ময় হয়ে ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ গগনভেদী চিৎকার, 'বাঁচাও, পুইড়্যা মল্লাম, আমারে বাঁচাও!'

কণ্ঠস্বর পরিচিত। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এবার বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আওয়াজ আসছে মাধবাচার্যের জ্বলন্ত কুটিরের ভেতর থেকে। বোধহয় কয়েক

সেকেন্ড। তারপরেই চার-পাঁচজন সেটিং-এর লোক ছুটে গিয়ে অনেক কষ্টে ঢুকে পড়ল ঐ জ্বলন্ত কুটিরে। এদিকে চিৎকারের কামাই নেই—'বাঁচাও, আমারে বাঁচাও!' আজও মনে হলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ক্যামেরা থামিয়ে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বললাম—'তোমরা বেরিয়ে এসো, এক্ষুনি ঘর পড়ে যাবে।' শুধু ফটাস ফটাস করে বাঁশের গিরেগুলো ফাটার শব্দ। একটু পরেই একটা লোককে চ্যাংদোলা করে ধরে বেরিয়ে এল সেটিং-এর লোকগুলো। একরকম সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপ করে জ্বলন্ত কুটিরের চালখানা পড়ে গেল।

বাইরে এনে আধমরা লোকটাকে ওরা ঘাসের উপর শুইয়ে দিল। কুটিরের আগুনে মুখ দেখে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'মধুসূদন!'

মধুসূদন ধাড়ার বাড়ি পূর্ববঙ্গে, বছরতিনেক আগে চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় এসে কী করে সেটিং-মাস্টার দীনশা ইরানীর নজরে পড়ে যায়। সেই থেকে সেটিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। আগের দিন মাইনে পেয়েছে, আজ কী কারণে যেন সেটিং ডিপার্টমেন্ট বন্ধ। সকাল থেকে স্টুডিও-সংলগ্ন বিখ্যাত তাড়ির দোকানে বসে আকণ্ঠ তাড়ি খেয়ে বেলা দশটার মধ্যেই প্রায় বেহুঁশ হয়ে নির্জনে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে মাধবাচার্যের কুটিরে ঢুকে খড় লতাপাতা জড়ো করে তার উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দুর্ঘটনা না বললেও চলে।

ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দেখলাম, দু'তিন জায়গায় ফোস্কা পড়ে গেছে। বেশ কয়েকদিন ভুগবে, প্রাণে মরবে না।

রাগে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'ব্যাটা পুড়ে মরলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম।'

এরকম নিষ্ঠুর কথা জ্যোতিষবাবুর মুখে এর আগে কখনও শুনিনি। অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইলাম। আমার দিকে চেয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'কথাটা কেন বললাম বুঝতে পারলে না? ব্যাটা মরলে খবরটা সাহেবদের কানে যেত। তাহলে যত অশান্তির মূল ঐ তাড়ির দোকানটা তুলে দেবার একটা ছুতো অন্তত খুঁজে পেতাম।'

দেড় মাস পরের কথা। 'মৃণালিনী' ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা এর মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটেনি। আর ঘটে থাকলেও সেদিকে দৃষ্টি দেবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। তবে স্টুডিওতে একটা বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাব যেন লক্ষ্য করলাম। গেট দিয়ে ঢুকেই যেখানে সামনের বড় আমগাছটা কেটে ফেলা হয়েছে, সেখানে গাড়ি গাড়ি ইট চুন সুরকি সিমেন্ট গাদা করে রাখা হয়েছে। শুনলাম, ওখানে একটা বড় ফ্লোর তৈরি হবে টকি ছবি তোলার জন্য। ফ্রামজী এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিয়ে আমেরিকার আর.সি.এ. কোম্পানির

সঙ্গে চুক্তি করে এসেছেন। মাসখানেকের মধ্যেই টকি-মেশিন ও দু'তিনজন বিশেষজ্ঞ এসে যাবে, তার আগেই ফ্লোর কমপ্লিট করা চাই-ই চাই। রাত-দিন মিস্ত্রি খাটতে লাগল।

মন ভাল নেই। বাবার শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে। পনেরো দিন বিশ্রাম নিয়ে বেশ একটু সুস্থ হয়েই আবার স্কুল, টিউশনি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাতে লুকিয়ে আই.এ-র পড়া শুরু করে দেন। ফলে দিন সাতেক বাদেই আবার বুকের ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। স্কুলে হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, এবার ছুটি নিলে বিনা বেতনেই নিতে হবে, কেননা পাওনা ছুটি আর নেই। দ্বিতীয় উপায়, ওঁর জায়গায় আর একটি মাস্টার সাময়িকভাবে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁর মাইনে বাবার মাইনের থেকে কেটে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে, তাই দেওয়া হবে। স্কুলে বাবা মাইনে পেতেন মাত্র সত্তর টাকা। তা থেকে টেম্পোরারি মাস্টারকে অন্তত চল্লিশ টাকা দিলে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ত্রিশ টাকা। মহা ভাবনায় পড়ে গেলাম। বললাম, 'স্যার আমি ম্যাট্রিক পাশ, বাবা যতদিন ভাল রকম সুস্থ না হন, ততদিন যদি পড়াতে অনুমতি করেন, তাহলে সবদিক রক্ষা হয়। হেডমাস্টার সতীশচন্দ্র বোস একটু গুম হয়ে কী ভেবে নিলেন, তারপর হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ভেরি গুড আইডিয়া।'

তাই ঠিক হল। সকালে নিচু ক্লাসের ছেলে দুটোকে পড়িয়ে এসে দুপুরে স্কুল মাস্টারি করতে শুরু করে দিলাম। উঁচু ক্লাসের ছেলে দুটি বাবার অসুখের কথা শুনে বাড়িতে এসে বাবার কাছে পড়ে যেতে সানন্দে রাজি হয়ে গেল।

গোল বাধলো স্টুডিও নিয়ে। জ্যোতিষবাবুকে সব খুলে বললাম। সব শুনে বললেন, 'সে জন্য তুমি ভাবছ কেন? 'মৃণালিনী'তে তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। বক্তিয়ার খিলজির সসৈন্যে অশ্বপৃষ্ঠে কতগুলো পাসিং শট নিতে বাইরে যাব। তুমি সঙ্গে থাকলে ভালই হতো। কিন্তু এ অবস্থায় তোমার যাওয়া কোনোমতেই চলতে পারে না। বাড়ি গিয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও, আর প্রতি মাসের তিন তারিখে হেড আফিসে এসে মাইনে নিয়ে যেও। তাছাড়া টকি আসছে, কর্তাদের এখন মাথা খারাপ। হৈচৈ করেই তো ছ'মাস কাটবে।'

নিশ্চিন্ত মনে মিত্র স্কুলে মাস্টারি শুরু করলাম। আমাকে বেশির ভাগ নিচু ক্লাসেই পড়াতে হতো। কখনও কখনও উঁচু ক্লাসে পড়াতাম। পড়াতাম বললে ভুল হবে, গল্প বলতাম। ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতেই ছেলের দল হৈহৈ করে উঠত, 'গল্প বলুন স্যার, গল্প!'

সত্যি কথা বলতে কি পড়াবার আমি জানিই বা কী? ক্লাসে ঢুকবার আগেই বুকের ভেতরটা কাঁপত। যদি ভুল হয়, অথবা কোনও কথার ভুল মানে বলে ফেলি, আর ছেলেরা ধরে ফেলে? তাই গল্প বলতে অনুরুদ্ধ হয়ে মৌখিক দু'একবার আপত্তি

করলেও মনে মনে খুশিই হতাম। এখানে উল্লেখযোগ্য, অধুনা ফিল্মের বিখ্যাত অভিনেতা বিকাশ রায় এবং 'কঙ্কাল', 'দুজনায়' প্রভৃতি বহু নাম করা ছবির অন্যতম প্রযোজক গোবিন্দ রায় আমার ছাত্র। স্কুলে আমার কাছে পড়েছেন বা গল্প শুনেছেন।

একটা বিচিত্র জগৎ, বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা। বেশ লাগত। কোনো ছেলে হয়তো শ্লেটে বাঁদর এঁকে নিচে লিখেছে 'অজয় নন্দী'। রাগে কাঁপতে কাঁপতে অজয় নন্দী শ্লেটসমেত আসামিকে নিয়ে একেবারে আমার কাছে হাজির। অন্য সময় হলে হেসে ফেলতাম। কিন্তু মনে পড়ে গেল, আমি এখন বিচারক মাস্টার। বেশ খানিকটা ধমকে দিলাম অপরাধীকে, খুশি হয়ে অজয় নন্দী সিটে বসল। এরকম খুঁটিনাটি ব্যাপার অসংখ্য।

হয়তো কোনো ক্লাসে অনেক কষ্টে গল্প না বলে ডিকটেশন দিতে শুরু করেছি। মাঝপথে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার!'

বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলি, 'কী?'

একটু ইতস্তত করে ছেলেটি বলে, 'হনুমানের বাপের নাম জাম্বুবান নয় স্যার?'

আশ্চর্য হয়ে বলি, 'কে বলেছে তোমায়?'

চুপ করে থাকে ছেলেটি। রাগ হয়, বলি, 'কাল তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে এসো। তিনি কী বলেন শুনে তারপর বলব। এখন ডিসটার্ব কোরো না, কাজ কর।'

তবু দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটি। বলি, 'কী হল?'

আমতা আমতা করে ছেলেটি বলে, 'জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবাকে।'

অসহিষ্ণু হয়ে বলি, 'কী বললেন তিনি?'

লজ্জায় লাল হয়ে সহপাঠীদের দিকে চাইতে থাকে ছেলেটি। এবার বেশ একটু ধমকে উঠি, 'কী বলেছেন তোমার বাবা?'

—'বাবা বললেন, আমিই নাকি একটা জাম্বুবান।'

হাসির রোল উঠল ক্লাসে। ম্যানেজ করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আর ডিকটেশন দিতে পারলাম না।

আর একদিন একটু উঁচু ক্লাসে বাংলা পড়াবার ভার পড়ল আমার। মনে মনে ঠিক করলাম আজ আর কিছুতেই গল্প বলব না। সব ক্লাসেই যদি না পড়িয়ে গল্প বলে কাটিয়ে দিই, হেডমাস্টারমশাই তাহলে ভাববেন কী! চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যে মুখখানা যথাসাধ্য গোমড়া করে ঢুকলাম ক্লাসে। হৈচৈ করে উঠল ছেলের দল, গল্প বলুন স্যার, রবার্ট ব্রেকের গল্প।

হাত তুলে ওদের চুপ করতে বলে গম্ভীরভাবে বললাম, 'রোজ রোজ পড়ার আওয়ারে গল্প বলা ঠিক নয়। হেডমাস্টারমশাই ওতে রাগ করেন—'

বাধা দিয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ছেলের দল, 'মোটেই নয়। এইতো খানিক আগে আমরা হেডস্যারের কাছে গিয়ে বললাম। তিনি তো হেসেই মত দিলেন।'

ক্লাসসুদ্ধ ছেলের কাছে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। পড়ানো আর হল না, হল রবার্ট ব্রেকের গল্প।

মাসের তিন তারিখে হেড আফিসে গিয়ে খাতায় সই করে মাইনে নিয়ে আসি, আর বাকি উনত্রিশ দিন স্টুডিওর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, স্কুল মাস্টারি আর টিউশনি করে কাটিয়ে দিই। একদিন নরেশদার সঙ্গে দেখা। তিনিও মাইনে নিতে এসেছেন। সব খুলে বললাম নরেশদাকে। একটু চিন্তা করে বললেন, 'তাইতো, খুবই ভাবনার কথা। এভাবে তো বেশিদিন চলবে না। দু'দিন বাদে যখন টকি ছবির শুটিং আরম্ভ হবে, তখন ছুটি একদম পাবে না। তাছাড়া জাহাঙ্গীর সাহেব এখন হর্তাকর্তা। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ছবিটা টকিতে তুলতে।'

সাগ্রহে বললাম—'আপনিই পরিচালনা করবেন তো নরেশদা?'

শ্লাঘার হাসি হেসে নরেশদা বললেন, 'দেখ, শেষ পর্যন্ত কী হয়!'

এখানে জাহাঙ্গীরজী ম্যাডানের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি। রুস্তমজী সাহেব স্বর্গত জে. এফ. ম্যাডানের জামাতা, তিনিই সর্বেসর্বা। ম্যাডানের বড় ছেলে বজ্জরজী মদের দোকান ও শো-হাউসগুলো দেখাশোনা করতেন। সেজ ফ্রামজীর উপর ভার ছিল ফিল্ম প্রোডাকসনের তত্ত্বাবধান করা। তৃতীয় পুত্র হলেন জাহাঙ্গীর সাহেব, ফোঁপরদালালের মতো সব ডিপার্টমেন্টে ঘুরে বেড়াতেন। ফ্রামজী আমেরিকা চলে গেলে ওঁর উপর স্টুডিও দেখাশোনার ভার পড়ে। মিষ্টভাষী, অমায়িক, নিরহংকার জাহাঙ্গীর সবার প্রিয় ছিলেন। আর দুটি ছেলে স্কুলে বা কলেজে পড়ত। স্টুডিওর সংস্রবে তাদের আসতে দেওয়া রুস্তমজীর নিষেধ ছিল।

মাইনে নিয়ে আসবার সময় সিঁড়িতে জাহাঙ্গীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নরেশদা আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার মাইনের কথাটাও সাহেবকে শুনিয়ে দিলেন নরেশদা। বললেন—'সত্যি ওর উপর অবিচার করা হয়েছে।' সব শুনে হাসিমুখে আমার কাঁধে হাত রেখে জাহাঙ্গীর সাহেব বললেন, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি, এটা মিঃ গাঙ্গুলী'জ ডুইং। হাউএভার, স্টুডিওয় আমার সঙ্গে দেখা কোরো তুমি।'

রাস্তায় নেমে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত এসে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। নরেশদা বললেন, 'তুমি বোধহয় শোননি ধীরাজ, আমরা একটা ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার পার্টি করেছি। কলকাতার কাছাকাছি সব জায়গায় শো দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দলে আছেন—কৃষ্ণচন্দ্র দে, রবি রায়, ভূমেন রায়। মেয়েদের মধ্যে মিস লাইট, চারুবালা, পদ্মাদেবী প্রভৃতি আরও অনেক মেয়ে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল যতদিন না নিজস্ব হাউস কলকাতায় হয়, ততদিন বাইরে বাইরে শো করে বেড়ানো। আর একটি কথা। এখন কাউকে বোলো না। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর বড়তলা থানার পশ্চিম গা ঘেঁষে যে জমিটা, ওটা লিজ নিয়ে ওখানে আমাদের হাউস তৈরি হবে, নাম হবে 'রঙমহল'.কেমন নাম?'

বললাম, 'চমৎকার!'

—'তা, তোমার বাবার যদি মত হয় তাহলে আমাদের দলে তোমাকে নিতে পারি। বাড়তি আয় হিসেবে কথাটা ভেবে দেখো।'

কালীঘাটের ট্রাম এসে গেল, দুজনে উঠে পড়লাম।

সেইদিন রাত্রেই কথাটা বাবার কাছে পাড়লাম। শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইলেন বাবা। তারপর বললেন, ' না ধীউবাবা, থিয়েটারে তোমার ঢুকে কাজ নেই। সিনেমা করছ ঐ কর। তাছাড়া ঐ সব সংসর্গে রাতবিরেতে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানো—না না, দরকার নেই।'

বাবার একান্ত অনিচ্ছা আমি থিয়েটারে যোগদান করি। চুপ করে গেলাম। এরই মধ্যে একদিন রবিবারে রিনির দল এসে হাজির, মানে রিনির বাবা মা ভাইবোনেরা, বাবার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছে। একটু নিরিবিলি হতেই রিনি বলল—' তুমি আর যাও না কেন ছোড়দা?'

হেসে বললাম, 'বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা না করে, চাঁদের দূরত্ব মনে রেখে দূরে থাকাই ভাল নয় কি?'

—'তোমাদের ওসব হেঁয়ালির কথা বুঝি না, গোপাদি কিন্তু সত্যি তোমাকে ভালবাসে।'

তাড়াতাড়ি রিনির মুখে চাপা দিয়ে বলি, 'ভুলেও আর কোনও দিন ঐ সর্বনেশে কথা উচ্চারণ করিস না রিনি। সত্যিই যদি ছোড়দার ভাল চাস আমার এ অনুরোধটা রাখিস বোন।' তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে সেদিনকার দৈনিক কাগজটা পড়বার ভান করি, ব্যথাভরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে রিনি।

পরদিন সকাল থেকে আবার চলল সেই রুটিনবন্দী কাজ। টিউশনি, স্কুল, বাবার অসুখের রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের বাড়ি। দিনপনেরো এইভাবে কাটল। বাবার জ্বর ও বুকের সর্দি একটুও কমল না, বরং খারাপের দিকেই গেল। আগে জ্বর রেমিশন হয়ে আবার আসত। ক'দিন থেকে দেখলাম রেমিশন হয় না। নামে একশ, কোনও দিন নিরানব্বই পয়েন্ট চার, আবার তার উপরই জ্বর আসে একশো তিন-চার পর্যন্ত।

ডাক্তার নগেন দাসকে একদিন খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী রকম বুঝছেন ডাক্তারবাবু?'

—'জ্বরটা রেমিটেন্ট টাইপের মনে হচ্ছে। বুকের সর্দিটা কমে গেলে জ্বরটাও বন্ধ হয়ে যাবে। দেখি, চেষ্টার তো কসুর করছি না।'

বুকের একটা মালিশ দিলেন ডাক্তারবাবু আর জ্বরের এক শিশি মিকশ্চার। কী একটা পর্বোপলক্ষে স্কুল দুদিন বন্ধ, দুপুরে খেয়েদেয়ে স্টুডিওতে গেলাম। বোধহয় দিনপনেরো আসিনি। এর মধ্যেই চেহারা পালটে গেছে স্টুডিওর। ঢুকেই বাঁ হাতে প্রকাণ্ড ফ্লোর। সামনে লাল সুরকি আর খোয়া দিয়ে পেটা পথ। পূর্বদিকের জঙ্গলটাও

প্রায় পরিষ্কার । সবাই ব্যস্ত কাজে। জ্যোতিষবাবু সদলে বাইরে গেছেন ছবি তুলতে, এখনও ফেরেননি। গাঙ্গুলীমশাই ও মুখুজ্যে 'দেবীচৌধুরাণী'র এডিটিং নিয়ে ব্যস্ত। উদ্দেশ্যহীনের মতো খানিক ঘুরে বেরিয়ে বাড়ি চলে আসব কিনা ভাবছি, দেখি একখানা মোটর থেকে জাহাঙ্গীর সাহেব ও নরেশদা নামছেন। নমস্কার করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। নরেশদা বললেন, 'কথা আছে ধীরাজ, এখুনি চলে যেও না যেন।'

জাহাঙ্গীর সাহেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সমস্ত স্টুডিওটা দেখতে লাগলেন নরেশদা। প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে সাহেব গাড়ি করে চলে গেলেন।

কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন নরেশদা, 'তারপর, তোমার বাবার শরীর কেমন আছে?'

সব বললাম। শুনে নরেশদা বললেন, 'আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না। জ্বরটা কেমন বাঁকা লাগছে। তুমি অন্য ডাক্তার দেখাও।'

বললাম, 'বাবা রাজি হচ্ছেন না। ওঁর ধারণা ডাক্তার দাসই ওঁকে ভাল করে দেবেন।' একথা সেকথার পর নরেশদা বললেন, 'একটা মন্দের ভাল খবর তোমায় দিয়ে রাখি শোনো। জাহাঙ্গীর সাহেব তোমার কুড়ি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার পরিচালিত 'নৌকাডুবি' ছবির শুরু থেকে ঐ বাড়তি মাইনে পাবে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কবে থেকে শুরু হবে নরেশদা?'

একটু ভেবে নিয়ে নরেশদা বললেন, 'দেখি, তবে তাড়াহুড়ো করে এ ছবি আমি করব না। এটা খাস জাহাঙ্গীর সাহেবের ছবি। তার উপর টকি মেশিন এলে এইটাই হবে প্রথম বাংলা সবাক ছবি।'

মনে মনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললাম, 'আমায় কী পার্ট দেবেন নরেশদা?'

নরেশদা বললেন, 'সাহেব বলছেন নায়ক রমেশের পার্ট তোমায় দিতে। আমার ইচ্ছে নলিনাক্ষের পার্টটা তুমি কর।'

চোখের সামনে নৌকাডুবি উপন্যাসের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলো ভেসে উঠল। নরেশদার হাত দুটো ধরে বললাম, 'না নরেশদা, নলিনাক্ষ অথরস ব্যাকিং পার্ট, খুব সুখ্যাতি পাওয়া যাবে। কিন্তু রমেশের ভূমিকা মনস্তত্ত্বে জটিল হলেও, লোভনীয়। আমি রমেশ করব।'

একটু চিন্তা করে নরেশদা বললেন, 'তা যেন হল। কিন্তু এতো নির্বাক ছবি নয়, সবাক। রীতিমতো রিহার্সাল দরকার। তুমি তো আবার মাস্টারি শুরু করে দিয়েছ। রিহার্সাল দেবে কী করে?'

মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম। একদিকে অত বড় চান্স, অন্য দিকে কর্তব্য। কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখি?

নরেশদাই সমাধান করে দিলেন। বললেন, 'তোমার স্কুল তো চারটেয় ছুটি হয়?' মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—'তাহলে একটা কাজ আমি করতে পারি। দুপুর দুটো থেকে মেয়েদের নিয়ে রিহার্সাল শুরু করে দেব। চারটের পর তুমি এলে পুরো রিহার্সাল চলবে।' কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।

বাড়ি চলে এলাম। বাবার জ্বর অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। নিরানব্বইয়ে নেমে উঠেছে এক শ' পয়েন্ট চার। বুকের মালিশটাতেও কিছু কাজ হয়েছে মনে হল। সর্দিটা সহজভাবেই উঠে যাচ্ছে। বালিশে ঠেসান দিয়ে সেদিনকার দৈনিক কাগজটা পড়ছিলেন বাবা। কাছে এসে নরেশদার কথাগুলো সব বললাম। শুনে একটু চিন্তা করে বললেন, ' ভাল কথা। তবে মুখের কথায় খুব বেশি আশান্বিত হয়ো না, দুঃখটা কম পাবে।'

রাত্রে খেয়েদেয়ে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে টিউশনি থেকে ফিরতেই সাড়ে ন'টা হয়ে গেল। বাড়ির দরজার কাছে পিওনের সঙ্গে দেখা। আমার নামে খামে একখানা চিঠি।

অপরিচিত হাতের লেখা। বেশ একটু অবাক হয়ে গেলাম। ইতস্তত করে খুলে ফেললাম। লেখা—

ধীরাজবাবু, আগামী বুধবার অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। বিশেষ দরকার। আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তরদিকের রাস্তায় গাড়িতে আপনার জন্য সন্ধ্যে ছ'টা হইতে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। আমাদের গাড়ির নম্বর ৫৬৭৮০, ওল্ড মডেল মিনার্ভা।

—গোপা

সন্দেহ সংশয় ভয়, অন্যদিকে আশা আকাঙ্ক্ষা কৌতূহল। এই সব ক'টি অনুভূতি যখন একসঙ্গে জোট বেঁধে মনটাকে তোলপাড় করে ফেলে, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যুক্তিহীন বেপরোয়া যৌবনের অদম্য কৌতূহলই অন্য সবাইকে দাবিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। আমারও ঠিক তাই হল। আগের দিন রাত্রে সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকম যুক্তি তর্ক দিয়েও মনকে বোঝাতে পারলাম না যে, গোপার সঙ্গে দেখা না করাটাই হবে আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ভাবলাম, দেখাই যাক না কী বলতে চায় গোপা। আমার দিক থেকে এমন কোনও অপরাধ করিনি, যার জন্য কাপুরুষের মতো লুকিয়ে থাকতে হবে।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে যখন পৌঁছলাম, তখন ছ'টা বেজে গেছে। শীতের সন্ধ্যা। মনে হল বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। চারদিকে আলোর মালায় ঘেরা অগণিত স্বাস্থ্যান্বেষী স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুর কলকণ্ঠমুখর প্রস্তরসৌধ যেন কিছুক্ষণের জন্য সজীব হয়ে উঠেছে। উত্তর দিকের ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড় করানো গাড়িগুলোর নম্বর প্লেটের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে পুব থেকে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। বেশ কিছুদূর এগিয়েও গোপাদের গাড়ির নম্বর দেখতে পেলাম না।

ভাবলাম, তবে কি সমস্ত ব্যাপারটা ভুয়ো ধাপ্পাবাজি? আমাকে বোকা বানিয়ে নিছক খানিকটা কৌতুক করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য? কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে এভাবে কৌতুক করতে পারে এমন কোনো লোককে আমার স্মরণ-গন্ডির মধ্যে অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পেলাম না। আবার এগোতে লাগলাম। ফুটপাথ প্রায় শেষ হয়ে এল, হঠাৎ দেখি দশ-বারো হাত দূরে অপেক্ষাকৃত নির্জন ও অন্ধকার জায়গায় বিরাট কালো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে একখানা গাড়ি, পিছনে টকটকে রেড লাইটের ঠিক নিচেই রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে গোপার দেওয়া নম্বর—৫৬৭৮০। বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। ভাবলাম, চলেই যাই। এ সাক্ষাতের পরিণাম কোনও দিক দিয়েই যে শুভ হবে না, তা জেনেও কেন—।

লোভী যৌবন গর্জন করে উঠল—কাপুরুষ! জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার বাসনা আছে, সাহস নেই? এ-রকম ভীরু মন নিয়ে আর কোনো দিন বাইরে বেরিও না। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থেকো!

যা হবার হবে। এক পা-দু'পা করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম গাড়িটার পাশে। গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার। আবছা আলোয় মনে হল কোনো মহিলা বসে আছেন। কী করব না করব ভাবছি, এমন সময় ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে এল পুরু খাকি প্যান্ট ও গলাবন্ধ কোট পরা ড্রাইভার। বুকের ডানপাশে হিজিবিজি মনোগ্রাম, দেখে অনুমানে বুঝলাম, রায়বাহাদুরের নাম। ড্রাইভার দরজা খুলে পাশে দাঁড়াল, বুঝলাম গাড়িতে উঠতে বলছে। দুরুদুরু বক্ষে উঠে বসলাম। ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে নিজের সিটে আদেশের অপেক্ষায় বসল। আমার সিটের অন্য ধার থেকে বেশ গুরুগম্ভীর গলায় আদেশ হল, 'চালাও।'

একটু সোজা গিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে গাড়ি মন্থরগতিতে চলল রেড রোড ধরে। কিছুদূর গিয়ে একটি শাখাবহুল গাছের তলায় আসতেই আবার শুনলাম, 'থামাও।'

গাড়ি থেমে গেল। আদেশ হল, 'রঘুনন্দন, কাছাকাছি থেকো। ডাকলেই যেন পাই।'

মাথার গোল টুপিটায় ডান হাত ছুঁইয়ে রঘুনন্দন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমনিতেই রেড রোড জনবিরল। ক্বচিৎ কখনো দু'একখানা গাড়ি আসে যায়। রাস্তা নিঝুম, গাড়ির ভিতরটাও তাই। রুক্ষ গম্ভীর কণ্ঠ নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিল, 'বুঝতে পেরেছ বোধহয় আমি গোপা নই, গোপার মা?'

অনুমানে আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। চুপ করেই রইলাম।

—'চিঠিটা অবিশ্যি লিখেছিল গোপাই, আসবার কথাও ছিল তার, কিন্তু ধম্মের কল বাতাসে নড়ে, তাই হরিমতী ব্যাপারটা আগেই আমার কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।'

একটু চুপ করে আবার প্রশ্ন:

—'তুমি আজকাল খিদিরপুরে যাও না কেন?'

—'এমনি, সময় পাই না বলে।'

—'সময় পাও না, না মারের ভয়ে?'

—'মারের ভয়ে!'

—'হ্যাঁ, এবার খিদিরপুরে গেলে হাত-পা নিয়ে আস্ত ফিরে আসতে পারবে না।'

অবাক হয়ে তাকালাম। অন্ধকারে গোপার মায়ের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলাম না, শুধু ক্রুদ্ধ চোখের মতো নথের হীরে দুটো রাস্তার ম্লান আলোতেও জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল।

শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'কী উদ্দেশ্যে এত বড় ছলনার আশ্রয় নিয়ে আজ আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জানি না, জানবার কৌতূহলও নেই। শুধু আমাকে মারধোর করলেই যদি আপনার আক্রোশ খানিকটা নিবৃত্ত হয়, তাহলে ড্রাইভার রঘুনন্দনকে ডাকুন। আমাকে মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাক। বাধা দেব না, আর দিয়ে কোন লাভও হবে না।'

চুপ করে রইলেন গোপার মা। চলমান একটা গাড়ির হেডলাইট ভিতরের অন্ধকার কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঘুচিয়ে দিল। গোপার মাকে দেখলাম। প্রকাণ্ড গোল মুখ। মিশমিশে না হলেও বেশ কালো রং। নাকে প্রকাণ্ড গোল নথ, তাতে নানা রঙের দামী পাথর বসানো। বেশ রাশভারি চেহারা, দেখলে ভয় হয়।

গোপার মা-ই শুরু করলেন, ' মাকাল ফলের মতো কটা রং আর একরাশ বিশ্রী বাবরি চুল নিয়ে যদি মনে করে থাকো মেয়েরা তোমায় দেখলেই পাগল হয়ে যাবে, তাহলে মস্ত ভুল করেছ।'

জবাব দেবার প্রশ্ন নয়। চুপ করেই রইলাম।

গোপার মা বলে চললেন, 'পইপই করে কত্তাকে বলেছিলাম মেয়েছেলেকে অত লেখাপড়া শিখিও না। ভাল ঘর দেখে একটা নৈকুষ্য কুলিনের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও। শুনলেন না আমার কথা। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝুন।'

কথাগুলো বলেই বোধহয় বুঝতে পারলেন যে, এই সব পারিবারিক আলোচনা একজন বাইরের লোকের সামনে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখনই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

—'রিনির বাবা তোমার আপন কাকা?'

—'না, বাবার মামাতো ভাই।'

—'হুঁ, তাই বল।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এবার যেন নিজের মনেই বলতে শুরু করলেন গোপার মা।

— 'ঐ একফোঁটা মেয়ে দেখতে, কিন্তু এদিকে বিষ-পুঁটুলি, ঐ তো যত নষ্টের মূল।'

এই সব অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ত কথাগুলোর শেষ পরিণতি কোথায় জানবার জন্য একটু অসহিষ্ণু হয়েই বললাম, 'কী জন্যে আমাকে ডেকেছেন দয়া করে বলবেন কি?'

গর্জন করে উঠলেন গোপার মা, 'নিশ্চয় বলব, নইলে কি তোমার সঙ্গে হাওয়া খেতে ঘর-সংসার ফেলে লজ্জাশরম ছেড়ে এতদূর ছুটে এসেছি? গোপাকে বিয়ে করার আশা তুমি ছেড়ে দাও, অন্তত আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না।'

বললাম, 'দিলাম।'

এত সহজ স্পষ্ট উত্তর আশা করেননি গোপার মা। একটু অবাক হয়ে তক্ষুনি আবার জ্বলে উঠলেন, 'তোমার কথায় বিশ্বাস কী? যারা বায়োস্কোপ করে বেড়ায়, তাদের কথার দাম আছে নাকি? এর আগে ক'খানা চিঠি দিয়েছে গোপা?'

—'একখানাও না।'

—'কী জন্যে তাহলে চিঠি লিখে এখানে দেখা করতে চেয়েছিল সে?'

—'জানি না।'

—'জানো, বলবে না। আর একটা কথা। দুপুরবেলা নিরিবিলি কাকার বাড়িতে গিয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা আর কোনো দিনও কোরো না। তোমার কাকা সব কথা শুনে ভীষণ রেগে গেছেন আর সেই খুদে মেয়েটাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন। দু'দিন খাওয়া বন্ধ।'

অন্ধকারে শিউরে উঠলাম। রিনি, আমার পার্ল হোয়াইট। কাকা এত বড় অমানুষ যে, ঐ ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটাকে —। চোখে জল এসে গেল। কিন্তু করবার কিছু নেই, শুধু নিজের মনে গুমরে মরা ছাড়া।

অনুমানে আমার অবস্থা কল্পনা করেই যেন খুশি হয়ে গোপার মা বললেন, 'চমৎকার মানুষ তোমার কাকা। তিনি তো স্পষ্টই বললেন, ওদের সাথে সম্পর্ক আছে, এটা স্বীকার করতেও লজ্জা হয়। তোমার বাবাই বা কী রকম—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'আমার বাবাকে এর মধ্যে টানবেন না। আপনার অনুযোগ আমার বিরুদ্ধে। আমায় যা খুশি বলুন।'

অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারলাম আমার দিকে চেয়ে আছেন গোপার মা। এতক্ষণ বাদে বাইরে চাইলাম। এরই মধ্যে ঘন কুয়াশার আস্তরণ নেমে এসেছে গড়ের মাঠে। চারপাশে আলোগুলো কেমন নিস্তেজ, মিটমিট করছে জোনাকির মতো। কিছু দূরে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ অস্পষ্ট স্বপ্নপুরীর মতো দেখাচ্ছে। ঘড়ি না দেখেও বুঝলাম, রাত বেশ হয়েছে। সহজভাবেই বললাম, 'আপনার কথা আশা করি শেষ হয়েছে। এবার আমি যাচ্ছি। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

গাড়ির ভিতরকার হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে দরজা খুলতে যাব, এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গোপার মা, 'অনেক কটু অপ্রিয় কথা বলেছি তোমায় বাবা, তুমি আমার ছেলের

নতো। কিছু মনে করো না, গোপা আমাদের একমাত্র মেয়ে। আমাদের মান-সম্ভ্রম সাধ-আহ্লাদ সবই নির্ভর করছে ওর উপর। তুমিই বলতো বাবা, আজ যদি তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে হয়, তাহলে সমাজে, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে?'

এতক্ষণ শুধু দাম্ভিকা রায়বাহাদুর গৃহিণীর কথাই শুনছিলাম। এবার কথা কইলেন গোপার মা। অভিভূত হয়ে গেলাম।

গোপার মা বললেন, 'বাপের অসম্ভব আদুরে ও অভিমানী মেয়ে গোপা। আমার শুধু ভয় হয় কখন কী করে বসে। গরীব হলেও আপত্তি হত না, শুধু যদি তুমি বায়োস্কোপ না করতে আর আমাদের পাল্টা ঘর হতে।'

চুপ করে রইলাম। আঁচলে চোখের জল মুছে গোপার মা বললেন, 'কখনও কোনো পরপুরুষের সামনে বার হইনি বা কথা কইনি। আজ শুধু মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। একটা কথা আমাকে দিয়ে যাও বাবা।'

বললাম, 'কী!'

—'গোপার জীবন থেকে তুমি সরে দাঁড়াও।'

একবার ভাবলাম বলি, 'সিনেমার লোকের কথার দাম কী!' কিন্তু আর আঘাত দিতে প্রবৃত্তি হল না।

বললাম, 'আমার দিক থেকে আমি রাখব আপনার কথা, কেননা ভেবে দেখেছি কোনও দিক দিয়েই এ মিলন শুভ হতে পারে না। না আমার দিক থেকে, না গোপার। কিন্তু আপনার মেয়ে যদি না শোনে আপনাদের কথা?'

মিনিটখানেক উদ্দেশ্যহীনভাবে বাইরে চেয়ে কী যেন ভাবলেন গোপার মা, তারপর বললেন, 'সে ভার আমাদের। তার জন্যে যদি—যাক অনেক রাত্রি হয়ে গেল বাবা, চল, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাই। কোথায় থাক তুমি?'

—'ভবানীপুরে, হরিশ পার্কের কাছে নামিয়ে দিলেই হবে।'

গোপার মা ডাকলেন, 'রঘুনন্দন!'

আলাদিনের দৈত্যের মতো অন্ধকার কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়াল বিরাটকায় রঘুনন্দন।

—'চল, বাবুকে নামাতে হবে হরিশ পার্কের কাছে।'

'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' কথাটা শোনাই ছিল, ওর সত্যিকারের অর্থটা জানা ছিল না। আজ সেটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। হিসাবের খাতায় জমার ঘরে শূন্য আগেই দিয়ে রেখেছিলাম। তারই পাশে গোপার মা আরও কয়েকটি শূন্য যোগ করে দিলেন। একটা কথা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, আমাকে উপলক্ষ করেই দুটো মেয়ের জীবনে নেমে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। অথচ আমার

কিছু করবার নেই, শুধু নিরপেক্ষ দর্শকের আসনে বসে বিয়োগান্ত দৃশ্যগুলোতে হা-হুতাশ করা ছাড়া।

পথ অল্প। নিঃশব্দে বসে আছি দুটি প্রাণী, একই চিন্তা নিয়ে। হরিশ পার্কের মাঝামাঝি আসতেই গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়লাম। হঠাৎ সাময়িক খেয়ালে একটা কাণ্ড করে বসলাম। গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে গোপার মাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে পশ্চিমদিকের ফুটপাথ ধরে হনহন করে চলতে শুরু করলাম। পিছন ফিরে না চেয়েও বেশ স্পষ্ট অনুভব করলাম, রঘুনন্দনকে গাড়ি চালাবার হুকুম দিতে ভুলে গিয়ে আমার গমনপথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন গোপার মা।

১৯৩০ সাল, ২৪ ডিসেম্বর। আমার জীবনের খরচের খাতায় আর সব কিছু মুছে নিঃশেষ হয়ে গেলেও ধ্রুবতারার মতো অম্লান হয়ে চিরদিন জেগে থাকবে ঐ একটি দিন। একটু আগে থেকেই শুরু করি। ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই 'নৌকাডুবি'র শুটিং আরম্ভ হল। সবাক নয়, নির্বাক। মাসখানেক আগে থেকেই হ্যারিসন রোডে পার্শি অ্যালফ্রেড থিয়েটারে (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) পুরোদমে রিহার্সাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। রমেশ—আমি, হেমনলিনী—শান্তি গুপ্তা, কমলা—সুনীলা দেবী (গত যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী দেববালার ছোট বোন), অক্ষয়—নরেশদা, অন্নদাবাবু—কুমার কনকনারায়ণ, যোগেশ—গিরিজা গাঙ্গুলী, ডাঃ নলিনাক্ষ —মিঃ রাজহন্স প্রভৃতি। সবাক 'নৌকাডুবি'র জন্য আমরা রীতিমত প্রস্তুত—হঠাৎ শুনলাম সবাক হবে না। প্রধান কারণ হল, বিশ্বভারতী ফিল্ম রাইটের জন্য প্রচুর টাকা চাইছেন। দ্বিতীয় কারণ, তখনও, কী কারণে জানি না, টকি মেশিন এসে পৌঁছয়নি। জাহাঙ্গীর সাহেব রেগে-মেগে নরেশদাকে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেহি—নির্বাকই তোল।' বলা বাহুল্য অনেক আগে থেকেই ম্যাডানের নির্বাক চিত্রস্বত্ব কেনা ছিল।

বড়ুয়া সাহেব তখন তাঁর নিজস্ব বড়ুয়া স্টুডিওতে নির্বাক 'অপরাধী' ছবি তুলছেন। তিনিই প্রথম ইলেকট্রিক লাইটে ঘরের মধ্যে ছবি তোলা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেন এই ছবিতে, ফলও খুব খারাপ হয়নি। আমরা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই। বাইরে সিন খাটিয়ে আয়না ও রিফ্লেকটার দিয়ে ক্যামেরাম্যান যতীন দাস 'নৌকাডুবি' তুলতে আরম্ভ করে দিল। যদিও সবাক ছবির জন্য একটি ফ্লোর প্রস্তুত ছিল এবং ইলেকট্রিক লাইটও এসে গিয়েছিল। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবার লোক তখনও আমেরিকা থেকে না আসায় সেদিকে মাথা ঘামানো দরকার বোধ করল না কেউ।

নভেম্বরের গোড়া থেকেই 'নৌকাডুবির' রিহার্সাল শুরু হয়। জাহাঙ্গীর সাহেবের কথামতো ঐ মাস থেকেই বাড়তি কুড়ি টাকা মাইনের খাতায় জমা হয়ে গেল।

স্কুলে হেডমাস্টারমশাইকে সব বললাম। ত্রিশ টাকায় একজন টেম্পোরারি মাস্টার নিচু ক্লাসে পড়াবার জন্য ঠিক হয়ে গেল। সবই একরকম ঠিক হল্ল, হল না শুধু বাবার ভেঙে পড়া শরীরটা। দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে লাগল। ডাক্তার নগেন দাস একদিন আমায় আড়ালে ডেকে স্পষ্টই বলে দিলেন, 'তোমার যদি ইচ্ছে হয় অন্য ডাক্তার দেখাতে পার, আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না। গত বাইশ দিন জ্বর একেবারে রেমিশান হয় না, তার উপর বুকের সর্দিটা রয়েছে।'

দিশেহারা হয়ে গেলাম। তখন ডাঃ পি. সাহা হোমিওপ্যাথিতে সবে নাম করতে শুরু করেছেন। তাঁর শরণাপন্ন হলাম। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে তিনি বললেন, 'একটু দেরি হয়ে গেছে। দেখি, কতদূর কী করতে পারি।'

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলতে লাগল। সারাদিন শুটিং করে এসে সন্ধ্যা থেকে বাবার কাছে বসি। কোনো কোনো দিন সারা রাত কেটে যেত। সংসারের যাবতীয় কাজ, তার উপর রাত জাগা, একা মা পেরে উঠতেন না। বাবা আপত্তি করতেন, আমরা শুনতাম না। ইতিমধ্যে আমার ছোট বোনকে অনেক কষ্টে বাবার অসুখের অজুহাতে নিয়ে আসা হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে স্বামী ও শাশুড়ির অমানুষিক নির্যাতনে বেচারী মরতে বসেছিল। ঐ একটি মাত্র বোন। আমাদের অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন বছরচারেক আগে। সেই থেকে আর পাঠায়নি, অজুহাত বিয়ের সময় গলার হারে তিনভরি সোনা কম হয়েছিল। বছরদুয়েকের একটি ছেলে ও ছ'মাসের একটি মেয়ে নিয়ে যেদিন একবস্ত্রে প্রথম বাবার সামনে এসে দাঁড়াল বোনটা, বাবা কেঁদে ফেলেছিলেন। বাবার চোখে জল বোধহয় এই প্রথম দেখলাম। দু'তিন দিন বাদে একদিন রাত্রে আমার বোনের রক্তহীন শীর্ণ হাতখানি আমার হাতের উপর রেখে বাবা বললেন, 'আজ থেকে একে তোমার আর একটি ছোট ভাই বলে মনে করবে, তোমার যদি একমুঠো জোটে এরও জুটবে। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও একে কোনো দিন শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে না। কথা দাও।' দিয়েছিলাম, আর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছিলাম। অবশেষে একটু একটু করে ঘনিয়ে এল সেই সর্বনেশে দিন ২৪ ডিসেম্বর। সকাল থেকে বেশ ভালই ছিলেন বাবা, জ্বর ও কাশিটা বাড়ল বিকেল থেকে। সারাদিন বাড়ির বার হলাম না, সন্ধ্যার পর মা কাঁদছেন দেখে বাবা হেসে বললেন, 'ছিঃ লীলা(আমার মায়ের নাম লীলাবতী), তুমি কাঁদছ? কত বড় গুরুভার আমার ধীউ বাবার ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ না? কোথায় ওকে উৎসাহ দেবে তা নয়, তুমি নিজেই স্বার্থপরের মত কেঁদে ভাসাচ্ছ!'

পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম, বললাম, 'আমাকে থিয়েটারে ঢোকবার অনুমতি দিয়ে যান বাবা। নরেশদা বলেছেন আপাতত পঁচাত্তর টাকা মাইনে ওঁরা দেবেন, নইলে এত বড় সংসার, মাত্র আশি টাকায় কী করে চালাব আমি!'

ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে অনুমতি দিলেন বাবা।

আজ কথা কইবার নেশায় পেয়ে বসেছে বাবাকে। ছেলেবেলায় কী রকম দুষ্টু ছিলেন, অবাধ্য হয়ে আর দুষ্টুমি করে কত দুঃখ দিয়েছেন ঠাকুর্দাকে, তা গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন। বেশি কথা বলা ডাক্তারের নিষেধ ছিল। আমি ও মা অনেক করে বললাম অত কথা না কইতে, কিন্তু আজ বাবা যেন মরিয়া। প্লাবনের নদী, বাঁধন দিয়ে আটকে রাখা অসম্ভব। বললেন,'ধীউ বাবা, আমি ছেলেবয়স থেকে মা-হারা, তাই সংসার আমাকে বাঁধতে পারেনি। কিন্তু তোমার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন, তার উপর রেখে গেলাম তোমার মাকে।'

অনেকগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন বাবা। মা বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। একটু সুস্থ হয়ে আবার শুরু করলেন বাবা, 'আমি জানি, মাকে দুঃখ কষ্ট কোনও দিনই তুমি দেবে না। তবুও বলে যাই—সংসারে প্রত্যক্ষ দেবতা মা-বাবাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে যারা কল্পিত পাথরের মূর্তির সামনে মাথা খুঁড়ে মরে, পুণ্য তাদের কোনো দিনই হয় না, শুধু মাথাব্যথাই সার হয়।'

বুকের ঘড়ঘড়ানিটা যেন বেড়েছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল বাবার। মাকে ইশারা করে একটু বেদানার রস দিতে বললাম। খেয়ে একটু সুস্থ হলেন যেন। পায়ের কাছে বসেছিলাম, ইশারা করে কাছে আসতে বললেন। বুকের কাছে ঝুঁকে বললাম, 'আমায় কিছু বলবেন বাবা?'

উত্তর না দিয়ে হাতখানি বুকের উপর চেপে ধরে চোখ বুজে রইলেন বাবা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'বাপের কর্তব্য কিছুই করে যেতে পারলাম না। তোমাদের জন্য রেখে গেলাম শুধু একরাশ দেনা, আর—।'

গলা ধরে গেল বাবার। একফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল বালিশের উপর।

বললাম, 'ওসব চিন্তা করে আপনি মন খারাপ করবেন না বাবা। আপনি রেখে যাচ্ছেন আশীর্বাদ, খুব কম ছেলের বাবা-মা যা রেখে যেতে পারেন। টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি চিরস্থায়ী নয়। বাবা-মা প্রচুর রেখে গেলেও বুদ্ধির দোষে দুদিনেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। আপনি শুধু আমায় আশীর্বাদ করে যান বাবা, যেন দুঃখ অশান্তি অভাব আমাকে কোনও দিন বিচলিত করতে না পারে।'

স্পষ্ট মনে আছে। একটা প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠেছিল বাবার সমস্ত মুখখানায়। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। বাবা বললেন, 'যাও একটু বিশ্রাম কর। আজ ক'দিন ধরে দিনে রাতে একটুও বিশ্রাম পাওনি।' মাও বললেন, ' আমি তো বসে আছি, তুমি যাও, একটু ঘুমিয়ে নাওগে।'

উপরে বাবার ঘরের পাশেই একটা চওড়া ঘেরা বারান্দা, সেইখানেই খালি তক্তপোশের উপর একটা মাদুর ও বালিশ নিয়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, একসময় কী একটা চিৎকার শুনে হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘরে ঢুকে দেখি, মা, ছোট বোন, ছোট ভাইটা, সব একসঙ্গে বুকফাটা কান্না শুরু করে দিয়েছে বাবাকে ঘিরে। চিত হয়ে শুয়ে হাত জপের ভঙ্গিতে বুকের উপর রেখে শান্ত সৌম্য মুখখানাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি নিয়ে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন বাবা।

পাখিরা ঘুম ভেঙে বিচিত্র কলরবে স্বাগত জানাচ্ছে নবারুণের উদ্দেশে। পুবের আকাশে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সবে একটুখানি আলোর আভাস দিয়েছে। বাবার মুখে শুনেছিলাম এই সময়টিকে ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে—ভাগ্যবান না হলে এই শুভ মুহূর্তে জন্ম-মৃত্যু হয় না।

ছোট ভাই রাজকুমার ছেলেমানুষ, বাড়িতে পুরুষ বলতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি দেখেই তিন-চারদিন আগে মামাকে খবর দিয়ে দেশ থেকে আনিয়েছিলাম। দেখলাম, ঘরের মাঝখানে বসে হাঁটুর উপর মুখ রেখে তিনিও কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন। বাবার বিছানার পাশে রাখা কাঠের একটা চৌকো বাক্স ছিল, ওতেই টাকাকড়ি দরকারি কাগজপত্তর সব থাকত। খুলে দেখি নগদ ও খুচরো মিলিয়ে টাকা-আড়াই এর বেশি বাক্সে নেই। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এ দিয়ে বাবার শেষ কাজ দূরে থাক, কাঠের খরচই কুলোবে না। চিন্তার সময় নেই— ছোট ভাইকে বাবার দেহ ছুঁয়ে বসিয়ে দিয়ে নিচে এসে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম।

পূর্ণ থিয়েটারের দক্ষিণের গা ঘেঁষে একটি চায়ের দোকান, নাম 'বেঙ্গল রেস্টুরেন্ট'। দোকানের মালিক সুধীর তরফদার আমার সহপাঠী। সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুধীর তখন সবে দোকান খুলে ধূপ-ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে দেওয়ালের র‍্যাকে বসানো গণেশের মূর্তিকে প্রণাম করছে। মুখ তুলতেই চোখাচোখি। কোনও কথা না বলে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল—'কত?'

এখানে একটু বলে রাখি, সুধীর বাবার অসুখের বাড়াবাড়ির কথা জানত। আমিও একটু আভাস দিয়ে রেখেছিলাম যদি হঠাৎ দরকার হয় কিছু টাকা প্রস্তুত রাখতে। বললাম, 'গোটা কুড়ি টাকা এখন দে, পরে দরকার হলে বলব।'

দ্বিরুক্তি না করে ক্যাশবাক্স খুলে দুখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে দিল সুধীর। সটান বাড়ি এসে মামার হাতে টাকাটা দিয়ে বললাম, 'কাছা ও থান কাপড়চোপড় যা দরকার কিনে আনুন। আমি সৎকারের লোক ডাকতে যাচ্ছি।'

বাবার রোগজর্জর অস্থিসার দেহটিকে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে ভস্মীভূত করে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন বেলা দুটো বাজে।

ঘরের মেঝেতে একখানা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আর একখানি মুড়ি দিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে যাব, নিচ থেকে পিওন্ হাঁকল—'রেজিস্ট্রি চিঠি বাবু!' বাবার নামে চিঠি, আসছে খুলনা লোন অফিস থেকে। যথারীতি সই করে চিঠি নিয়ে পড়ে দেখি—গত

কয়েক বছর ধরে বাবা কিছু কিছু ধার নিয়েছেন লোন অফিস থেকে, মাঝে মাঝে সুদের টাকা পাঠিয়েছেন, ওরাও চুপ করে আছে। গত তিন বছরের মধ্যে সুদ কিছুই দেওয়া হয়নি। ওদের সুদই পাওনা হয়েছে প্রায় পাঁচশ টাকা। চিঠি প্রাপ্তির পর থেকে সাত দিনের মধ্যে সমস্ত সুদ পরিশোধ না করে দিলে ওরা আইনের সাহায্যে দেশের সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে তা থেকে প্রাপ্য টাকা নিয়ে নেবে। ছোট বোনের বিয়ের সময় একটা মোটা টাকা ধার করতে হয়েছিল, তাছাড়া মাঝে মাঝে টিউশনি না থাকলে সংসারের খরচের জন্য কিছু কিছু ধার করতেন, জানতাম। কিন্তু এ যে একেবারে শিরে সংক্রান্তি! আমাকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে সের দরে বিক্রি করলেও কেউ পাঁচশ টাকা দেবে না। কী করি? অনেক ভেবেও কোনও কূল কিনারা পেলাম না।

রাত্রে ঘুম হল না। সারা রাত বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'এত শিগগির আমাকে এরকম কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন বাবা!'

সকালে একটু বেলায় নরেশদার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এসেছেন। থিয়েটারের অনুমতি পেয়েছি শুনে খুশি হলেন, বললেন, ' সামনের জানুয়ারি থেকেই তোমাকে দীপালি নাট্যসংঘে ভর্তি করে নেব।'

রেজিস্ট্রি চিঠিটা দেখালাম। পড়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন নরেশদা, বললেন, 'তাইতো, ভাবনার কথা। একটা কাজ তুমি করতে পার, অফিসে রুস্তমজী সাহেবকে একবার বলে দেখতে পার।'

ম্লান হেসে বললাম, 'সব শুনে সাহেব যদি চটে গিয়ে চাকরিটাই খতম করে দেন?'

একটু ভেবে নরেশদা বললেন, 'খানিকটা রিস্ক অবিশ্যি আছে। কিন্তু এছাড়া আর কোনও উপায়ও তো দেখতে পাচ্ছি না।'

আগের দিন একগ্লাস মিছরির জল ছাড়া কিছুই খাইনি। গঙ্গায় স্নান করে তাড়াতাড়ি হবিষ্যি রান্না করে খেয়ে খালি পায়ে অশৌচের কাপড়চোপড়ের উপর একটা র‍্যাপার চাপা দিয়ে ধর্মতলার ট্রামে উঠে বসলাম।

প্রকাণ্ড দরদালানের মতো লম্বা ঘর, সামনেটা বিলিতি মদের দোকান। দক্ষিণের শেষ প্রান্তে কাঁচের পার্টিশন দেওয়া অফিস। পার্টিশনের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। অগুনতি লোক ভেতরে যাচ্ছে আসছে। মুখ খুলে কথা কইবার অবসর নেই সাহেবের। বেশ খানিকটা দমে গেলাম। বেলা প্রায় একটার সময় ভিড় একটু কমল, ভেতরে যাব কি যাব না ইতস্তত করছি, দেখি পার্টিশনের দিকে চেয়ে হাত ইশারায় কাকে ডাকছেন রুস্তমজী সাহেব। আশেপাশে চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। দুরু-দুরু বক্ষে আস্তে আস্তে পার্টিশনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাহেবের এত কাছে এর আগে আসবার সৌভাগ্য হয়নি। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, দুধের মতো সাদা ঘন গোঁফ। চুল, এমনকি ভুরু

দুটো পর্যন্ত সাদা। প্রকাণ্ড ভারী মুখ, তীক্ষ্ণ নাকের উপর সোনার চশমা, তারই ভেতর দুটো উজ্জ্বল অনুসন্ধানী চোখ। রাশভারি লোক—হঠাৎ কাছে গেলে ভয়ের সঙ্গে কেমন একটা শ্রদ্ধাও এসে পড়ে। আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সাহেব বললেন, 'ব্যাপার কী?'

শুনেছিলাম রুস্তমজী সাহেব বাংলা পরিষ্কার বুঝতে পারেন, ভাল বলতে পারেন না। বাবার অসুখ থেকে শুরু করে আমার মাইনের কথা, খুলনা লোন অফিসের দেনার কথা সব একনিশ্বাসে বাংলায় বলে গেলাম। সব শুনে সাহেব একটুখানি চুপ করে কী যেন ভাবলেন। কম্বলের আসনে মোড়া রেজিস্ট্রি চিঠিখানা বার করে সাহেবের সামনে ধরলাম। হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে সাহেব ইংরেজিতে বললেন, 'ঘন্টাখানেক বাদে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

পার্টিশন ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। এক ঘন্টা কোথায় কাটাই? পাশেই কোরিন্থিয়ান থিয়েটার, ঢুকে পড়ে একখানা গদিমোড়া চেয়ারে কম্বলের আসন বিছিয়ে বসে পড়লাম। একটা উর্দু নাটকের রিহার্সাল হচ্ছিল। স্টেজের উপর দেখলাম মাস্টার মোহন ও মিস শরিফাকে। তখনকার দিনে মাস্টার মোহন শিশিরবাবু ও দানীবাবুর মতো হিন্দি নাট্যজগতে অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন—মাইনে পেতেন দেড় হাজার টাকা। নাটকটির নাম বা বিষয়বস্তু কিছুই মনে নেই, শুধু আবছা সিনটা মনে আছে। নায়ক মাস্টার মোহন ওথেলোর মতো নায়িকা শরিফার চরিত্রে সন্দিহান হয়ে যা-তা কটূক্তি করে শেষকালে যাবার সময় বলে গেলেন যে, তার মতো কুলটার আত্মহত্যা করে মরাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ। বেশ প্রাণবন্ত অভিনয় করে গেলেন মাস্টার মোহন। তাঁর প্রস্থানের পরই গান ধরলেন নায়িকা শরিফা। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এটা কী করে, কোন যুক্তিবলে সমর্থন করলেন নাট্যকার ও পরিচালক! বিদুৎ ঝলকের মতো তখনই মনে পড়ে গেল, শুধু হিন্দি বা উর্দু নাটকে নয়, আমাদের বাংলাতেও তো এরকম হয়। 'চন্দ্রশেখর' নাটকে দলনী বেগমের সিনটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। দলনীকে বিষ দিয়ে বলা হল, নবাব স্বয়ং পাঠিয়েছেন এই বিষ তার জন্যে। হাতে নিয়ে বিষ পান করবার আগে দলনী বেগম গাইলেন সেই বিখ্যাত গান—'আজু কাঁহা মেরি, হৃদয়কি রাজা।' একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঁকি মেরে চাইলাম মদের দোকানের বড় দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে। দুটো বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পার্টিশনের পাশে দাঁড়ালাম। দেখলাম লোকজন কেউ নেই। রুস্তমজী সাহেব মুখ নিচু করে খাতায় কী লিখছেন।

নমস্কার করে কাছে দাঁড়াতেই মুখ না তুলে সাহেব হাত ইশারায় টেবিলের উপর রাখা সাদা একটা খাম দেখিয়ে বললেন, 'টেক দ্যাট এন্ড গো হোম।'

কাঠের পুতুলের মতো খামটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। অদম্য কৌতূহল বাড়ি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হল না।

দোকান থেকে বেরিয়ে অপেক্ষাকৃত একটা নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে খামটা ছিঁড়ে ফেললাম। ভিতরে রয়েছে পাঁচখানা কড়কড়ে নতুন একশ টাকার নোট। সারা দেহের উপর দিয়ে একটা অজানা শিহরণ বয়ে গেল। তখনি আবার অন্য একটা চিন্তায় ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। এই টাকাটা যতদিন না শোধ হয় ততদিন যদি মাইনে বন্ধ হয়ে যায়? তাহলে? ভাবতেও সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। একটু ইতস্তত করে আবার পার্টিশনের পাশে এসে দাঁড়ালাম। ভেতরে নরেশদা সাহেবের সঙ্গে হেসে কী একটা আলোচনা করছেন। যা থাকে কপালে, সাহসে ভর করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। সাহেবের কাছে একনিশ্বাসে বলে গেলাম,'স্যার, মাসে মাসে কিছু কিছু করে এই টাকাটা কাটলে আমার সুবিধা হয়, নইলে একসঙ্গে কেটে নিলে—'

আর বলতে পারলাম না। চিৎকার করে উঠলেন রুস্তমজী, 'তোমাকে আমি অনেকক্ষণ আগে বাড়ি যেতে বলেছি। এখনও এখানে কী করছ?'

উত্তরে কিছু বলতে গেলাম। ধমক দিয়ে সাহেব বললেন,'কোনও কথা শুনতে চাইনা। গেট আউট।'

নরেশদাও ইশারা করে বাইরে যেতে বললেন। রীতিমত আশাহত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সামনে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। আধঘন্টা বাদে নরেশদা বেরিয়ে এলেন। আমায় দেখে হেসে বললেন, 'বাড়ি যাওনি এখনও?'

বললাম, 'সাহেব হঠাৎ রেগে গেলেন কেন নরেশদা?'

—'নাঃ, তোমায় বুদ্ধিটা ভগবান একটু কমই দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। সাহেবও সেই কথা বললেন।'

নিজের মনকে প্রশ্ন করলাম, 'দ্বিতীয়বার সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে সটান বাড়ি চলে এলেই বুদ্ধিমানের কাজ হত কি?'

নরেশদা বললেন, 'তোমার কথাই আলোচনা হচ্ছিল সাহেবের সঙ্গে। দুর্গাদাস ঝগড়া করে চলে যাবার পর সাহেব বেশ একটু দমে গেছেন। আমায় বলছিলেন— দেখ না মিটার, ছেলেটাকে যদি মানুষ করতে পার, চেহারায় দুর্গার সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য আছে, তবে দুষ্টু বুদ্ধিতে দুর্গার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। আরও অনেক কথা হল। এখন মাস দুই আমার 'নৌকাডুবি' বন্ধ।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কেন নরেশদা?'

—'সত্যিই তোমার মগজে বুদ্ধির একান্ত অভাব।'

চুপ করে আছি দেখে নরেশদাই বললেন, 'বুদ্ধির ঢেঁকি, আর কয়েকদিন বাদেই তোমার বাবার শ্রাদ্ধে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে। তারপর ঐ ন্যাড়া মাথা নিয়ে রমেশের পার্ট করবে কী করে? কাজেই আবার যতদিন না মাথায় চুল গজায় ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কী!'

মনে মনে সত্যিই লজ্জা পেলাম।

নরেশদা বললেন, 'সেই কথাই আলোচনা করতে সাহেবের কাছে এসেছিলাম। আমার ভয় ছিল, হয়তো বলবেন—অন্য লোককে রমেশের পার্ট দিয়ে শুটিং চালিয়ে যাও। কিন্তু সাহেব নিজে থেকেই বললেন—তোমার হিরো খানিক আগে এসেছিল; ওর বিপদের কথা সব শুনেছি। মাস দুই শুটিং বন্ধ রাখ, আর ওকে বলে দিও মাসের তিন তারিখে শুধু মাইনে নিতে আফিসে আসতে।'

দ্বিধাভরে বললাম, 'কিন্তু এই পাঁচশ' টাকার কী ব্যবস্থা হবে?'

একটু হেসে নরেশদা বললেন, 'এরকম গোপন দান রুস্তমজীর অনেক আছে। এ নিয়ে হৈচৈ করলে সাহেব ভীষণ চটে যান। তাইতো টাকার কথা বলতেই চটে উঠলেন। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যাও। ও টাকা কোনো দিনই তোমার মাইনে থেকে কাটা হবে না।'

জাহাঙ্গীর সাহেবের বেয়ারা এসে বলল, 'সাহেব সেলাম দিয়েছেন।' তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেলেন নরেশদা।

ফুটপাথ থেকে দু'তিন পা পুব দিকে এগিয়ে গেলেই মদের দোকানের সামনে পড়া যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো প্রকাণ্ড লম্বা ঘর। শেষ প্রান্তে কাচের পার্টিশন। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা না গেলেও আবছা দেখা যায়, কালো পার্শি কোট ও টুপি মাথায় রুস্তমজী সাহেবকে। একদৃষ্টে চেয়ে মনে মনে ভাবলাম, এ যুগে এরকম মনিবও আছে?

বোধহয় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, দেখলাম চেনা-অচেনা অনেকেই বেশ একটু অবাক হয়ে চাইতে চাইতে যাচ্ছেন।

আমাদের পাড়ার একটি ভদ্রলোক—মুখের চেনা পরিচয়, বিশেষ আলাপ ছিল না, তিনি যেতে যেতে থমকে আমার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মিনিটখানেক নীরবে একবার আমার দিকে একবার দোকানের প্রবেশপথের দুধারে কাঁচের শো-কেসে রাখা রঙ-বেরঙের বিলিতি মদের বোতলগুলোর দিকে চেয়ে বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'এখনও অশৌচ কাটেনি, এর মধ্যেই কথামালার শৃগালের মতো দ্রাক্ষাফলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছ, ছিঃ!' উত্তরের অপেক্ষা করলেন না ভদ্রলোক, হনহন করে এগিয়ে বোধহয় এই মুখরোচক খবরটা পাড়ার চেনা-অচেনা সবাইকে পরিবেশন করবার জন্যই গেলেন।

রুস্তমজীর কথাই সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ছিল, চেষ্টা করেও অন্য কিছু ভাবতে পারছিলাম না। ধর্মতলায় এসে কালীঘাটের ট্রামে উঠে বসলাম। গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে হুহু করে ছুটে চলেছে ট্রাম, মনটাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে বাড়ির দিকে।

খুলনা লোন কোম্পানির সমস্ত সুদের টাকা শোধ করে বছরের মত নিশ্চিন্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। পাঁচশ' টাকার সবটা লাগেনি, পঁচিশ ত্রিশ টাকা বাঁচল। সেই

টাকায় আর দীপালি নাট্যসংঘের একমাসের অগ্রিম পঁচাত্তর টাকা নিয়ে যথাসময়ে বাবার পারলৌকিক কাজ শেষ করলাম। এ ক'দিন কিছু ভাববার সময় পর্যন্ত পাইনি। এইবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে সব দিক বেশ করে ভেবে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দুপুরবেলায় উপরের ঘরে শুয়ে এইসব চিন্তা করছি, ছোট ভাই এসে বলল, 'বাড়িওয়ালা লালবিহারীবাবু নিচের ঘরে বসে আছেন।' এদিকটা একদম ভেবে দেখিনি। মাথায় নতুন করে আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাড়িওয়ালা লালবিহারী মুখোপাধ্যায় কলকাতার কাছে বৈদ্যবাটীতে বাস করতেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। ছ'ফুট লম্বা জোয়ান চেহারা, মুখে অল্প দাড়ি ও গোঁফ। সদালাপী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার। পেনসন নিয়ে বাড়িতেই বসে থাকেন। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে সকালে আমাদের বাড়িতে এসে দুপুরে খেয়েদেয়ে বাড়িভাড়া নিয়ে বৈদ্যবাটী ফিরে যেতেন। বাবা ওঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন এবং দাদা বলে ডাকতেন। সেই সুবাদে আমরা সবাই জ্যাঠামশাই বলে ডাকতাম। বাবার অসুখের তিন-চার মাস কি আরও বেশিদিন থেকে উনি আসেন না।

তাড়াতাড়ি উঠে নিচে নেমে গিয়ে প্রণাম করে পাশে বসলাম। মামুলি কুশল প্রশ্নাদির পর একটু ইতস্তত করে কথাটা উনিই পাড়লেন।—'বাবা ধীরাজ, তোমার এই দুঃসময়ে কথাটা তুলতে লজ্জা হচ্ছে আমার। কিন্তু বাবা জানতো, বাড়িতে একগাদা পোষ্য। সম্বল মাত্র পেনশনের কটি টাকা আর এই বাড়িভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। তাও আজ এগারো মাস পাইনি।'

বাড়িভাড়ার ব্যাপারে কোনও দিন মাথা ঘামাইনি, আর বাবাও সে সম্বন্ধে কোনওদিন কিছু বলেননি আমাকে। কিন্তু এগারো মাস বাড়িভাড়া দেওয়া হয়নি এটা কল্পনাতীত। কী উত্তর দেব, মুখ নিচু করে বসে রইলাম।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'জানি বাবা, এখন তোমার পক্ষে এক মাসের ভাড়া দেওয়াও অসম্ভব। আর সেজন্যও আমি আসিনি। তুমি যদি কিছু মনে না কর—'

কথাটা শেষ করলেন না জ্যাঠামশাই, কেমন একটা সঙ্কোচ এসে বাধা দিল। বললাম, 'আপনি বলুন জ্যাঠামশাই, আমি জানি, আপনি যা বলবেন আমার ভালর জন্যই বলবেন।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'বাড়িভাড়া তোমার সুবিধা মতো যখন পার কিছু কিছু করে দিও, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা বাড়িভাড়া দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব কি? সেইজন্যে আমি বলছিলাম, তুমি যদি অল্প ভাড়ার একটা বাড়ি দেখে উঠে যেতে, তাহলে আমাদের দুপক্ষেরই সুবিধা হত।'

খুব যুক্তিপূর্ণ কথা। এদিক দিয়ে একেবারে ভেবে দেখিনি। বললাম, 'তাই হবে জ্যাঠামশাই, এ মাসের শেষ দিকে আমি বাড়ি ছেড়ে দেব, বাকি ভাড়া প্রতি মাসে

কিছু কিছু করে দেব।'

ঐ পাড়াতেই বলরাম বোসের ঘাটের কাছেই দুখানা টিনের ঘর পাওয়া গেল। মাটির দেওয়াল। মেঝে ও রক সিমেন্ট করা, সামনে ছোট্ট একফালি উঠোন, পুবদিকে একটা এঁদো পুকুর। বড় রাস্তা বলরাম বোস ঘাট রোড, থেকে একটা সরু গলি বেয়ে খানিকটা এসে বাড়িটা। রান্নাঘর নেই, দাওয়ার একপাশ ঘিরে রান্নাঘর করতে হবে। কোনো দিক দিয়েই পছন্দ হবার কথা নয়, শুধু ভাড়াটা ছাড়া। এগারো টাকা ভাড়া। দীপালি নাট্যসংঘ আর আমার বাড়তি মাইনেতে এর চেয়ে ভাল বাড়ি নিতে পারতাম। কিন্তু মা বললেন, 'না। কম ভাড়ার বাড়ি নিয়ে আগে তোমার জ্যাঠামশাইয়ের বাকি পড়া ভাড়া শোধ কর।' তাই করলাম।

আর. সি. এ. মেসিন, সঙ্গে তিনজন বিশেষজ্ঞ অবশেষে সত্যিই এসে পড়ল। স্টুডিওতে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। শুটিং সব বন্ধ। মাসের তেসরা তারিখে শুধু খাতায় সই করে মাইনে নিতে হেড আফিসে যাই। বলা বাহুল্য, মাইনে থেকে রুস্তমজী সাহেবের দেওয়া টাকার এক পয়সাও কাটা হয়নি। কাজকর্ম নেই, সময় আর কাটতে চায় না। ছোট একটা ছিপ জোগাড় করে দুপুরবেলা এঁদো পুকুরের পাড়ে বসে পুঁটি মাছ ধরে সময় কাটিয়ে দিই।

দু' তিনদিন পরের কথা। সেদিনও যথা নিয়মে পুঁটি মাছের বংশক্ষয়ে মনোনিবেশ করে ছোট্ট ফাতনাটার দিকে চেয়ে বসে আছি, মনে হল, বাইরের রাস্তা থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। নেহাত অনিচ্ছায় উঠে অন্ধকার গলির পথ পেরিয়ে বলরাম বোসের ঘাট থেকে রোডে পড়েই দেখি, আশেপাশে বাড়িগুলোর জানলা-দরজায় বেশ লোক জড়ো হয়েছে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখুজ্যে খালি বলে চলেছে, 'বলতে পারেন এখানে কোন বাড়িতে ধীরাজ উঠে এসেছে?' আগের বাড়িতে যারা এসেছে তারা বলল, 'ঘাটের কাছাকাছি বস্তিতে উঠে গেছে।'

হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে কাছে এসে বলল, 'এই যে নদেরচাঁদ, এরকম আত্মগোপন করে থাকার হেতু?'

হেসে বললাম, 'অবস্থার ফেরে পাণ্ডবদেরও আত্মগোপনের প্রয়োজন হয়েছিল, আমি তো কোন ছার।'

—'থাক, আর কবিত্ব করে কাজ নেই। এখন ভেতরে চল দেখি, কথা আছে।' বলে একরকম আমাকে ঠেলে নিয়ে যায় আর কী। মহা লজ্জায় পড়লাম। মাত্র দুখানি পায়রার খোপের মতো ঘর, জিনিসপত্তরই সব ধরে না, সেখানে নিয়ে বসাব কোথায়!

আমায় ইতস্তত করতে দেখে মুখুজ্যে বলল,'ব্যাপার কী, বাড়ি নিয়ে যেতে

আপত্তি আছে নাকি?'

বললাম, 'না না, তা নয়, মানে সবে এসেছি। জিনিসপত্তর চারদিকে ছড়ানো—তার মধ্যে—'

'বুঝেছি।' বলে চারদিকের কৌতূহলী লোকগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল মুখার্জি, 'যাই বল ভাই, তোমার পাড়াটি কিন্তু মোটেই সুবিধার নয়। তোমার আগের বাড়িতে যাঁরা এসেছেন তাঁরা তো ঠিকানা বললেনই না, অধিকন্তু ঠাট্টা করে বললেন—বস্তিটস্তির ভেতর খুঁজে দেখুন, পেয়ে যাবেন।' গলাটা একটু নিচু করে চোখ ইশারায় আশেপাশের লোকগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'এঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, শুধু মুচকি হেসে বলে দিলেন—ডাকাডাকি করুন, পাওনাদার না হন তো বেরিয়ে আসবে। হতো আমার পাড়া—।'

কথাটা চাপা দেবার জন্যে বললাম, 'এসো, এক কাজ করা যাক। সামনেই বলরাম বোসের ঘাট। দুপুরবেলা, এখন লোকজন কেউ নেই। চল না, ঐখানে বসেই কথাবার্তা বলি।'

খুব খুশি হল না মুখুজ্যে। দুজনে গিয়ে ঘাটের ডান দিকের উঁচু সিমেন্টের চাতালটার উপর বসলাম। একটু চুপ থেকে বললাম, 'মুখুজ্যে, প্রকাণ্ড বটগাছের আড়ালে বসে এতদিন বাইরের ঝড়ঝাপটার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানতে পারিনি। দুনিয়াটাকে ভাবতাম রঙিন স্বপ্নে ভরা। সেই দুনিয়ার ছায়াছবির নায়ক হবার স্বপ্ন দেখতাম ছেলেবেলা থেকে। ঝড়ে পড়ে গেছে বটগাছ, সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে খসে পড়েছে রঙিন স্বপ্নের ঠুলি।'

কী একটা বলতে যাচ্ছিল মুখুজ্যে। বাধা দিয়ে বললাম, 'কথাগুলো শেষ করতে দাও আমাকে। আমার বাবা টাকাকড়ি কিছুই রেখে যাননি, রেখে গেছেন একরাশ দেনা। সে দেনা শোধ করতে হলে বস্তিতে বাস করা ছাড়া আমার অন্য রাস্তা খোলা নেই।' কথা শেষ করে ভাঁটায় চড়া পড়া মরা গঙ্গার দিকে চেয়ে রইলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, মুখুজ্যে একটু লজ্জায় পড়ে গেছে। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্যে একটু পরে আমি বললাম, 'তারপর? কী কথা বলবে বলছিলে?'

যেন বেঁচে গেল মুখুজ্যে, বলল, 'একসেলেন্ট ! চমৎকার পার্ট হয়েছে তোমার 'কালপরিণয়ে'। এডিটিং শেষ করে কাল রাত্রের শো-এর পর এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে দেখা হল ছবিটা। রুস্তমজী, বজজরজী, জাহাঙ্গীরজী, নরেশদা, গাঙ্গুলীমশাই, সবাই দেখেছেন। সবাই একবাক্যে তোমার সুখ্যাতি করলেন। সামনের শনিবারে 'ক্রাউনে' রিলিজ, যেও কিন্তু!'

হেসে বললাম, 'এই ন্যাড়া মাথা নিয়ে?'

—'তাতে কী হল, একটা খদ্দরের গান্ধী-ক্যাপ পরে যেও। এবার আসল কথাটা

শোন।'

পকেট থেকে কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা আমায় দিয়ে নিজে ধরাল একটা। আসল কথাটা শোনবার জন্যে মুখুজ্যের দিকে চেয়ে চুপ করে সিগারেট খেতে লাগলাম।

নিঃশব্দে সিগারেটে কয়েকটা সুখটান দিয়ে মুখুজ্যে বলল, 'শোন, কাল একবার স্টুডিওয় যেও। বিশেষ দরকার।'

বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, 'ব্যাপার কী মুখুজ্যে?'

—'ব্যাপার গুরুতর! কাল সব বড় বড় আর্টিস্টদের ডাক হয়েছে স্টুডিওতে।'

আবার বললাম, 'ব্যাপার কী মুখুজ্যে?'

বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার চালে মুখুজ্যে বলল, 'ভয়েস টেস্ট।'

—'ভয়েস টেস্ট! তার মানে?'

—'টকিতে কার গলা কীরকম আসে দেখে নেওয়া হবে। মাইক্রোফোনের কাছে চালাকি চলবে না। যাদের গলা ভাল রেকর্ড করবে না, তারা খতম।'

ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, 'কালকে কার কার গলার টেস্ট নেওয়া হবে?'

গড়গড় করে বলে গেল মুখুজ্যে, 'অহীন্দ্রবাবু, দুর্গাদাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নরেশদা, তুমি, নির্মল লাহিড়ী, হাঁদুবাবু, কার্তিকবাবু, জয়নারায়ণ মুখুজ্যে, আরও অনেক অভিনেতার। মেয়েদের মধ্যে তোমাদের 'নৌকাডুবি'র ব্যাচের শান্তি গুপ্তা, সুনীলা, তাছাড়া ললিতা দেবী, পেশেন্স কুপার আর তার তিন বোন, সীতা দেবী, ইন্দিরা দেবী, আরও একগাদা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে।'

অবাক হয়ে বললাম,'অ্যাংলো মেয়েগুলো কেন মুখুজ্যে? ওরাও কি বাংলা ছবিতে —'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুখুজ্যে বলল—'হিন্দি হিন্দি! বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে ছবি হবে। ফিরিঙ্গিপাড়ায় গিয়ে দেখ ইংরেজি কিচিরমিচির নেই। মুন্সী রেখে সবাই উর্দু পড়তে শুরু করেছে—আলেফ বে পে তে — !'

ফেল! ফেল করলাম ভয়েস টেস্টে। একা আমি নই, অনেকেই। অহীনদা, নরেশদা, গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, আরও ছোটখাটো অনেকে। ফুল মার্ক পেয়ে পাস করলেন দুর্গাদাস আর জয়নারায়ণ মুখুজ্যে। মেয়েদের সবাই পাস। ভীষণ দমে গেলাম। সবাক ছবির শুরুতেই এরকম অবাক হব ভাবতেও পারিনি। যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নাটকে রামের পার্টে বহুবার সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছি। তা থেকে একটা ইমোশান্যাল সিন অভিনয় করলাম নিষ্ঠুর মাইক্রোফোনের সামনে, কিছুই হল না। ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, নির্বাক 'গিরিবালা', 'কালপরিণয়ে'র সমস্ত নাম-যশ নিঃশেষে ধুয়ে মুছে দেবে নাকি ঐ এক ফোঁটা মাইক্রোফোন?

এক নম্বর ফ্লোরের পাশে নির্জনে একখানা বেঞ্চের উপর বসে আলোর আশায় অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে বসে আছি, কোথা থেকে মনমোহন এসে হাজির। আমায় দেখতে পেয়েই হাসতে হাসতে গায়ের উপর পড়ে আর কী! কোনও রকমে ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিতেই হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'মজা দেখবি আয়।' ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম, 'মজা দেখবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই।'

হাসি থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে ঝুঁকে মনমোহন বলল, 'ফেল করেছিস বুঝি?'

হেসে ফেললাম। বললাম, 'পাশ করলেও তোর হাসি কানে মধু বর্ষণ করত না।'

পাশে বসে পড়ে পান-দোক্তা মোড়া একটা কাগজ বার করল মনমোহন।

বললাম, 'যেখানেই কিছু একটা অঘটন ঘটার সম্ভাবনা, যাদুমন্ত্রে তোর আবির্ভাব। তা এবার মজার ব্যাপারের বিষয়বস্তুটি কী?'

বোধহয় ভুলে গিয়েছিল, মনে করিয়ে দিতেই থু থু করে গালের পান-দোক্তা ফেলে দিয়ে হাসতে শুরু করল মনমোহন। ওরই মধ্যে একটু দম নিয়ে অতি কষ্টে বলল, 'তোর মৈনাক পর্বত ঘাড়ে করে জাল সাহেব এসেছে টেস্ট দিতে।'

জাল-গুলজার কাহিনীর যবনিকা নির্বাক যুগেই পড়বে ভেবেছিলাম। সবাক যুগেও তার জের টানা হবে ভাবতে পারিনি। রীতিমত কৌতূহল হল, বললাম, 'চল মনু, এ কথা আগে বলতে হয়।'

দুজনে ফ্লোরে ঢুকতে গিয়ে দেখি, দরজা বন্ধ। জাল সাহেবের হুকুম, কেউ ভেতরে থাকবে না। বহুদিনের পুরোনো ওড়িয়া সেটিং কুলি উছুবা দরজার সামনে গম্ভীরভাবে টুল পেতে বসে জাল সাহেবের হুকুম তামিল করছে। হতাশ ভাবে তাকালাম মনমোহনের দিকে। দুষ্টু বুদ্ধি মনমোহনের হাতধরা। পকেট থেকে আলাদিনের প্রদীপের মতো পান-দোক্তা মোড়া কাগজের ঠোঙাটা বার করে তা থেকে দুটো পান নিয়ে আশেপাশে চকিতে চোখ বুলিয়ে উছুবার হাতে গুঁজে দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল। নিমেষে উছুবার গোমড়া মুখ হাসিখুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা সন্তর্পণে প্রায় ইঞ্চিচারেক ফাঁক করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। আমাকে ইশারায় কাছে ডাকল মনমোহন, তারপর দু'জনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সেই চার ইঞ্চি ফাঁকে। মনমোহন নিচে, আমি উপরে।

আকাশের রামধনুতে আর শিল্পীর তুলিতে যতগুলো রং নজরে পড়ে সবগুলো একসঙ্গে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে গুলজার বেগমের পোশাকে। পাঞ্জাবী পোশাক, কিন্তু এমন বিচিত্র রুচিহীন রঙের খেলা কদাচিৎ দেখা যায়। কয়েক মাস আগে চেয়ারে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম, আজ মনে হল গুলজার আরো লম্বা, আরো মোটা। ওর পাশে জাল সাহেবকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন হাতির পাশে নেংটি ইঁদুর। দেখলাম, গুলজার বেগম জাল সাহেবের দিকে কাত হয়ে কী যেন শোনবার চেষ্টা করছে, আর লাফানোর ভঙ্গিতে মুখ তুলে এক-একটা কথা ছুঁড়ে মারছে জাল সাহেব গুলজারের

কানে। হাসি সামলানো কঠিন। আড়-চোখে মনমোহনের দিকে চাইলাম, ওর সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। চিমটি কেটে সাবধান করে দিলাম।

ঘন্টা বাজল। এইবার টেস্ট নেওয়া হবে। বাইরে এক নম্বর ফ্লোরের দক্ষিণ কোণে ইলেকট্রিক ঘন্টা আর্তনাদ করে উঠে আশেপাশের সবাইকে সাবধান করে দিল কথা না কইতে বা কোনও আওয়াজ না করতে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, শুরু হল টেস্ট। মোটা একখানা খাতা খুলে পাশ থেকে জাল সাহেব ইশারা করলেন গুলজারকে।

মেয়েছেলের গলায় একসঙ্গে তানপুরার মতো চারটে আওয়াজের খেলা এর আগে শুনিনি। দুর্বোধ্য উর্দুতে বীররসের অভিনয়। চোখ পাকিয়ে দু'হাতে ঘুষি বাগিয়ে গুলজার যেন কোনও অদৃশ্য আততায়ীর মৃত্যু পরোয়ানা জারি করছে। ডায়লগ আর শেষ হয় না, মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে জাল সাহেব কথার সূত্র ছুঁড়ে মারছেন ওর কানে। কিছুক্ষণ এই ভাবে চলার পর ঘন্টা বেজে উঠল। পাশের দরজা দিয়ে রেকর্ডার মিঃ লাইফোর্ড বেশ রাগতভাবে ওদের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ' ক'জনের ভয়েস টেস্ট নেওয়া হচ্ছে?'

জাল সাহেব ইশারা করে গুলজার বেগমকে দেখিয়ে দিলেন।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে লাইফোর্ড বললেন, 'নো, আমি পরিষ্কার দু'জনের গলা পাচ্ছি।'

জাল সাহেব স্বীকার করবেন না, লাইফোর্ডও ছাড়বেন না। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতির উপক্রম। জাল সাহেবের ধারণা, চুরি করে আস্তে আস্তে যে কথাগুলো গুলজারকে প্রম্পট করেছেন সেগুলো রেকর্ড হতেই পারে না। ব্যাপার হয়তো আরও অনেক দূর গড়াত। শেষ পর্যন্ত দেখবার বা শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হল না। উছুবা তাড়াতাড়ি দরজার ফাঁক বন্ধ করে দিয়ে বলল, ' ফ্রামজী সাহেব আর দু'জন সাহেবকে নিয়ে এদিকেই আসছেন।'

একটু দূরে গিয়ে একখানা বেঞ্চিতে আমি আর মনমোহন বসলাম। একটু পরে ঘন্টা দিয়ে আবার শুরু হল টেস্ট। মনমোহনকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোর কী মনে হয়, গুলজার বেগম ভয়েস টেস্টে পাস করবে?'

পান খেতে খেতে জবাব দিল মনমোহন, 'শিওর! এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করছিস?'

হতাশভাবে বললাম, 'ঐ গলা যদি মাইকের উপযোগী হয় তাহলে আমাদের ফেল করিয়ে দিল কেন?'

আবার শুরু হল মনমোহনের হাসি। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম। উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। সবাই ব্যস্ত। দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড বাজে গল্প করার সময় নেই কারো। উত্তরদিকে শুরু হয়েছে আরও একটা ফ্লোর, রাতদিন মিস্ত্রী খাটছে।

শুনলাম, বিশেষজ্ঞরা এসে এক নম্বর ফ্লোর সবাক ছবি নেবার উপযুক্ত নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। ওখানে থাকবে আর. সি. এ. মেশিন, ক্যামেরা এবং আর সব যন্ত্রপাতি। মিস্ত্রিদের খটখটাখট আওয়াজ, কুলিদের হৈহল্লা, তার মাঝে হঠাৎ বেজে উঠছে চুপ করবার ঘন্টা। দু'তিন মিনিট সবাই চুপচাপ, আবার যে কে সেই। স্টুডিওটাকে মনে হল কুম্ভকর্ণ। এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, আজ ঘুম ভেঙে শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। আপনা হতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, ভাবলাম, বেল পাকলে কাকের কী? এই মুখর রাজ্যে সবাই জয়যাত্রার গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যাবে, আর আমি শুধু মূক দর্শক হয়ে রাস্তার একপাশে নিষ্ফলের হতাশের দলে পড়ে থাকব। তখনি মনে পড়ল, আমি শুধু একা নই, সঙ্গে বড় বড় বাঘ-ভাল্লুকও আছে, তাদের যদি একটা ব্যবস্থা হয় তো আমারও হবে। জোর করে মনটাকে প্রফুল্ল রেখে বাড়ি চলে এলাম।

বলতে ভুলে গেছি যে, এরই মধ্যে ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দীপালি নাট্যসংঘের সঙ্গে কলকাতার কাছাকাছি তিন-চারটে জায়গায় অভিনয় করে এসেছি। শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, ধানবাদ, নৈহাটি—এই চারটে জায়গায় অভিনয় হল 'জয়দেব', 'সরলা', 'প্রতাপাদিত্য', 'কর্ণার্জুন'। সঙ্গে প্রহসন 'রেশমি রুমাল', 'তুফানি', 'রাতকানা' ইত্যাদি। এছাড়া নৃত্যগীতবহুল ' আলিবাবা' আর 'বসন্তলীলা'ও চাহিদানুযায়ী অভিনয় হত। তখনকার দিনে একখানা পুরো পঞ্চাঙ্ক নাটকের সঙ্গে একখানা প্রহসন না হলে শ্রোতার মন ভরত না। আজকাল আড়াই ঘন্টা, বড় জোর তিন ঘন্টার বেশি অভিনয় হলে শ্রোতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়।

যাত্রীবাহী একখানা বড় বাস রিজার্ভ করে বেলা দুটো নাগাদ কলকাতা থেকে সদলবলে বেরিয়ে পড়তাম। মেয়ে-পুরুষ সবাই হৈহল্লা করতে করতে বেলা চারটে পাঁচটার মধ্যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যেতাম। একটু বিশ্রাম করে, চা-খাবার খেয়ে মেক-আপ শুরু করা হত। সাতটা সাড়ে সাতটায় প্লে আরম্ভ আর শেষ রাত্রি দুটো তিনটেয়।

মেক-আপ তুলে লুচি মাংস অথবা লুচি আলুর দম মিষ্টি খেয়ে আবার যখন বাসে উঠতাম তখন হয়তো রাত চারটে সাড়ে চারটে। বাড়ি পৌঁছতে বেশ বেলা হয়ে যেত। দুপুরে খেয়েদেয়ে কষে এক ঘুম দিয়ে বিকেলে আবার হাজির হতাম রিহার্সালে। শ্যামবাজার চৌমাথার মোড় থেকে একটুখানি পুবদিকে গেলেই আর. জি. কর রোড। ডান হাতের ফুটপাথের অসংখ্য দোকানের মাঝখানে সরু একফালি পথ, দু'পা এগোলেই পড়ে ৬নং বাড়িটা। সামনের সিঁড়ি বেয়ে বরাবর তিনতলায় উঠে গেলে দেখা যায় একটা দরজার মাথায় কাঠের সাইনবোর্ডে লেখা 'দীপালি নাট্যসংঘ'। উপরে দক্ষিণদিকের বড় হলটা রিহার্সাল রুম, বাকি দুটো ঘরে একটায়

আফিস, অন্যটায় ভিজিটার্স রুম।

ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছিলাম 'Lure of footlights' বা পাদপ্রদীপের মোহ। কথাটার সত্যিকারের মানে উপলব্ধি করলাম পর পর কয়েকটি অভিনয়ের পর। যাঁরা কখনও স্টেজে নামেননি তাঁদের কাছে কথাটা চিরদিন প্রবাদবাক্যই থেকে যাবে। চেষ্টা করলে আফিমের নেশাও হয়তো ছাড়া যায়, কিন্তু এ মোহে যাঁরা একবার পড়েছেন তাঁদের পক্ষে ঐ নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা খুব শক্ত।

এই একটি মাত্র জগৎ, যেখানে সবই সম্ভব। ঐকতানের পর রহস্যের কালো যবনিকা ধীরে ধীরে সরে গেল। চোখের সামনে ফুটে উঠল এক বিচিত্র জগৎ। এ জগতের অধিবাসী ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সবাই। যারা ঘুমিয়ে ছিল ইতিহাসের পাতায়, ছিল রামায়ণ মহাভারত কাব্য পুরাণের ছড়ায়, গাথায়, মানুষের কল্পনায়, আজ তারা একে একে সবাই বেঁচে উঠে সামনে দাঁড়িয়ে অকপটে বলে গেল তাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ প্রেম বিরহ আশা নিরাশার কাহিনী। মুগ্ধ তন্ময় দর্শক একভাবে কাটিয়ে দিল ঘন্টার পর ঘন্টা।

অভিনেতার স্বর্গরাজ্য হল স্টেজ। ঐ একফালি ছোট্ট রাজত্ব। যে কোনও বেশে এখানে একবার পদার্পণ করলেই সংসার ধর্ম সমাজ ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ শারীরিক অসুস্থতা যাদুমন্ত্রে সব ভুলিয়ে দেয়। রাজা থেকে শুরু করে ফকির সাধু, এমন কি চোর বদমাশ খুনে ডাকাত পর্যন্ত এই মায়াবিনী পাদপ্রদীপের সামনে এসে নিজেকে এ রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট বলে মনে করেন। সামনে আবছা আঁধারে অগণিত দর্শক। ওরা সবাই রাজভক্ত প্রজা। ওদের অগণিত পলকহীন চোখের লক্ষ্যবস্তু আমি। মূঢ় অজ্ঞান ওরা, আমি ইচ্ছে করলেই ওদের হাসাতে পারি, কাঁদাতেও পারি। বক্তৃতা দিয়ে এমন উত্তেজিত করে তুলতে পারি যে, ওরা উল্লাসে চিৎকার করে করতালি দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমায় সর্মথন করবে। আমি না পারি কী? মাত্র কয়েক ঘন্টার রাজাগিরি— সেই কি কম?

আমি একজন অভিনেতার কথা জানি। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় হচ্ছে। মাত্র দুটি অঙ্ক শেষ হয়েছে। তিনটি অঙ্ক বাকি। নাটকটি প্রায় উক্ত অভিনেতাকে কেন্দ্র করেই লেখা। প্রতিটি দৃশ্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করে দর্শক, কতক্ষণে তিনি অবতীর্ণ হবেন। এমন সময় বাড়ি থেকে এল খবর: তাঁর বড় ছেলে কী করে যেন দোতলার ছাদ থেকে পড়ে গেছে। মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাঁচবার কোনো আশাই নেই। এখুনি তাঁর একবার যাওয়া দরকার। খবর শুনে অভিনেতা দু'তিন মিনিট চোখ বুজে কী যেন ভাবলেন, তারপর চারপাশের কৌতূহলী সহকর্মীদের বিস্ময়ের সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'তুমি ফিরে যাও হাসপাতালে, আমি যাব অভিনয় শেষ হলে।'

সংবাদদাতা কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। সমুদ্র গর্জনের মত ভেসে এল

অগণিত অসহিষ্ণু দর্শকের সমবেত চিৎকার আর করতালি। মুহূর্তের জন্য সেইদিকে চেয়ে নিয়ে অভিনেতা বললেন, 'এতগুলো লোকের আনন্দ উল্লাসের মাথায় আমার ব্যক্তিগত দুঃখের লাঠি মেরে আমি যদি এখুনি তোমার সঙ্গে হাসপাতালে যাই, খোকা বেঁচে উঠবে?'

অদ্ভুত প্রশ্ন। সংবাদদাতা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

—'ভরসা করে বলতে পারলে না, কেননা তুমিও জান, হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় পথেই হয়তো সে মারা গেছে। খোকাকে বাঁচাতে পারব না, কিন্তু এদের আরও কয়েক ঘন্টা আনন্দ দিতে পারব। দু'দিক না হারিয়ে একদিক রাখি।' বলেই উত্তরের জন্য না দাঁড়িয়ে ঢুকে পড়লেন স্টেজে।

কয়েক মিনিট পরেই শুনতে পেলাম, দর্শকের মুহুর্মুহু আনন্দ উল্লাস ও করতালি। সারা বাড়ি থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল।

নির্দিষ্ট সময়ে অভিনয় শেষ হল। মেক-আপ রুমে এসে রং তুলে কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেললেন অভিনেতা। ব্যস, মোহময়ী পাদপ্রদীপের নাগপাশ ছিন্ন হল। কোথায় গেল সেই দৃঢ় মনোবল আর কোথায় পড়ে রইল সেই অকাট্য যুক্তি। সাধারণ বাপের মত ছেলের নাম ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চললেন তিনি হাসপাতালে মৃত ছেলের পাশে। অভিনেতা আর কেউ নন, স্বর্গীয় কার্তিকচন্দ্র দে, হাস্যার্ণব। শুধু আমাদের দেশেই নয়, খুঁজলে এ রকম নজির সব সভ্য দেশেই দু'চারটে পাওয়া যায়।

শ্রীরামপুর রেলস্টেশনের দক্ষিণ দিকে লাইনের গা ঘেঁষে যে প্রমোদাগারটি বর্তমানে 'শ্রীরামপুর টকিজ' সাইনবোর্ড গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিন আমাদের সম্প্রদায়ের অভিনয় হচ্ছিল সেখানে। 'সরলা' ও 'বসন্তলীলা'। সন্ধ্যে ছ'টা থেকে শুরু হয়ে পুরো পাঁচ ঘন্টায় শেষ হল 'সরলা'। বিশ্রাম ও রাত্রের ভোজন-পর্ব শেষ করে বারোটা থেকে 'বসন্তলীলা' আরম্ভ হবে। 'বসন্তলীলা' মূলত নৃত্যগীতবহুল নাটিকা। এর তিনটি প্রধান ভূমিকা—শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও বসন্তদূত। বারোটার অনেক আগেই বসন্তদূত ও শ্রীরাধা যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও মিস লাইট সেজে বসে আছেন, শ্রীকৃষ্ণের কোনো পাত্তাই নেই। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় নামবেন তখনকার জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা শ্রীধীরেন দাস। 'সরলা' নাটকে ধীরেনবাবুর কোনো ভূমিকা ছিল না। তাই কথা ছিল সন্ধ্যে থেকে অন্য এনগেজমেন্ট সেরে শেষ গাড়িতে রাত্রি এগারোটায় শ্রীরামপুরে পৌছবেন। ঠিক এগারোটায় সমস্ত বাড়িটা ভূমিকম্পের মতো কাঁপিয়ে হাওড়া থেকে শেষ গাড়ি এল, কিছুক্ষণ থেমে আবার সগর্জনে আমাদের নাড়া দিয়ে গন্তব্যপথে চলে গেল। কিন্তু কৃষ্ণরূপী ধীরেন দাসের দেখা নেই। কর্তৃপক্ষমহল, বিশেষ করে নরেশদা ও কেষ্টদা, বেশ নারভাস হয়ে পড়লেন। শুধু অভিনয় হলে যাকে হোক

নামিয়ে দিয়ে কাজ চালান যেত, কিন্তু 'বসন্তলীলা' গানের জন্য বিখ্যাত। কৃষ্ণেরই অন্তত ছয়-সাতখানি গান। এখন উপায়? পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শক বারোটার পর থেকেই গুঞ্জন শুরু করে দিয়েছে। তার উপর যদি জানতে পারে কেষ্ট নেই, ভাবতেও ভয় করে।

'সরলা'য় দু-তিন সিনের পুলিশ দারোগার পার্ট আমার ছিল। 'বসন্তলীলা'য় আমার ছুটি। মেক-আপ তুলে নিজের কাপড়জামা পরে দিব্যি পান খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, একজন এসে বলল, 'তোমায় কেষ্টদা ও নরেশদা ডাকছেন।' নরেশদা ও কেষ্টদা আলাদা একটা ছোট ঘরে মেক-আপ করতেন। বেশ একটু অবাক হয়েই তাঁদের ঘরে ঢুকে পড়ে দেখি নিঃশব্দে দু'জনে পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

সাড়া পেয়েই কেষ্টদা বললেন, 'ধীরাজ, এদিকে শোন।'

কাছেই একখানা বেঞ্চি ছিল—টেনে নিয়ে বসলাম। দু'জনেই চুপচাপ। নরেশদাও কিছু বলেন না, কেষ্টদাও না। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার কেষ্টদা, আমায় ডেকেছেন?'

ফোঁস করে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেষ্টদা বললেন, 'ধীরাজ, 'বসন্তলীলা' বইটা কতবার দেখেছিস?'

'তা চার-পাঁচ নাইট হবে।'

—'কেষ্টর প্রথম গানখানা—মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি, তোর মুখস্থ আছে?'

—'আছে।'

—'ব্যস্ আর কিছু চাই না। চটপট কেষ্ট সেজে নে।'

আঁতকে উঠে দাঁড়ালাম। হাত ধরে জোর করে বসিয়ে কেষ্টদা বললেন, 'অন্য গানগুলো ছোট, প্রম্পট করলে গাইতে পারবি।'

চোখ কপালে তুলে বললাম, 'তুমি কি পাগল হয়েছ কেষ্টদা?'

—'এখনও হইনি, আর পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে প্লে আরম্ভ না হলে সবাইকে হতে হবে। শুধু তাতেই শেষ হবে না, মারধোর পর্যন্ত খেতে হবে।'

—'কিন্তু আমার গানের দৌড় তো তুমি জান কেষ্টদা, নিজেদের মধ্যে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কোনরকমে গাইতে পারি, তাই বলে স্টেজে? বিশেষ করে ধীরেন দাসের নামকরা গান?'

—'আমি কথা দিচ্ছি তোকে, বদনাম হবে না। আর এছাড়া পথও নেই ভাই।'

আমাকে আর কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়েই হাঁক দিলেন কেষ্টদা—'মণিমোহন!' মণিমোহন ড্রেসার কাছেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ও আর একজন আমাকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলল মেক-আপ রুমের দিকে। স্টেজের

কাছেই মেক-আপ রুম, যেতে যেতেই শুনলাম, কেষ্টদা নরেশদাকে বলছেন, 'নরেশদা, আপনি স্টেজের উপর গিয়ে ধীরাজের নামটা এনাউন্স করে দিন, আর সেই সঙ্গে ধীরেনের অ্যাকসিডেন্টালি না এসে পড়ার কথাটা জানিয়ে দিন।'

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষে ঘটে গেল। স্বপ্নাবিষ্টের মতো মেক-আপ রুম থেকে শুনতে পেলাম এক-বাড়ি অধৈর্য দর্শকের সমবেত গণ্ডগোল।

হঠাৎ গণ্ডগোল বেড়ে গেল, সঙ্গে হাততালি। অনুমানে বুঝলাম নরেশদা যবনিকার কালো পর্দা ঠেলে স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন বলবার চেষ্টা করছেন। একটু পরে গোলমাল একটু কমে গেলে নরেশদার গলা শুনতে পেলাম।

—'সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমি আপনাদের কাছে একটা দুঃসংবাদ জানাতে—'

ব্যস্ আর এগোতে পারলেন না নরেশদা। দর্শকের মধ্যে থেকেই শুরু হল

—'জানি মশাই কী বলবেন।'

—'বলবেন তো কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গলা খারাপ, 'বসন্তদূত' করতে পারবেন না?'

—'ওসব বাজে কথা শুনব না।'

—'টাকা ফেরত দিন।'

—'দু ঘন্টা বসিয়ে রেখে এখন দুঃসংবাদ জানাতে লজ্জা করে না?'

দু'তিনখানা চেয়ার ভাঙার আওয়াজও শুনতে পেলাম যেন। নরেশদা প্রাণপণে কথা বলার চেষ্টা করছেন, হট্টগোলে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে।

মেক-আপ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কেষ্টর পোশাক পরে এক-পা দু-পা করে এসে দাঁড়ালাম উইংসের পাশে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, নরেশদা কখনও দু'হাত উপরে তুলে চুপ করতে বলছেন, কখনও হাতজোড় করে মিনতি করছেন। কে কার কথা শোনে! ঠিক এমনি সময়ে হুইসিল দিয়ে সারা বাড়িটা কাঁপিয়ে একখানা কলকাতাগামী ট্রেন এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল। বোধহয় মালগাড়ি। চিৎকার-শ্রান্ত দর্শক একটুখানি চুপ করল। এই সুযোগ।

নরেশদা বললেন, 'আপনারা গোলমাল না করে দয়া করে আমার কথা শুনুন। কলকাতা থেকে শেষ ট্রেনে ধীরেন দাসের আসবার কথা ছিল। কী কারণে জানি না, তিনি ট্রেন ফেল করেছেন, এখনও পৌঁছননি। সেইজন্যই আমাদের অভিনয় আরম্ভ করতে দেরি হচ্ছিল। যাই হোক, আপনারা নিরাশ হবেন না। সম্প্রতি আপনাদের এই চিত্রগৃহে 'কালপরিণয়' দেখান হয়েছে। তার প্রিয়দর্শন নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।'

কে একজন বলে উঠল, 'গান বাদ দিয়ে?'

নরেশদা—'না, গান একটিও বাদ দেওয়া হবে না। আপনারা হয়তো জানেন না, ধীরাজবাবু গান গাইতে পারেন।'

দুটো দল হয়ে গেল। একদল, যারা সিনেমা-ভক্ত, আমি গান গাই শুনে একটা নতুন কিছুর আশায় রাজি হল। আর একদল, যারা গানের ভক্ত, তারা ধীরেন দাসের পরিবর্তে আমাকে খুশি মনে নিতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সবাই নিমরাজি হয়ে গেল। আর তাছাড়া উপায়ই বা কী ছিল!

নরেশদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আপনারা এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছেন, আর পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরুন। আমরা অভিনয় আরম্ভ করে দিচ্ছি।'

চেয়ে দেখি পাশে কেষ্টদা এসে দাঁড়িয়েছেন। বললাম, 'কেষ্টদা আমি পারব না। যদি নারভাস হয়ে যাই বা গান যদি একটু বেসুরো হয়ে যায়, আমায় ওরা আস্ত রাখবে না।'

পিঠ চাপড়ে অভয় দিয়ে কেষ্টদা বললেন, 'কোনো ভয় নেই তোর। প্রথম গান—'মম যৌবন নিকুঞ্জে' তোকে গাইতে হবে না।'

বাকরোধ হয়ে গেল। আমার অবস্থা বুঝতে পেরেই কেষ্টদা বললেন, 'কী করতে হবে মন দিয়ে শোন। অডিয়েন্স ক্ষেপে আছে। প্রথমে তোর গান দিয়েই অভিনয় শুরু। এ অবস্থায় একটু ত্রুটি হলেই আর প্লে জমানো যাবে না।'

বললাম, 'তাহলে?'

—'তাহলে যা তোকে করতে হবে বলছি শোন। কুঞ্জবনে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, তোর কোলে মাথা রেখে শ্রীরাধিকা অকাতরে ঘুমোচ্ছেন।

ক্রমে পুবদিকে আলোর আভাস দেখা দিল, পাখিরা ঘুম ভেঙে কলরব করে উঠল। তুই আস্তে আস্তে রাধিকার মুখে এসে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে ঝুঁকে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গান ধরবি—'মম যৌবন নিকুঞ্জে।'

অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'এই যে বললেন, গাইতে হবে না!'

কেষ্টদা বললেন, 'পিছনে সিনের আড়ালে তোর হাতখানেক তফাতে হারমোনিয়াম নিয়ে থাকব আমি। আমিই গাইব গানটি, গলাটা একটু অন্যরকম করে। তুই শুধু ঠোঁট নেড়ে যাবি। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করছিলাম, গানটা মুখস্থ আছে কিনা।'

খুব ভরসা পেলাম না। বললাম, 'কিন্তু কেষ্টদা, আপনি তো প্লেন গানটা গাইবেন না। গিটকিরি, তান বা আড়িতে ধরলে আমি থাকব কোথায়?'

—'ওরে মুখ্যু! ঐ রকম একটা অঘটন ঘটবার আগেই মুখ নিচু করে রাধিকাকে আদর করতে শুরু করে দিবি, লিপ মুভমেন্ট ধরতে পারবে না।'

ঐকতান থেমে গেছে। তাড়াতাড়ি দুরুদুরু বক্ষে স্টেজে গিয়ে বসলাম। মিস লাইট এসে কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন, যবনিকা উঠে গেল। সারা স্টেজ অন্ধকার, শুধু একটা ফোকাস আমাদের উপর। নেপথ্যে বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছে। আমার ঠিক পিছনে সিনের আড়াল থেকে কেষ্টদার চাপা গলায় আওয়াজ পেলাম, 'ধীরে!'

বললাম, 'উঁ!'

—'কোনও ভয় নেই, সব ঠিক আছে।'

একটু পরে অন্ধকার কেটে গেল, পুবের আকাশ ফরসা হয়ে এল। স্টেজে পাখিরা ডাকতে শুরু করল। আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল।

নিস্তব্ধ অডিটরিয়ামে পিন পড়লে শোনা যায়।

আবার কেষ্টদার চাপা গলা, 'মুখ নিচু কর, গান ধরছি।'

মুখ নিচু করে রাধিকার চুলগুলো যত্ন করে সরিয়ে দিতে লাগলাম। গান শুরু হল।

—মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি—
সখি জাগো, সখি জাগো, জাগো—
ও—ও—ও মম
যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি।

অপূর্ব কণ্ঠ কেষ্টদার, কী কারণে জানি না সেদিন একটু অন্যরকম করে গাইলেন বলেই বোধ হয় আরও ভাল লাগল। সারা প্রেক্ষাগৃহ সুরের মূর্ছনায় থমথম করতে লাগল। গানের মধ্যে যেখানে কোনও সুর-তানের প্যাঁচ নেই, মুখ তুলে সামনে চেয়ে ঠোঁট নাড়ি, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা, মুখ নিচু করে রাধিকাকে আদর করি। গানের শেষে আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলেন শ্রীরাধা। সমস্ত দর্শক আনন্দে করতালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল—'এনকোর, এনকোর প্লিজ!'

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। পেছন থেকে কেষ্টদা বললেন, 'ধর, জাগো নবীন গৌরবে, নব মুকুল সৌরভে।'

রাধিকা আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন, 'নবীন গৌরব' থেকে শুরু করে পুরো গানটা আবার গেয়ে গেলাম। আবার করতালি, আবার এনকোর।

কেষ্টদা বললেন, 'আর না, উঠে অ্যাক্টিং শুরু করে দে।'

তাই হল। এর পরের গানগুলো সোজা। বেশির ভাগ রাধার সঙ্গে ডুয়েট। নিজেই গেয়ে গেলাম। কেন জানি না, আমার নারভাসনেস একেবারে কেটে গেল, গানগুলো ভাল উতরে গেল।

অনেকেই বলল, 'অনেকদিন 'বসন্তলীলা' এত ভাল অভিনয় হয়নি।' একটু আত্মপ্রশংসা করে নিচ্ছি। সকলেই একবাক্যে বলে গেল, 'চেহারায় ও গানে এত ভাল শ্রীকৃষ্ণ এর আগে 'বসন্তলীলা'য় হয়নি।'

হাসি এল। ভাবলাম এ যেন ঠিক 'নেপোয় মারে দই'-এর মত। গাইলেন কেষ্টদা, এনকোর হাততালি আর প্রশংসা পেলাম আমি।

দিনচারেক বাদে স্টুডিওয় গিয়ে শুনি, গাঙ্গুলীমশাই আমায় খুঁজছিলেন। মনে মনে বেশ একটু বিস্মিত হয়েই দেখা করলাম গাঙ্গুলীমশাইয়ের সঙ্গে।

বললেন, 'ধীরাজ, ভাল ভাল স্টেজের নাটক থেকে এক একটা পুরো সিন টকিতে নেওয়া হবে। 'চন্দ্রগুপ্ত' আর 'আবুহোসেন' নাটক দু'খানায় তোমাকে দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে নন্দ ও নবাবের ভূমিকা। বেশ ভাল করে মুখস্থ করে নাও। একটি শটে একটি পুরো সিন নেওয়া হবে, যেন আটকে না যায়। কাল টেক করা হবে, আজ বই নিয়ে সিনটা জেনে বাড়ি গিয়ে ভাল করে মুখস্থ করে নাওগে।'

যাক, ফেল তাহলে করিনি! থার্ড ডিভিশনে হলেও পাস করেছি নিশ্চয়।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে নন্দের রাজসভা। মন্ত্রী কাত্যায়ন ডেকে নিয়ে এসেছে চাণক্যকে পৌরোহিত্য করতে। নন্দের আদেশে বাচাল অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছে চাণক্যকে — সেই সিনটা নেওয়া হল। 'নন্দ' আমি, 'চাণক্য' দানীবাবু, 'কাত্যায়ন' নরেশদা। পুরো হাজার ফিটের একটি রীলে দৃশ্যটি নেওয়া হল একটি শটে। প্রায় দশ মিনিটের শট, নির্বিঘ্নে শেষ হল।

'আবুহোসেনে' আবুর ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল হাঁদুবাবুকে । বারকয়েক দু'জনে রিহার্সাল দিয়ে নেওয়া হল দৃশ্যটি। সেটিও প্রকাণ্ড সিন। এর পরে দেখলাম, দুর্গাদাস 'রঘুবীর' সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শুনলাম, 'রঘুবীর' নাটকে রঘুবীর আর অনন্তরাও-এর একটি নাটকীয় দৃশ্য নেওয়া হবে। 'অনন্তরাও' করলেন নরেশদা। শটটা দেখলাম। সত্যিই অপূর্ব কণ্ঠ দুর্গাদাসের, হিংসা হয়। রোজই এই রকম দুটো-তিনটি দৃশ্য নেওয়া হতে লাগল। শুনলাম এগুলো ক্রাউন সিনেমায় দেখানো হবে। ক্রাউন সিনেমায় টকি মেশিন বসানো শুরু হয়ে গেছে।

দুনম্বর ফ্লোরও কমপ্লিট হয়ে এল। শুনতে পেলাম ওখানে পূর্ণাঙ্গ সবাক ছবি 'জামাইষষ্ঠী' তোলা হবে। রচনা, পরিচালনা ও মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন— কর্নওয়ালিশ থিয়েটারের ম্যানেজার অমর চৌধুরী মশাই।

দীপালি নাট্য সংঘে আর রোজ যাওয়া হয়ে ওঠে না। বাইরে অভিনয় করতে যাওয়া বন্ধ। নরেশদা বললেন, 'আমাদের নিজস্ব বাড়ি 'রঙমহল' প্রায় শেষ হয়ে এল। সামনের মাস থেকে ওখানেই নিয়মিত অভিনয় আরম্ভ হবে।'

দেখতে দেখতে আট-দশ দিন কেটে গেল। রোজ একবার করে স্টুডিওতে যাই। সেদিনও গিয়ে উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় নরেশদার সঙ্গে দেখা। বেশ উত্তেজিত মনে হল নরেশদাকে। একটা দৈনিক বাংলা কাগজ হাতে নিয়ে একবার যতীন দাসের সঙ্গে কথা বলছেন, একবার জাহাঙ্গীর সাহেবের ঘরে ঢুকে আবার তখনি বেরিয়ে আসছেন।

আমায় দেখতে পেয়েই বললেন, 'এই যে ধীরাজ, তোমাকেই খুঁজছিলাম, একটা জবর সুখবর আছে।'

কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'কী খবর নরেশদা?'

বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন নরেশদা, 'সিরাজগঞ্জে ফ্লাড। অর্ধেক গ্রাম জলে

ডুবে গেছে। স্টেশন থেকে আধ মাইল জলের নিচে।'

মর্মাহত হয়ে বললাম, 'এটা সুখবর হল নরেশদা?'

একটু লজ্জিত হয়ে নরেশদা বললেন, 'না, না, সেভাবে কথাটা নিও না। আমি বলছিলাম আমার 'নৌকাডুবি'র আসল সিনটা—মানে বিয়ে করে নৌকাতে আসবার সময় রমেশের ও কনের নৌকা ডুবে যাওয়া এবং কনে বদলের সিনগুলো নেওয়ার পক্ষে এখন সিরাজগঞ্জ হল আইডিয়াল প্লেস। তোমার চুলও তো বেশ বড় হয়ে গেছে। তৈরী হয়ে নাও। কাল বাদে পরশু রওনা হতে হবে। '

কথায় বলে, কারও সর্বনাশ কারও পৌষ মাস। বন্যার তাণ্ডবলীলায় সিরাজগঞ্জে হাহাকার, নৌকাডুবির রোমাঞ্চকর স্বাভাবিক দৃশ্য তোলার আশায় আমাদের মত্ত উল্লাস। ১৯৩১ সালে সিরাজগঞ্জের ভয়াবহ বন্যার বর্ণনা তখনকার সংবাদপত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু চোখে দেখার পর বুঝলাম—সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা শুধু দূর থেকেই ওপরের ছবিটা তুলে ধরেছেন পাঠকের চোখের সামনে—ভেতরকার আসল রূপটাই বাদ পড়ে গেছে।

রাত্রের ট্রেনে রওনা হয়ে ভোরে পৌঁছে গেলাম সিরাজগঞ্জে। স্টেশনে নয়। স্টেশন বলে কিছু নেই তখন। যেখানে ট্রেন থামল সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল যমুনাগর্ভে। আমাদের ইউনিটে ছিলাম আমি, নরেশদা, যতীন দাস, গিরিজা গাঙ্গুলী, বি. এস. রাজহংস, শ্রীমতী সুনীলা দেবী, ক্যামেরা অ্যাসিস্টেন্ট হামিদ ও জনচারেক কুলি।

সারা রাত ট্রেনে নরেশদা ও যতীন দাসের উৎসাহ উদ্দীপনা ও কাজের ফিরিস্তি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে— সকালে সিরাজগঞ্জে নেমেই কী কী শট নেওয়া হবে, দুপুরে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে পড়ে বেলা চারটের মধ্যে যে সব শট নেওয়া হবে তার লিস্ট, আবার তারপর দিন ভোর থেকে শুরু করে সারাদিন, এইভাবে কাজ করতে পারলে তিন দিনে কেল্লা ফতে করে কলকাতায় ফেরা যাবে।

কোথায় গেল সেই সব উৎসাহ উদ্দীপনা, কোথায় পড়ে রইল সেই কর্মব্যস্ত দৈনন্দিন কার্যতালিকা! ট্রেন থেকে নেমে একটু উত্তর দিকে এগিয়ে দেখি নরেশদা ও যতীন কূলহারা সর্বগ্রাসী যমুনার দুরন্ত স্রোতের দিকে নিরাশ চোখ মেলে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। কথা কইতে গিয়ে থেমে গেলাম মাত্র হাতদশেক দূরে স্রোতে ভেসে চলেছে দুটো মানুষ, পচে ফুলে ওঠা, তারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলেছে যেন পাল্লা দিয়ে একটা মরা গরু ও বাছুর, গলার দড়িটা বাছুরের গলার কাছে বাঁধা। চার দিকে নিস্তব্ধ নিশ্চুপ—একটু একাগ্রভাবে কান পেতে শুনলে মনে হবে একটা ভয়াবহ চাপা আর্তনাদ হাওয়ায় ভেসে এসে ঢেউগুলোর ওপর আছড়ে পড়ে নিমেষে ভেঙে চুরমার করে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে পলকহীন চোখে শুধু চেয়েই আছি। প্রতি মুহূর্তে না জানি কোন নতুন

বিস্ময় মাথায় করে নিয়ে আসে ঐ সর্বনাশা নদীর মাতাল ঢেউ! গিরিজা গাঙ্গুলীর ডাকে চমক ভাঙল সবার। পিছনে ফিরে দেখি দু'তিনজন অজানা ভদ্রলোক গিরিজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। গিরিজা চিৎকার করে বলল—

'নরেশদা এদিকে একবার আসুন!'

সবাই এগিয়ে গেলাম। গিরিজাই আলাপ করিয়ে দিল—'ইনি হচ্ছেন এখানকার নামকরা উকিল শ্রীকৃতান্তকুমার বসু—আর এঁদের একজন মুহুরী, অপরজন প্রতিবেশী দোকানদার।'

যথারীতি নমস্কার বিনিময়ের পর ম্লান হেসে নরেশদা বললেন, 'এলেন কীসে?'

কিছু দূরে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধা ডোঙাটিকে দেখিয়ে কৃতান্তবাবু বললেন, 'হাঁটা পথ বলতে কিছুই নেই, সব জলপথ, কাজেই ডোঙা বা নৌকা ছাড়া পা বাড়াবার উপায় নেই।'

আমাদের পৌঁছে দিয়ে পিছু হটে ট্রেন অনেক আগেই চলে গেছে। স্টেশনমাস্টার এবং দু'একটি কর্মচারীর অনুগ্রহে কিছু দূরে সাইডিঙে দাঁড়ানো দুখানা সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে মালপত্র তুলে আপাতত আমাদের থাকবার জায়গা ঠিক হয়েছে। এক-পা দু-পা করে সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

নরেশদা বললেন, 'আপনার বাড়ি কোথায় কৃতান্তবাবু?'

রসিক লোক কৃতান্তবাবু, এতবড় বিপর্যয়েও রসবোধ হারাননি, হেসে বললেন—

'জলে এবার ঘর বেঁধেছি,
ডাঙায় বড় কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে
চেঁচায় খালি মিছিমিছি।'

হাসলাম না, সবাই চুপ করে রইলাম। নিজেই খানিকটা হেসে নিয়ে শুরু করলেন কৃতান্তবাবু, 'আমার বাড়িটার চারপাশে অন্তত দু'শখানা ঘর ছিল। বেশির ভাগ কাঁচা বাড়ি। মাটির দেওয়াল, ওপরে খড়, টালি বা টিন দিয়ে ছাওয়া। দু'চারখানা পাকা ইটের বাড়ি যা ছিল—তাও জরাজীর্ণ। কিছু নেই মশাই—সব সাফ। নিশ্চিহ্ন। শুধু চারধারে থৈথৈ করছে জল, তার মাঝে ভূশণ্ডি কাকের মতো নির্বিকারে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছোট্ট একতলা বাড়িখানা। দু-একদিনের মধ্যে যদি জল সরে না যায়, আমাকেই সরে আসতে হবে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে।'

কৃতান্তবাবুকে ভাল করে দেখলাম। বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে, মিশমিশে কালো রং, শৌখিন ছাঁটা গোঁফ ও চুল, দোহারা গড়ন, চোখে চশমা। বেশ একটা বুদ্ধিমত্তার ছাপ চোখেমুখে মাখানো। আমাদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নরেশদা বললেন, ' আমরা যে 'নৌকাডুবি' তুলতে এসেছি, এ খবরটা পেলেন কী করে?'

—'এ খবর কি চাপা থাকে মশাই! তাছাড়া ট্রেনে আপনারা ক'জন ছাড়া আরও

লোক ছিল, একথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? ওকালতি করা ছাড়াও আমার আরও কয়েকটি বদ অভ্যাস আছে — থিয়েটার-যাত্রার নাম শুনলেই যে অবস্থায় থাকি না কেন, নেচে উঠি। সকালে খবরটা শোনা মাত্র চা পর্যন্ত না খেয়ে ডোঙা নিয়ে ছুটে এলাম।'

চায়ের নামে নরেশদার চমক ভাঙল, বললেন, 'ওহে গিরিজা, হামিদকে অনেকক্ষণ আগে চায়ের জন্যে পাঠিয়েছি, একটু খবর নাও তো।'

গিরিজা চলে যাচ্ছিল, ডাকলেন নরেশদা, 'আর দ্যাখো, ঐ সঙ্গে খান বারো টোস্ট আর বিস্কুট নিয়ে আসবে।'

হোহো করে হেসে উঠলেন কৃতান্তবাবু। তারপর নরেশদার দিকে চেয়ে বললেন,'মোটে চাচী রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা! চা পান কি না দেখুন—কেননা দুধ নেই চিনি নেই, আছে শুধু মরচে পড়া প্যাকেটে চা আর গুড়, তাতে যদি চায়ের তেষ্টা মেটে —চেষ্টা করে দেখুন। টোস্ট বিস্কুটের কথা ভুলে যান—সাত আট দিনের শুকনো বাসি পাউরুটিতে যদি আপত্তি না থাকে নিয়ে আসতে বলুন।'

থ' হয়ে গেলাম। কৃতান্তবাবু বললেন, 'তার চেয়ে হাত মুখ ধুয়ে চলুন গরিবের বাড়িতে, দেখি কত দূর কী করতে পারি।'

তা ছাড়া আর উপায়ই বা কী! তাড়াতাড়ি ট্রেনের বাথরুমে ঢুকে কোনও রকমে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় বদলে রেডি হয়ে গেলাম। দুখানা কামরা। একটা দেওয়া হয়েছে নায়িকা সুনীলাকে—অন্যটায় আমরা সবাই। এরই মধ্যে মুখ-হাত ধুয়ে মায় প্রসাধন শেষ করে কখন যে সুনীলা দেবী এসে গেছেন আমাদের কামরায় জানতেও পারিনি। নরেশদা আলাপ করিয়ে দিলেন কৃতান্তবাবু ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে। ইতিমধ্যে স্থানীয় ব্যায়াম ক্লাবের কয়েকটি ছেলেও এসে গিয়েছিল। আলাপ হল। তাদের কাছেই শুনলাম, কৃতান্তবাবু স্থানীয় ক্লাবের ড্রামাটিক সেক্রেটারি ও নিজে একজন ভাল অভিনেতা। আধঘন্টার মধ্যে সবাই রেডি হয়ে গেলাম। রেল লাইনের পাশেই পুবদিকের বাগানে দু'তিনখানা ডোঙা বাঁধা। একখানায় উঠলেন কৃতান্তবাবু, নরেশদা ও সুনীলা, অন্য দুখানায় আমরা সবাই ভাগাভাগি করে উঠলাম ব্যায়াম ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে। কুলিরা গাড়িতে মাল পাহারা দেবার জন্য রইল। নরেশদা ওদের সবাইকে আট আনা করে দিয়ে দিলেন চা ও খাবারের জন্যে।

লম্বা তালগাছের ডোঙা—কোনো মতে উবু হয়ে বসে দু'হাতে দু'ধার শক্ত করে ধরে রইলাম। সামনে সরু মাথাটার কাছে অনায়াসে দাঁড়িয়ে লম্বা বাঁশ দিয়ে লগি ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে নিয়ে চলল ব্যায়াম ক্লাবের সেক্রেটারি সমীর। আমাদের ডোঙায় ছিলাম আমি, রাজহংস ও হামিদ, আর একটি স্থানীয় বারো চৌদ্দ বছরের ছেলে। ছেলেটি ডোঙার ঠিক মাঝখানে একখানা নারকেল মালা হাতে নিয়ে বসে ছিল—মাঝে মাঝে জল বেশি হলে ছেঁচে ফেলাই ওর কাজ। রাজহংস এর আগে

দু'একখানা বাংলা ছবিতে কাজ করেছে, তাছাড়া ও নিজে পাঞ্জাবী হলেও বাঙালিদের সঙ্গে মেশবার আগ্রহটা প্রবল। ভাল বলতে না পারলেও বাংলা বুঝতে পারত। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয় কিন্তু বিরাট দেহ, দেখাত ঠিক ত্রিশ-বত্রিশ বছরের জোয়ানের মতো।

বললাম, 'কী হংসরাজ! কেমন লাগছে?'

জবাব না পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ঠিক আমার পেছনে জেবড়ে বসে পড়েছে রাজহংস, হাত দুটো দিয়ে শক্ত করে ধরেছে ডোঙার দুটো ধার, ভয়ে বিস্ফারিত চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

অসমসাহসী বেপরোয়া পাঞ্জাবী ছেলে রাজহংস এবং বোধহয় সেই জন্যেই গাঙ্গুলীমশাই ফ্রামজীকে বলে ওর মাস মাইনে করে দিয়েছেন ম্যাডানে—আড়াই শ'টাকা। সিরাজগঞ্জে ওর কোনো কাজ না থাকলেও বিদেশে আপদেবিপদে কাজে লাগতে পারে ভেবেই নরেশদা ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী টারজান দি ফিয়ারলেস? অত ঘাবড়ে গেছ কেন?'

শুকনো গলায় অতি কষ্টে রাজহংস বলল, 'ধীরাজ, এখানে জোল কোতো, আমি সাঁতার জানি না।'

শুনতে পেয়ে সশব্দে হেসে উঠে সমীর জবাব দিল, 'ভয় নেই সাহেব, ডুবে মরবে না।' বলেই ডোঙাটা থামিয়ে দিয়ে, লম্বা বাঁশের লগিটা দু'তিনবার জলের মধ্যে ঠুকে তুলে দেখাল, জল খুব বেশি যদি হয় তো বুক পর্যন্ত।

ভয় তবু গেল না রাজহংসের। চেষ্টা করে কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'এবার কলকাত্তায় গিয়ে আগে সাঁতারটা শিখে লিব।'

সামনে চেয়ে দেখি, নরেশদা ও যতীনদের ডোঙা এরই মধ্যে নদীর ধার ঘেঁষে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। জোরে লগি মারবার সময় পেশীবহুল হাত দুটো ফুলে দ্বিগুণ হয়ে উঠছে সমীরের, প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে আছি। সমীর বলল, 'জানেন ধীরাজবাবু, যেখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এটা দিনদশেক আগেও ছিল সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ হাট, অসংখ্য ছোট বড় চালা ও টিনের ঘর ছিল এখানে। নদীপথে, ট্রেনে হাটবারে বহু লোক দূরদূরান্ত থেকে বেচাকেনা করতে আসত এখানে। এই যে মাঝে মাঝে বড় বড় বটগাছ, আমগাছ দেখছেন—এগুলো গরমের দিনে অগণিত লোককে ছায়ার আড়ালে ঘিরে রাখত। আজ গাছগুলো শুধু সাক্ষীগোপালের মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর কিছু অবশিষ্ট নেই।'

আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় চেয়ে দেখি, নোংরা আবর্জনা ভর্তি ঘোলা জলে মাঝে মাঝে এক একটা বড় গাছকে ঘিরে জঙ্গলের মত জমে উঠেছে ঘরের চালা, দরমা, বাতা। দু'একটা গাছ এরই মধ্যে হেলে কাত হয়ে পড়েছে জলে। বাগানের

সীমানা ছাড়িয়ে উত্তরদিকে চাইলে নজরে পড়ে শুধু জল আর জল।

সমীর বলল, 'হাট থেকে আধমাইলেরও বেশি দূরে ছিল যমুনা, এখন একাকার।'

রাজহংস বলল, 'নরেশদা যতীন এরা সোব পৌঁছে গেছে বোধহয়?'

সামনে একনজর চেয়ে সমীর বলল, 'না, ঐ তো দূরে ওঁদের ডোঙা দেখা যাচ্ছে। যমুনার কাছ দিয়ে উজানে লগি মেরে অত সহজে এগিয়ে যাওয়া যায় না মশাই। আমি বাগানের সীমানা ছেড়ে একটু উত্তর দিক দিয়ে গেলে ওঁদের আগেই পৌঁছে যেতাম, কিন্তু ধীরাজবাবু, আপনাকে কয়েকটি দৃশ্য দেখিয়ে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। থাকেন কলকাতায়—সকালে খবরের কাগজে হেডলাইন পড়ে দু'চার বার 'আহা' বলে স্টুডিওতে গিয়ে রাজা সেজে সব ভুলে যান, তাই ভাবলাম—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'এর চেয়েও ভয়ানক কিছু আছে নাকি সমীরবাবু—'

শুধু অনুকম্পাভরা দৃষ্টি দিয়ে মিনিটখানেক চেয়ে থেকে কোনো কথা না বলে সমীর ডোঙা ঘুরিয়ে দিল দক্ষিণমুখো। দু'তিন মিনিট নিঃশব্দে চলার পর, একটা উৎকট গন্ধ নাকে এল—বমি হবার উপক্রম। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বসলাম, যতই সামনে এগিয়ে যাই গন্ধের তীব্রতা বেড়ে উঠতে থাকে। চুপ করে থাকতে পারলাম না, বললাম, 'কীসের গন্ধ সমীরবাবু?'

নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল সমীর, 'পচা মানুষের, নয়তো গরু, মোষ, ভেড়ার। স্রোতে ভেসে এসে আটকে গেছে কোনও গাছে অথবা জঙ্গলের ঝোপেঝাড়ে। প্রথম প্রথম আমাদেরও গন্ধ লাগত—নাকে কাপড় বেঁধে বেরোতাম, এখন আর দরকার হয় না, গন্ধও টের পাইনা।'

আর খানিকটা সামনে এগিয়ে যেতেই গন্ধটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। একটু একটু করে দক্ষিণমুখো এগোচ্ছি, জলের গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম হলেও গাছগুলো ঘন ঘন—বেশ একটু আঁকাবাঁকা ধরনে ডোঙা বাইতে লাগল সমীর। ছোট ছেলের কান্না শুনতে পেলাম—খুব কাছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েও আশেপাশে কিছু দেখতে পেলাম না, বেশ একটু বিস্মিত হয়েই সমীরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মনে হচ্ছে চারধারে মাইলখানেকের মধ্যে মানুষের বসতি নেই, অথচ ছোট ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছি।'

ম্লান হেসে সমীর বলল, 'আর একটু ধৈর্য ধরুন, চোখে দেখতেও পাবেন।' আর একটু এগিয়ে গিয়েই একটা ছোট গাছের কাছে ডাল ধরে ডোঙা থামিয়ে দিল সমীর। সামনে হাত দশ-বারো দূরে একটা বড় আমগাছের ওপরের ডালের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন!'

দু'খানা মোটা ডাল যেন সামনে হাত বাড়িয়ে আছে—সেই প্রসারিত হাতের ওপর চওড়া তক্তা আর দরজার কবাট বিছিয়ে ছেঁড়া কাঁথা কম্বল, পোঁটলা-পুঁটলি, ভাঙা টিনের বাক্স এক পাশে গাদা করে অন্য ধারে ভিড় করে দল পাকিয়ে একসঙ্গে

বসে আছে এক পাল ছোট ছেলেমেয়ে—আর ওদের পাশেই শতছিন্ন ময়লা কাপড়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে নির্লিপ্তভাবে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে বোধহয় ওদের মা। ঘোমটার ভেতর দিয়ে চোখ দুটো স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কোনো ভাষা নেই তার, লজ্জা সঙ্কোচ ভয় বিস্ময়—কোনো অনুভূতির স্পর্শ নেই সে চোখে। এ যেন জ্যান্ত মানুষের চোখে মরা মানুষের চাহনি।

সমীর বলল, 'এখান থেকে শুরু। আরও এগোলে দেখতে পাবেন—গাছগুলো সব ভর্তি। বন্যার রাত থেকে চার-পাঁচদিন ধরে দিন-রাত আমরা আঠারোজন ব্যায়াম সমিতির সভ্য অতি কষ্টে এদের বাঁচাতে পেরেছি। গরু ছাগল সব ভেসে গেছে। গোয়ালে ছিল যেগুলো, মরে পচে ওপরে ভেসে উঠেছে।'

গাছের ওপর থেকে আবার কান্নার আওয়াজ পেলাম, 'বড্ড খিদে পেয়েছে মা।' অতর্কিত আমাদের আবির্ভাবে এতক্ষণ বোধহয় খিদের কথা ভুলে গিয়েছিল—সবাই একসঙ্গে শুরু করল এবার, 'চাট্টি ভাত খেতে দে মা—কতদিন খাইনি।'

কৌতূহলী হয়ে তাকালাম ওদের মায়ের দিকে। ঘোমটার ভেতরে সেই ভাবলেশশূন্য মুখ, নিষ্প্রভ চোখে সেই মরা চাহনি। দূরে দুরন্ত যমুনার দিকে অপলক চেয়ে জড় পাথরের মতো বসে আছি।

সমীর বলল, 'এই পরিবারটির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। অবস্থা বেশ সচ্ছল, তিন পোতায় তিন খানা ঘর, গোয়ালে গরু, উঠোনে ধানের গোলা। তাছাড়া বাজারে একটা মনিহারীর দোকান—সব মিলিয়ে বাড়ির কর্তা সনাতন কুণ্ডুর দিন বেশ ভালই যাচ্ছিল। এল সর্বগ্রাসী বন্যা, নদীর কাছে বাড়ি। আগে নিল সেটা, বন্যার জল ছুটে চলল স্টেশন হয়ে বাজারের দিকে—সঙ্গে ছুটল সনাতন। আমরা রিলিফ পার্টির ছেলেরা অনেক কষ্টে প্রাণ কটা বাঁচালাম ওর পরিবারের, ধরে রাখতে পারলাম না শুধু সনাতনকে। বলে, সারা জীবনের সঞ্চয় টাকাকড়ি সব পোঁতা রয়েছে দোকানে লোহার সিন্দুকে, শুধু প্রাণটা বাঁচিয়ে হবে কী? পরদিন অনেক খুঁজে পাওয়া গেল সনাতনের মৃতদেহটা—বাজার থেকে অনেকটা দূরে। জলের নিচে উপড়ে যাওয়া একটা গাছের দুটো ডালের ভেতরে। দু'হাতে বুকে চেপে রয়েছে তখনও একটা পুঁটলি, টাকাতে রেজকিতে মিলিয়ে শ আড়াই হবে।'

গাছের ডালে কান্নার আওয়াজ বেড়ে উঠেছে। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে সমীর বলল, 'টাকাটা জমা রেখেছি আমাদের ফাণ্ডে। জল সরে গেলে ওদের যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।' হঠাৎ সমস্ত বাগান সচকিত করে কাছ থেকে ভেসে এল একটা হুইসলের তীব্র আওয়াজ। মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল সমীর। তারপর নিমেষে পকেট থেকে আর একটা হুইসল বার করে দুবার বাজাল। ওপরের কান্না থেমে গেছে। নিস্তব্ধ বাগানে একসঙ্গে অনেকগুলো দাঁড়ের ছপছপ আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটু পরেই দেখতে পেলাম, ঐ ঘিঞ্জি গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে

অনায়াসে এঁকেবেঁকে একখানা নৌকা তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমার দিকে ফিরে সমীর বলল, 'আমাদের রিলিফ পার্টি এসে গেছে ধীরাজবাবু।'

ছোট্ট নৌকায় ছ'টি ছেলে। বয়েস ষোল থেকে বাইশের মধ্যে। স্বাস্থ্যবান সুন্দর চেহারা, দেখলে ব্যায়াম ক্লাবের সভ্য বলে চিনতে কষ্ট হয় না। নৌকার উপরের পাটাতনে দু'বস্তা মোটা ধানের চিঁড়ে, আর দুটো কলসিতে খেজুরে গুড়। নৌকার খোলের ভিতর থেকে ওরা উপরে উঠিয়ে রাখল দুটো মাটির কলসি—শুনলাম ওতে পানীয় জল। কান্না থামিয়ে লোলুপ ক্ষুধার্ত চোখগুলো ঐ ছোট্ট নৌকাটার উপর নিবদ্ধ রেখে উপর থেকে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইছে ছেলেমেয়েগুলো।

সমীর জিজ্ঞাসা করল, 'এত দেরি হল কেন পন্টু?'

একটা দড়ির সিঁড়ি দু'হাতে পাক খুলতে খুলতে পন্টু বলল, 'সকালে গিয়ে দেখি জহির সর্দারের বৌ আর কোলের ছেলেটা মরে গেছে। ওদের নিয়ে যমুনায় ভাসিয়ে দিয়ে আসতে —'

বাধা দিয়ে সমীর বলল, 'তিন নম্বর তাঁবুর খবর কী?'

—'আর সব ভাল, শুধু ত্রৈলোক্য হালদারের মেজ ছেলেটার রক্ত দাস্ত হচ্ছে।'

—'তার উপরে চিঁড়ে গুড় দিয়ে এলে তো?'

—'না সমীরদা, দুপুরে বার্লি রান্না করে দিয়ে আসব।'

ইতিমধ্যে সার্কাসের খেলা শুরু হয়ে গেছে। একটি ছেলে পিঠে একরাশ শালপাতা গামছা দিয়ে বেঁধে দড়ির সিঁড়ির একপ্রান্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তরতর করে বাদুরের মত গাছটায় উঠে গেছে। উপরে চেয়ে দেখি, ছেলেমেয়েগুলো এর মধ্যেই পোঁটলা থেকে কলাই-এর ঘটি গ্লাস বার করে প্রস্তুত হয়ে বসেছে। ওদের মা আর নির্লিপ্ত বসে নেই, চোখের ভাষাও বদলেছে। দড়ির সিঁড়ির একপ্রান্ত ডালে বাঁধা হতে না হতেই আর একটি ছেলে একটি চিঁড়ের পোঁটলা পিঠে ঝুলিয়ে হাতে করে দড়ি বাঁধা একটা গুড়ের কলসি নিয়ে এক হাতে সিঁড়ি বেয়ে অনায়াসে উপরে উঠে গেল। দুটি ছেলে নৌকার উপর সিঁড়ির গোড়াটা বেশ শক্ত করে ধরে রইল। শালপাতায় দুমুঠো করে চিঁড়ে আর খানিকটা করে গুড়, এই হল সারা দিন-রাতের আহার। একটু পরে গাছের উপর থেকে একটা দড়ি নামিয়ে দিল পন্টু। নিচ থেকে জল ভরে একটা বড় পেতলের ঘটি ঐ দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। উপরে টেনে তুলে কলাই-এর গ্লাস ও বাটিতে ঢেলে দেওয়া হল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ভোজনের পর্ব শেষ। ছেলেরা নেমে এল নৌকোয়।

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল রাজহংস—'ধীরাজ, আমায় ভাই ডাঙায় নামিয়ে দাও। মাথা ঘুরছে, গা বমি বমি করছে।'

কথাটা সমীরকে বলতেই সে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রাজহংসের দিকে। তারপর বলল, 'সেই ভাল। আপনি গাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। গা বমি-বমি করা

খুব খারাপ লক্ষণ।'

দু'তিনজন ছেলের হাত ধরে একরকম লাফিয়ে উঠল রাজহংস ডোঙা থেকে নৌকোয়। তিন-মণি একটা বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জলের উপর প্রায় পাঁচ আঙুল জেগে উঠল ডোঙা। সমীর বলল, 'খুব লোক নিয়ে এসেছেন সাহায্য করতে।'

রাজহংসকে নামাতে স্টেশনের দিকে নৌকা চালিয়ে চলে গেল ছেলের দল। সমীর বলল, 'আরও কিছু দেখতে চান?'

বললাম, 'প্রথম দিনের পক্ষে এই যথেষ্ট নয় কি ?'

কৃতান্তবাবুর বাড়ির দিকে জোরে ডোঙা চালিয়ে দিল সমীর। যেতে যেতে বলল, 'গাছ ছাড়াও শুকনো জমির উপর তাঁবু খাটিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো পরিবার। তাছাড়া কলাগাছের ভেলার উপর খড় বিছিয়ে উপরে একটা আচ্ছাদন দিয়েও অনেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে। চাল নেই বা যা আছে জলে ভিজে তা অখাদ্য হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে দূর গ্রাম থেকে চিঁড়ে গুড় এনে এদের খাওয়ানো হচ্ছে, তাও আর কতদিন সম্ভব হবে ভগবান জানেন।'

সব দেখে শুনে মনে হচ্ছিল, ছবি না তুলে আজ রাত্রে ট্রেনেই কলকাতা ফিরে গেলেই বোধহয় সব দিক দিয়ে ভাল হত। হাটের সীমানার বাইরে স্রোতের টান খুব বেশি। সাবধানে লগি মারতে লাগল সমীর। কারও মুখে কথা নেই—শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে যমুনার অস্ফুট গর্জন, ঢেউ-এর মাথায় কড়া রোদের আলো পড়ে আয়নার মত জ্বলে জ্বলে উঠছে। চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মাথা ঝিমঝিম করে। চোখ বুজে বসে থাকি। এইভাবে প্রায় মিনিট পনের কাটবার পর পৌঁছে গেলাম কৃতান্তবাবুর উঠোনে।

আমাদের অনেক আগেই পৌঁছে গেছেন আর সবাই।

কৃতান্তবাবু রকের উপর এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ডোঙা থেকে পা বাড়িয়ে একরকম লাফিয়ে উঠলাম রকের উপর। দেখলাম, চায়ের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কাপগুলো ইতস্তত ছড়ান রয়েছে।

কৃতান্তবাবু বললেন, 'সমীরের পাল্লায় পড়েছিলেন তো? জানি আপনার আসতে দেরি হবেই, সব দেখেছেন তো?'

সমীর হেসে জবাব দিল, 'সব আর দেখলেন কই! প্রথম দৃশ্য দেখেই পালের গোদা পাঞ্জাবীর মাথা ঘোরা, গা-বমি-বমি।'

রাজহংসের ব্যাপারটা আমিই সবাইকে বললাম। নরেশদা সব শুনে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'অথচ ওর কাছেই বেশি সাহায্য পাব ভেবে ফ্রামজীকে অনেক বলে-কয়ে পারমিশন করিয়ে এনেছি।'

চা আর হালুয়া এসে গেল। খেতে খেতে নরেশদা বললেন, 'বুঝলে ধীরাজ, কৃতান্তবাবুকে না পেলে কী যে করতাম, ভাবতেও ভয় হয়। হয়তো আমাদের

সবাইকে কৃতান্তেই পেয়ে বসত। তাই ওঁকে একটা পার্টও দিয়েছি। উনি হলেন কন্যা-কর্তা। এইখান থেকেই বর, বরযাত্রী, কনে সব দু'খানা নৌকায় রওনা হবে। নৌকা ডোবানোর সিনটা আমরা অন্য কোথাও একটা ফাঁকা জায়গা দেখে তুলব।'

ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখি সুনীলা দেবী ইতিমধ্যে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছেন। চায়ের কাপটা হাতে করে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চেয়ে দেখি নরেশদাও এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপের মত বাড়িটা। যেদিকে তাকাই শুধু জল।

নরেশদা বললেন, 'কী ওয়ান্ডারফুল সিন বলতো? এই পরিবেশে বিয়ের পর তোমাদের নৌকা করে যাত্রা, মাঝনদীতে কনের নৌকাডুবি। খবর শুনে তোমার নদীতে লাফিয়ে পড়া। সিনগুলো যতীন যদি ঠিকমত নিতে পারে—ব্যস! বাংলা ছবির রাজ্যে একটা ভূমিকম্প হয়ে যাবে।'

সত্যি কথা বলতে কি, যে উৎসাহ নিয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলাম, সমীরের সঙ্গে সকালে এক ঘন্টা ঘুরে তা নিভে ছাই হয়ে গিয়েছিল। যেদিকে তাকাই চোখের সামনে ফুটে ওঠে সনাতন কুণ্ডুর বিধবা বৌ-এর হিমশীতল সেই চাহনি। চেষ্টা করেও ভুলতে পারছিলাম না। উত্তরদিকে যমুনার বেগবান স্রোতের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নরেশদা বলে চলেছেন, 'সত্যি সত্যি নৌকা ডোবাব, কাজেই নৌকা একখানা চাই, কৃতান্তবাবু সে ব্যবস্থা করেও দিয়েছেন। পুরোনো ফাটাফুটো একখানা নৌকা একেবারে কিনে নিতে হবে, নইলে ডোবাবার জন্যে কেউ নৌকা দিতে চায় না।'

দক্ষিণে উঠোনের দিকে চেয়ে দেখি, নৌকো আর ডোঙায় চারপাশ ভর্তি হয়ে গেছে। স্কুল-কলেজের ছেলেই বেশি। আমরা বায়োস্কোপের ছবি তুলতে এসেছি শুনে সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছে। বেলাও অনেক হয়েছে, প্রায় বারোটা বাজে।

কৃতান্তবাবু বললেন, 'চলুন আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ বিশ্রাম করুন, কাল সকাল থেকে যা হয় করা যাবে।'

সুনীলা দেবীকে ডেকে নিয়ে আমি, নরেশদা ও যতীন সমীরদের রিলিফ পার্টির নৌকোয় উঠলাম, আর সবাই চলল ডোঙায়। সুনীলা দেবীর বয়স খুব বেশি হয়তো আঠারো। খুব সুন্দরী না হলেও ও-বয়সে দেখলে ভাল লাগবারই কথা। নৌকায় ওঠার পর ছেলেদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে গেল। বেশ কিছুদূর এসে পিছন ফিরে দেখি, পরম উৎসাহে ডোঙায় করে ওরাও সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

স্টেশনে পৌঁছতেই 'আসছি' বলে উধাও হয়ে গেলেন কৃতান্তবাবু। মিনিট-পনেরো বাদে দু'জন স্টীমার কোম্পানির লোক নিয়ে ফিরে এলেন। আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে এবং কী জন্যে এখানে এসেছি সংক্ষেপে বলে নরেশদাকে বললেন, 'কুলিদের বলুন, মালপত্র গাড়ি থেকে বার করে গাধাবোটে তুলতে।'

হকচকিয়ে গেলাম। গাড়ি থেকে গাধাবোটে! ব্যাপার কী? কৃতান্তবাবু হেসে বললেন, 'ভয় নেই। ওখানে আরামে থাকবেন। গাড়ি টেম্পোরারি, রিলিফের জন্যে যেকোনো মুহূর্তে ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারে। তখন গাছে বাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।'

বোধহয় ঘুমিয়ে ছিল ট্রেনের কামরায়, গাছের প্রসঙ্গ শুনে চোখ ডলতে ডলতে দরজা খুলে বাইরে এল রাজহংস। চারদিকে অত লোকজন দেখে বেশ একটু ভড়কে গিয়ে আমায় চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কী? গাছের কথা কী হচ্ছিল?'

একটু মজা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'এখুনি এ গাড়ি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে, এখানে বাস করবার মতো শুকনো ডাঙা যখন নেই, তখন গাছের ডালে তক্তা বিছিয়ে থাকা ছাড়া উপায় কী? সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে।'

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল রাজহংসের। বেশ নারভাস হয়ে বলল, 'আমি তো গাছে উঠতে পারি না!'

রাগে ফেটে পড়লেন নরেশদা । সামনে এগিয়ে এসে বললেন, 'কী পার তুমি, সেই কথাটা একবার বলবে দয়া করে? গাছে উঠতে পার না, সাঁতার জান না, নৌকোয় বা ডোঙায় উঠলে তোমার মাথা ঘোরে, নদীতে মরা গরু-বাছুর দেখলে তোমার গা বমি-বমি করে। তোমায় নিয়ে এই জলের দেশে কী করব আমি বলতে পার?'

আশেপাশে একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল। দেখলাম লজ্জায় ও অপমানে কান দুটো লাল হয়ে গেছে রাজহংসের। কোনও উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে উত্তর দিকে নদীর ধারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। জলের ধার থেকে বেশ খানিকটা দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে বিরাটকায় গাধাবোট, যমুনার উন্মাদ ঢেউও ওর কাছে এসে ভেঙে চুরমার হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

কৃতান্তবাবু বললেন, 'আপনাদের বরাত ভাল, তাই বোটটা পেয়ে গেলেন। এমনিতে পাওয়া খুব শক্ত। মাটি কাটা, মাল বওয়া, একটা না একটা কাজে লেগে আছেই, শুধু বন্যার জন্যে সেসব বন্ধ।'

সমীরদের নৌকায় করে কুলিরা মালপত্র গাধাবোটে তুলে দিল। এইবারে আমরা সবাই একটা দড়ির সিঁড়ি দিয়ে এক-এক করে উঠে গেলাম। রাজহংস তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে ডাকলাম ওকে। নরেশদাকে চটানোর ভয়েই হোক, অথবা আড়াইশো টাকা মাইনের চাকুরি হারাবার ভয়েই হোক—দ্বিরুক্তি না করে সুড়সুড় করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল রাজহংস।

নৌকো থেকে কৃতান্তবাবু ও ছেলের দল বিদায় নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। প্রকাণ্ড ডেক, চারদিক খোলা। মাথার উপর পুরু তেরপলের ছাউনি। ডেকের শেষের দিকে কাঠের ছোট একটা কেবিন, তার পাশে বাথরুম ও পায়খানা। ছোট কেবিনটা

সুনীলা দেবীকে দিয়ে আমরা সবাই খোলা ডেকের উপর বেডিং-সুটকেস রেখে তখনকার মতো আরামে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। একটা দুর্ভাবনা গেল। এইবার আহারাদির ব্যবস্থা হলে একটু ঘুমিয়ে বাঁচি। আগের দিন ট্রেনে চোখের পাতা বুজতে পারিনি। নরেশদাকে বললাম, 'খিদে পেয়েছে নরেশদা।'

গিরিজা ও যতীনকে দশ টাকার একখানা নোট দিয়ে বললেন নরেশদা, 'যাও, কাছে কোথাও হোটেল নিশ্চয় আছে। কুলিদের বাদে আমাদের ছ'সাতজনের জন্য রাইস-কারি বা মাছের ঝোল যা পাও পাঠিয়ে দিতে বলে এস।'

এক ঘন্টার উপর হয়ে গেল যতীন বা গিরিজার দেখা নেই। যতীনের *অ্যাসিস্টেন্ট হামিদ ডেকের একপাশে কম্বল বিছিয়ে শুয়েছিল, তাকে আবার পাঠানো* হল খবর নিতে। আর মিনিট পনেরো বাদে ওরা ফিরে এল, সঙ্গে চার-পাঁচ খানা বাসি পাউরুটি আর খানিকটা ভেলি গুড় নিয়ে।

কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই যতীন বলল, 'ভাত এ তল্লাটে নেই। শুধু ডাল বা ভাত পিছু দেড়টাকা দিতে চাইলাম, পেলাম না।'

বেলাও আড়াইটে বাজে, অগত্যা চামড়ার মতো সেই শুকনো রুটি দিয়ে খাবার চেষ্টা করলাম। অসম্ভব! আমি, নরেশদা, সুনীলা দেবী খাওয়ার অভিনয় করলাম শুধু। রাজহংস, যতীন, হামিদ ও গিরিজা মিনিটদশেকের মধ্যে রুটি-গুড়ের সদ্ব্যবহার করে বোটের বাথরুমে ট্যাঙ্ক-এ রাখা পানীয় জল এক ঘটি ঢকঢক করে খেয়ে দিব্যি বেডিং পেতে ডেকের ওপর খোলা হাওয়ায় নাক ডাকাতে শুরু করল।

আমার আর নরেশদার কথা ছেড়েই দিলাম। দুঃখ হচ্ছিল বেচারি সুনীলা দেবীর জন্যে, ছেলেমানুষ, তায় ভীষণ মুখচোরা লাজুক প্রকৃতির। নরেশদা বললেন, 'এখানে এরকম অবস্থায় পড়তে হবে জানলে ওকে আনতামই না। সব দায়িত্ব যখন নিয়ে এসেছি, তখন একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।'

কেবিনে ঢুকে নরেশদা বললেন, 'সুনীলা, খাওয়া তো কিছুই হল না। আমার কাছে ভাল বিস্কুট আছে, তাই খানকতক খেয়ে একগ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

সুনীলা ঘুমোয়নি। উঠে বসে হেসে বলল, 'আপনারা আমার জন্যে কেন মিছিমিছি এত ব্যস্ত হচ্ছেন। কৃতান্তবাবুর স্ত্রী আমাকে যা খাইয়ে দিয়েছেন, রাত্রেও কিছু না খেলে চলে যাবে।'

বেলা চারটে নাগাদ যতীনকে ডেকে তুললেন নরেশদা। পর দিনের শুটিং-এর প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে। যতীন উঠে এসে বলল, 'আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছি নরেশদা, রাত্রে গোয়ালন্দের স্টীমার দশটার মধ্যে এসে যাবে। সেখানে রাইস-কারি পাওয়া যাবে, আর ওদের কাছ থেকে টাটকা রুটি, মাখন কিনে রেখে দিলে পরদিন সকালে খাওয়া হয়ে যাবে।'

খুব ভাল খবর। রাত্রে রাইস-কারির আশায় নতুন উদ্যমে পরদিনের শুটিং-এর

আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

বেলা পাঁচটার সময় কৃতান্তবাবু এসে পড়লেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুপুরে কী খেলেন?'

হেসে জবাব দিলেন নরেশদা, 'হরিমটর!'

—'তাহলে দেখছি আমার স্ত্রী ঠিকই বলেছিলেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী?'

— আপনারা চলে আসতেই আমাকে বললেন, 'এত বেলায় ওঁদের ছেড়ে দিলে, দুপুরে হয়তো খাওয়াই জুটবে না।' আমি উল্টে তর্ক করলাম—'পয়সায় বাঘের দুধ মেলে—তা—!'

বাধা দিয়ে নরেশদা বললেন, 'বাঘের দুধ হয়তো মেলে, কিন্তু চারগুণ পয়সা দিয়েও চারটি ডাল-ভাত মিলল না।'

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বোটের দক্ষিণ ধারে দাঁড়িয়ে কৃতান্তবাবু ডাকলেন, 'পাঁচু।'

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে বছর-বারোর একটি ছেলে উপরে উঠে এল । হাতে একটা তোয়ালে জড়ানো পোঁটলা। কোনও কথা না বলে পোঁটলা খুলে ফেললেন কৃতান্তবাবু। দেখা গেল একটা কলাই-এর বাটিতে রয়েছে কতকগুলো পরোটা ও আলুর চচ্চড়ি। সুনীলাকে দু'খানা পরোটা ও আলুর চচ্চড়ি দিয়ে আমরা সবাই শকুনের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বাটিটার উপর। মিনিটপাঁচেক কথা-বার্তা নেই, শুধু মুখের একটা অব্যক্ত একঘেয়ে আওয়াজ—ব্যস, বাটি পরিষ্কার। দেখলাম আমাকে ও নরেশদাকে পাঁচ লেংথ দূরে ফেলে নেক-টু-নেক বাজি জিতল রাজহংস, যতীন ও গিরিজা। যাই হোক, দু'তিন গ্লাস জল খেয়ে বাঁচলাম যেন।

কৃতান্তবাবু বললেন, 'আপনার নৌকা ঠিক হয়ে গেছে, দাম পড়বে দেড়শো টাকা। অন্য সময় হলে দশ-পনেরো টাকায় ভাড়া পেতেন। ডুবোনোর পর ওরা অনায়াসে আবার তুলে নিতে পারবে। কিন্তু এখন কাছে পিঠে ডুবলেও চোরাটানে নৌকা বিশ-ত্রিশ হাত দূরে চলে যাবে। বর আর বরযাত্রীরা যে নৌকোয় যাবে, সেটা ভাড়া পাওয়া যাবে, সমস্ত দিন আপনার হুকুম মতো চলবে—ভাড়া দশ টাকা।'

. সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। কৃতান্তবাবু বললেন, 'এইবার হ্যারিকেন বা আলোর ব্যবস্থা যদি থাকে করুন, আপনার টাকার হিসেবটা দিয়ে যাই।'

নরেশদা বললেন, 'সেসব কিছুই তো আনিনি। ওসব যে দরকার হতে পারে, খেয়ালই করিনি।'

নরেশদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কৃতান্তবাবু পাঁচুকে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, 'একেবারে তেল, সলতে পরিয়ে দুটো হ্যারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে আসতে।'

আজেবাজে গল্পে সময় কাটতে লাগল। ততক্ষণ সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে

যমুনার বুকে। ঘুটঘুটে আঁধারে প্রেতের মতো বসে আছি আমরা ক'জন, গাধাবোটের ডেকে পুরু তেরপলের নিচে, আলো আর আসে না।

কৃতান্তবাবু বললেন, 'বন্যার পর এ অঞ্চলে চুরির উপদ্রব খুব বেড়ে গেছে। রাত্রে একটু সজাগ থাকবেন দু' একজন, নইলে নিঃশব্দে বোটের পাশ দিয়ে উঠে দু একটা সুটকেস নিয়ে সরে পড়লে জানতেও পারবেন না। একটা আলো অন্তত ডেকের উপর সারারাত জ্বালিয়ে রাখতে ভুলবেন না।'

হ্যারিকেন লণ্ঠন এসে গেল। একটা সুনীলা দেবীর কেবিনে দিয়ে অন্যটা দড়ি দিয়ে তেরপলের বাঁশের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম সবাই। কৃতান্তবাবু বললেন, 'যে কয়দিন এখানে থাকবেন, একখানা ছোট নৌকো দিনরাত ভাড়া করে রেখে দেবেন গাধাবোটের পাশে। বোট থেকে এক-পা বাড়াতে হলেই নৌকোর দরকার। আমি এনেছি একখানা। যদি রাখেন, তাহলে আজ রাত থেকেই ও এখানে থাকবে—চব্বিশ ঘন্টার ভাড়া দশ টাকা।'

নরেশদা সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। কৃতান্তবাবু বোটের ধারে গিয়ে হাঁক দিলেন, 'ফুলমিঞা!' লুঙ্গিপরা বছরত্রিশের একটি দাড়িওয়ালা মুসলমান উপরে উঠে সেলাম করে দাঁড়াল।

মোটামুটি ব্যবস্থা করে কৃতান্তবাবু যখন বাড়ি যাবার জন্য বিদায় নিলেন, তখন রাত দশটা বেজে গেছে। বেডিং খুলে শুয়ে পড়লাম। অন্য সময় হলে খোলা হাওয়ায় তখনই ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু ঘুম এল না, এল রাজ্যের খিদে। খিদে জিনিসটার একটা মজা লক্ষ্য করলাম। যদি বোঝা যায়, খাদ্যের প্রচুর ব্যবস্থা রয়েছে, হাজার খিদে পেলেও সহ্য করে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যেখানে খাদ্যের কোনো ব্যবস্থা নেই এবং চেষ্টা করেও কিছু মেলে না সেখানে ক্ষুধার তাড়না অসহ্য। ঘুমোবার বৃথা চেষ্টা না করে উঠে ডেকের উত্তর দিকে যমুনার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

কৃষ্ণপক্ষের কালো ঘুটঘুটে আকাশ, নদীর বুকে তারই ছায়া। চেষ্টা করেও আর কিছু দেখাই যায় না, শুধু ডেকের হ্যারিকেনের ছোট একটা আলোর ফালি কিছু দূরে স্রোতের ওপর অপরাধীর মতো থরথর করে কাঁপছে। দূরে কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকায়— কালোর রাজ্যে ঐটুকু আলোর ঝিলিক আরো ভয়ানক দেখায়। বাতাসের একটানা সোঁ সোঁ আওয়াজ, নদীর গর্জন তালগোল পাকিয়ে এক অব্যক্ত রূপ নিয়ে কানে ভেসে আসছে। মনে হল, প্রলয়ের সূচনা নয়, প্রলয় শুরু হয়ে গেছে। কতক্ষণ এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে বসেছিলাম মনে নেই। কানে এল গুরুগম্ভীর আওয়াজ, বোঁ-ও-ও-ও, সঙ্গে দিশেহারার মতো একটা পাওয়ারফুল সার্চলাইট একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, একবার আকাশের দিকে চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

গোয়ালন্দের স্টীমার এতক্ষণে আসবার সংকেত জানিয়ে দিলে। রাজহংস, যতীন ও গিরিজা স্টীমারের বাঁশির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে রেডি। প্যান্ট পরাই ছিল, জুতোটা পরে নিয়ে বেডিং-এর পাশ থেকে কোটটা গায়ে চাপিয়ে দিল। তখনও বহুদূরে স্টীমার দুরন্ত স্রোতের বিপরীতে একটু একটু করে এগোচ্ছে। হাতঘড়ি দেখে নরেশদা জানালেন এগারোটা বেজে গেছে। প্রচণ্ড হাওয়া তার সঙ্গে স্টীমারের আওয়াজ ও বাঁশি। দু'হাত দূরে থেকেও কথা শোনা যায় না।

আমায় ইশারায় কাছে ডেকে নরেশদা বলল, 'রাজহংসের উৎসাহটা যেন সব চেয়ে বেশি। তুমি যতীনকে বল কিছু টাকা নিয়ে যেতে।'

কাছে গিয়ে টাকার কথা বলতেই যতীন বলল, 'টাকা আমার কাছে আছে, পরে দিলেই চলবে।'

গাধাবোটের পাশে বাঁশ, তক্তা ও উপড়ে-পড়া মোট মোটা আস্ত গাছ দিয়ে টেম্পরারি ঘাট তৈরি হয়েছে স্টীমারের জন্যে। মিনিটপনেরো বাদে চারপাশের জল তোলপাড় করে নোঙর ফেলল স্টীমার। তারপর চওড়া তক্তা পেতে দিল ঘাটের উপর। অসংখ্য ভিড়। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে নামতে শুরু করল প্যাসেঞ্জারের দল। পিছন ফিরে দেখি এরই মধ্যে রাজহংস, যতীন ও গিরিজা—ফুলমিঞার নৌকা করে নাচতে নাচতে চলেছে স্টীমার ঘাটের দিকে। সুনীলা দেবীর কেবিনের সামনে দাঁড়ালে স্টীমার ঘাট স্পষ্ট দেখা যায়, আস্তে আস্তে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কাঁধে হাত পড়তেই চমকে দেখি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন নরেশদা। খুবই গম্ভীর। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ইশারা করে ডেকের উপর পুবদিকের শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'রাজহংসের কাণ্ড শুনেছ?'

অবাক হয়ে বললাম, 'না তো, আবার কী করল?'

'কৃতান্তবাবু চলে যাবার পর আমি তো শোয়ামাত্রই ঘুমে অচেতন। তুমিও ঘুমিয়েছিলে বোধহয়?'

বললাম, 'না, খুব খিদে পেলে আমার ঘুম আসে না। তাই উঠে গিয়ে অন্ধকারে ডেকের ওপর বসেছিলাম।'

কী যেন ভাবলেন নরেশদা, তারপর বললেন, 'ওর সাহস ও স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গেছি।'

ব্যাপার গুরুতর। বললাম, 'কী করেছে নরেশদা?'

—'সবাই যখন ঘুমুচ্ছে, সেই সময় ব্যাটা রাজহংস সুনীলার কেবিনে ঢুকে পড়েছিল।'

আঁতকে উঠে বললাম, 'বলেন কী?'

'রক্ষে মেয়েটা ঘুমোয়নি, তখনই উঠে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি আমার কেবিনে কেন?'

অপ্রস্তুত হয়ে ব্যাটা আমতা আমতা করে বলে, 'বাথরুমে যেতে গিয়ে ভুল করে ঢুকে পড়েছি। পাশাপাশি কি না!'

কথা শেষ করে নির্লজ্জের মতো হাসতে থাকে রাজহংস।

যাবার নামও করে না দেখে সুনীলা বলে, 'আপনি আমার কেবিন থেকে দয়া করে বেরিয়ে যান।'

রাজহংস বলে, 'অত ব্যস্ত কেন? সবাই তো ঘুমুচ্ছে। কেউ কিছু জানতে পারবে না। হ্যাঁ, তার আগে তোমায় একটা কথা বলতে চাই।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সুনীলা বলে, 'কী কথা?'

উত্তরে রাজহংস বলে, 'কলকাতায় গিয়ে তোমায় আমি বিয়ে করব। দেশে, মানে পাঞ্জাবে, আমার জমিদারি আছে, তাছাড়া ম্যাডানে মোটা টাকা মাইনে পাই। নরেশবাবুর 'নৌকাডুবি' ছবিটা শেষ হয়ে গেলেই আমি হিন্দি ছবির ডাইরেকশান দেব। তাতে তোমায় আমি হিরোইন করব।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে সুনীলা বলে, আপনি এই মুহূর্তে যদি বেরিয়ে না যান, তাহলে আমি বাইরে গিয়ে সবাইকে ডেকে তুলব। তখন অগত্যা ব্যাটা ভয়ে ভয়ে এসে আবার শুয়ে পড়ে।'

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। একটু পরে বললাম, 'আপনি তো ওর কেবিনের পাশেই শুয়েছিলেন, তাছাড়া ঘরে একটা হ্যারিকেনও জ্বলছিল। এতখানি সাহস—'

বাধা দিয়ে নরেশদা বললেন, 'আমি যদি একটু আগেও জানতে পারতাম বা ঘুমটা ভেঙে যেত। আর একটা কী মুশকিল হয়েছে জান? কেবিনের দরজা নেই। তাহলে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে সব গোল মিটে যেত। তাছাড়া এই ঝড়ো হাওয়ায় জেগে থাকলেও কিছু শুনতে পেতাম না।'

বললাম, 'এ সব কথা আপনাকে বলল কে?'

—'ওরা স্টীমারে চলে যাবার পরই সুনীলা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে আমায় সমস্ত বলল। কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা। বলছে, 'কাল সকালেই আমায় কলকাতায় পাঠিয়ে দিন।' তা না হয় দিলাম। কিন্তু বিদেশে এরকম একটা কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে পড়লে আমাদের মুখ দেখানো দুষ্কর হয়ে পড়বে। তরপর কলকাতায় গিয়ে সাহেবদেরই বা বলব কী?'

বললাম, 'তার চেয়ে এক কাজ করুন নরেশদা। যত অশান্তির মূল ঐ রাজহংসকে সকালের গাড়িতে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন। ওকে বলুন—এখানে তোমার দরকার হবে না, তাছাড়া ফ্রামজীকে আমি বলে এসেছি দুদিন বাদেই তোমায় ছেড়ে দেব। সুনীলা দেবীকে আমরা পাঁচজনে বুঝিয়েসুঝিয়ে শান্ত করব।'

অকূলে কূল পেলেন নরেশদা। বললেন, 'ঠিক বলেছ। তাই করব। তবে এখন

এ সব কথা কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। আমরা যেন কিছুই জানি না।'

নিঃশব্দে দুজনে নরেশদার বেডিং-এর উপর এসে বসলাম। সুনীলা দেবী তখনও কাঁদছেন। বললাম, 'মানুষের চামড়ায় ঢাকা কতকগুলো জানোয়ার আমাদের মধ্যে সব সময় ঘুরে বেড়ায়। এমনিতে তাদের চেনা যায় না—যায়, যখন কথা বলে বা জানোয়ারোচিত কিছু করে বসে। তাদের উপর রাগ বা অভিমান করা ভুল সুনীলা দেবী। বরং বাঘ বা সাপের মতো ওদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি নিশ্চিন্ত মনে কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর যে হবে না সে বিষয়ে আপনাকে কথা দিলাম।'

নরেশদা বললেন, 'এখুনি ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে কেলেঙ্কারিটা ছড়িয়ে পড়বে আর আমাদের ইউনিটের বদনাম হবে। তুমি এ নিয়ে আর কারো কাছে উচ্চবাচ্য করো না।'

বুদ্ধিমতী মেয়ে সুনীলা আর কোনো কথা না বলে নিজেকে সংযত করে আস্তে আস্তে কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। হাতঘড়ি দেখেই নরেশদা নীরবতা ভাঙলেন, 'ব্যাপার কী ধীরাজ? এক ঘন্টা হতে চলল এখনো ওদের দেখা নেই!'

সত্যি, ভাবনার কথা। উঠে দেখতে যাব, দেখি দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তিন মূর্তি উপরে উঠছে। গিরিজা উপরে উঠে জুতো-জামা খুলে শুয়ে পড়ল। রাজহংস ও যতীন আমাদের কাছে দাঁড়াল। পকেট থেকে কাগজ মোড়া তিনখানা গ্রেট ইস্টার্নের রুটি ও দু'টিন মাখন বের করে নরেশদার বেডিং-এর উপর রেখে যতীন বলল, 'অনেক কষ্টে এই যোগাড় হল। আগে থেকে অর্ডার না দিলে রাইস-কারি পাওয়া যায় না। কাল রাত থেকে ঠিক পাবেন, আমি অর্ডার দিয়ে পাঁচ টাকা অ্যাডভান্স করে এসেছি।'

একটু রেগেই জিজ্ঞাসা করলেন নরেশদা, 'তা এই রুটি-মাখন আনতে এক ঘন্টা লাগল?'

যতীন বলল, 'সে কথা জিজ্ঞাসা করুন আপনার সুপারভাইজারকে।'

—'আমার সুপারভাইজার?' অবাক হয়ে বললেন নরেশদা।

যতীন বলল, 'হ্যাঁ, জাহাজে সবার কাছে রাজহংস পরিচয় দিয়েছে ওই বলে। আরো বলেছে সাহেবরাই নাকি জোর করে পাঠিয়েছে ওকে। এসব ডিফিকাল্ট সিন একা নরেশবাবু পেরে উঠবেন না, তাই নিজের ক্ষতি করেও আসতে হয়েছে ওকে।'

হ্যারিকেনের আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম রাগে ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে নরেশদার। অন্ধকারে একখানা হাত বাড়িয়ে নরেশদার হাঁটুতে একটা চাপ দিলাম। নিমেষে নিজেকে সংযত করে নরেশদা বললেন, 'এই এক রাশ

মিথ্যে কথা বলে কিছু লাভ করতে পেরেছে রাজহংস?'

—'সিওর।' বলে সামনে এগিয়ে এসে রাজহংস বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল, 'তিন প্লেট রাইস-কারি'। কথাটা শেষ করেই প্রকাণ্ড ভুঁড়িটায় হাত বুলোতে বুলোতে হো-হো করে হাসতে লাগল রাজহংস।

ঘেন্নায় সারা দেহমন রি রি করে উঠল। আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। একটি মাত্র মেয়ে সারাদিন না খেয়ে রয়েছে—তার কথা একবার চিন্তামাত্র না করে, নিজের লোভী উদর পূর্ণ করে যে লোক গর্ব করে বলে, এ ভাবে নির্লজ্জের মতো হাসতে পারে, সে যে মানুষ নয় তাতে সন্দেহ নেই। জানোয়ার হলেও কোন্ শ্রেণীর, সেটাও রীতিমত গবেষণার বিষয়।

যতীন বলল, 'আর বাহাদুরি করো না, তুমি তো রীতিমত চালাকি করে মিথ্যে কথা বলে খেয়েছ। জানেন নরেশদা, ওরা যখন বলে দিল আগে থেকে অর্ডার না দিলে রাইস-কারি পাওয়া যাবে না, রাজহংস তখন সটান ঢুকে পড়ল বাবুর্চিখানায়। তারপর হেড বাবুর্চিকে নিজের কলকাতার ঠিকানা দিয়ে এবং তার ছেলেকে বায়োস্কোপে চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে ওদের খাবারগুলো সাবাড় করে দিয়ে এল।'

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে তেমনি হাসতে হাসতে জবাব দিলে রাজহংস, 'কী জানেন নরেশদা, খিদে পেলে আমার বাপ-মার কথাও মনে থাকে না।'

পাঞ্জাবী রসিকতা বাংলা শাড়ি পরে শুধু শাড়িটারই অপমান করে গেল।

কষ্টে নিজেকে সংযত করে রেখে নরেশদা বললেন, 'যাও শুয়ে পড়ো, কাল সকালে অনেক কাজ।'

সবাই শুয়ে পড়লে বেডিংটা কেবিনের দরজার সামনে টেনে এনে নরেশদা বললেন, 'রুটি-মাখন খাবে নাকি?'

হেসে জবাব দিলাম, 'বৈষ্ণব-সঙ্গীতের একটি গানের কলি হঠাৎ মনে পড়ে গেল নরেশদা—

হরিনাম সুধা, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব হরেছে।

আজ সন্ধ্যে থেকে যা সব কাণ্ড ঘটছে—দেখেশুনে ও দুটোর অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব করছি না।' রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। দুজনে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। ঘুম এল না, সে চেষ্টাও করিনি। এলোমেলো চিন্তার জট পাকাতে পাকাতে ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। কানের কাছে বেজে উঠল স্টীমারের বাঁশি। লাফিয়ে উঠে দেখি সবাই উঠে পড়েছে। নরেশদা ডেকের উপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'ইচ্ছে করেই তোমায় ডাকিনি, আমি উঠেছি অনেক আগে, হামিদকে কেটলি দিয়ে পাঠিয়েছি স্টীমারের চায়ের জন্যে।'

বাথরুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি করে মুখ হাত ধুয়ে এলাম। সুনীলা দেবীর কেবিনে

ব্রেকফাস্টের আয়োজন। দেখি এরই মধ্যে রুটি কেটে তাতে মাখন লাগানো হয়ে গেছে। অসম্ভব খিদে পেয়েছিল, চায়ের অপেক্ষায় থাকতে পারলাম না। দু'তিনখানা রুটি শেষ করে ফেললাম। চা এসে গেল, নরেশদা সবাইকে ডাকলেন। সবাই এল, রাজহংসকে দেখতে পেলাম না। নরেশদার দিকে চাইতেই বেশ সহজভাবে বললেন নরেশদা, 'রাজহংসকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম ধীরাজ। এখানে ওর না থাকলেও চলবে। কিন্তু কলকাতায় ওকে না হলে ফ্রামজীর চলবে না। সাহেব আমায় বলেও দিয়েছিল দু'এক দিনের বেশি না রাখতে।'

একটা নোংরা জটিল ব্যাপারের সহজ মীমাংসায় মনটা অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল।

একটু পরেই স্টীমার ছেড়ে দিল। যতীন বলল, 'এইবার ট্রেন ছাড়বে, যাই একবার বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

যতীন, গিরিজা, হামিদ চলে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী করে ম্যানেজ করলেন?'

'সকালে সবার ঘুম ভাঙবার আগেই ওকে ডেকে নিয়ে ডেকের ধারে গেলাম। তারপর বললাম, 'ভেবেছিলাম দিন দুয়ের মধ্যেই সিনগুলো তুলে নিতে পারব, কিন্তু এখন দেখছি দেরি হবে। সাহেবকে সেই ভেবেই কথা দিয়ে এসেছিলাম, আর তাছাড়া এখানে কৃতান্তবাবুদের এতখানি আন্তরিক সহযোগিতা পাব ভাবিনি। কাজেই আর দেরি না করে সকালের ট্রেনেই তুমি চলে যাও।'

বললাম, 'কী বলল রাজহংস?'

—'বলবার কোনও ফাঁকই তো রাখিনি। তবুও দুচারবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেছিল। কোন ফল হবে না বুঝতে পেরেই বোধহয় আমার কাছ থেকে ট্রেনভাড়া নিয়ে আস্তে আস্তে বোট থেকে নেমে গেল।'

হুইসল্ দিয়ে ট্রেনও ছেড়ে দিল। একটু পরেই যতীনদের দল এসে গেল। আমরাও রেডি হয়ে ফুলমিঞার নৌকো নিয়ে কৃতান্তবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হয়ে পড়লাম। স্টীমারে রইল হামিদ আর কুলি চারজন। যতীন হামিদকে বলে গেল, 'যদি বুঝি আজই সিন নেওয়া হবে তাহলে নৌকো পাঠিয়ে দেব। তুমি ক্যামেরা ও দুজন কুলি নিয়ে চলে আসবে।'

কৃতান্তবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। ডোঙা-নৌকো ও কলাগাছের ভেলা বাড়ির চারপাশে বাঁধা। সবাই শুটিং দেখতে এসেছে, ছেলের সংখ্যাই বেশি। আর একবার চা খাওয়ার পর কৃতান্তবাবু নরেশদাকে বাইরে নিয়ে এসে নৌকো দেখালেন দেড়শো' টাকায় যেটা কেনা স্থির হয়েছে। বেশ বড় নৌকো, অনেক পুরোনো বলে তক্তাগুলো মাঝে মাঝে ক্ষয়ে গেছে। সামান্য চেষ্টায় তলায় দু-তিনটে ফুটো করে অনায়াসে ডোবানো যায়।

নরেশদা বললেন, 'ঠিক আছে। উপরে শুধু একটা ছই তৈরি করে নিতে হবে। দরমা চট খড় যা হোক দিয়ে একটা আচ্ছাদন বিশেষ দরকার। কনে আর পাঁচ-সাতজন বরযাত্রী বসতে পারে, এমনিভাবে ওটা তৈরি করতে হবে! আর যেটায় বর যাবে, সেটাও ঠিক ঐ একই ধরনের হবে।'

কৃতান্তবাবুর হাতে নরেশদা দেড়শো টাকা গুনে দিলেন।

ব্যায়াম-ক্লাবের সেক্রেটারি সমীর ইশারায় আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ধীরাজবাবু! যা শুনছি একি সত্যি?'

বললাম, 'কী শুনেছেন?'

—'এই যে সত্যি-সত্যি নৌকো ডোবানো আর তার সঙ্গে সুনীলা দেবীও জলে ডুবে যাবেন।'

বললাম, 'রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' বইটা নিশ্চয় পড়েছেন, তাতে তো তাই লেখা আছে।'

—'কিন্তু এই নদী সম্বন্ধে কোনও আইডিয়া নেই আপনাদের। তাই ওরকম মারাত্মক সিন তুলতে সাহস করছেন। তাছাড়া, সুনীলা দেবী সাঁতার জানেন না।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সে খবর এর মধ্যে আপনি জানলেন কী করে?'

—'একটু কৌশল করে জানতে হয়েছে। কাল থেকে এ ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ক্লাবে আলোচনা চলছিল। আজ সকালে বোন জয়াকে বলেছিলাম যে সুনীলা দেবী সাঁতার জানেন কি না, খবরটা জেনে আমায় বলতে। এইমাত্র জয়া জানিয়ে গেল।'

পিছন ফিরে ঘরের মধ্যে চাইতেই দেখি সুনীলা দেবীকে ঘিরে মেয়েদের রীতিমত ভিড় জমে গেছে।

সমীর বলল, 'আর সাঁতার জানলেও এখানকার নদীতে সাঁতার কাটার নাম করতে সাঁতারুরাও ভয় পায়। আপনার পরিচালক মশায়কে জানিয়ে দিন—ওসব সিন এখানে নেওয়া চলবে না।'

বললাম, 'কিন্তু নগদ দেড়শো টাকা দিয়ে নৌকা পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে।'

অম্লানবদনে বলল সমীর, 'মাঝিকে ডেকে আনছি। টাকা ফেরত নিন।'

জটিল ব্যাপার, আমার দ্বারা মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। নরেশদাকে গিয়ে সমীরের কথাগুলো বললাম। এগিয়ে এসে সমীরকে বললেন নরেশদা, 'সে কি মশাই! কলকাতা থেকে এত কষ্ট করে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যই হল ওই 'সিন'টা নেওয়া। এখন আপনারা যদি বলেন—'

বাধা দিয়ে সমীর বলল, 'আমাদের মতামত নিয়ে যদি আসতেন তাহলে আসতে বারণই করতাম।'

—'এখন উপায়? ও মশাই কৃতান্তবাবু?' বলেই ঝুপ করে হতাশভাবে বসে

পড়লেন নরেশদা পাশের চেয়ারটায়। কৃতান্তবাবু মাঝিদের সঙ্গে দর কষাকষি করছিলেন। কাছে এসে বললেন, 'ব্যাপার কী নরেশবাবু?'

—'আর ব্যাপার! ছেলের দল বায়না ধরেছে, সুনীলা দেবীকে জলে ডোবানো চলবে না।'

কথা অনেক রকমের আছে, শুধু বলার ধরনের উপর ভালমন্দ ফলাফল নির্ভর করে। নরেশদার কথায় সমীর বেশ চটেই জবাব দিলে, 'আব্দার অনুরোধ নয় মশাই, যেটা আপনাদের করতে দেওয়া হবে না সেইটে জানিয়ে দিলাম।'

কৃতান্তবাবু মধ্যস্থ হয়ে আর বেশি দূর এগোতে দিলেন না। নরেশদাকে ধরে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে বাইরে এসে সমীরকে বললেন, 'ছিঃ সমীর। ওঁরা কলকাতা থেকে আমাদেরই কাছে এসেছেন। তোমাদের ভরসাতেই আমি ওঁদের এতখানি সাহস দিতে পেরেছি। কোথায় তোমরা সবাই মিলে সাহায্য করবে যাতে নির্ব্বিবাদে সিনগুলো তুলে নিতে পারেন, তা নয় উল্টে বাধা দিচ্ছ?'

সমীরের রাগ তখনও পড়েনি, বলল, 'নরেশবাবুর কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। আমরা ওঁদের সৎ পরামর্শই দিতে এসেছিলাম। কেননা এখানকার যমুনা সম্বন্ধে ওঁদের কোনও আইডিয়াই নেই। উনি চাইছেন মাঝনদীতে ঐ একফোঁটা মেয়েকে নৌকোসুদ্ধ ডুবিয়ে রিয়েলিস্টিক সিন তুলতে। এ তো রীতিমত মার্ডার স্যার!'

—'মার্ডার!' আঁতকে উঠলাম।

—'নয়তো কী ধীরাজবাবু? মেয়েটি সাঁতার জানলে তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত, কিন্তু এ অবস্থায় ওঁকে বাঁচানো নামকরা সাঁতারুদেরও সাধ্যের বাইরে।'

কৃতান্তবাবু বললেন, 'কিন্তু মাঝদরিয়ায় নৌকাডুবি না করে কাছাকাছিও তো হতে পারে।'

সমীর বললে, 'কাছাকাছি হলেও যদি স্রোত বা টান থাকে তাহলে ঐ একই অবস্থা হবে।'

—'তাহলে উপায়?' এবার হতাশভাবে নরেশদার চেয়ারটায় বসে পড়লেন কৃতান্তবাবু। সুনীলা দেবীর সঙ্গে আর একটি ফুটফুটে ষোড়শী মেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল, চমৎকার স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি, একদৃষ্টে চেয়ে আছি। আমাদের সবার উপর চোখ বুলিয়ে সমীরকে বলল মেয়েটি, 'দাদা, সুনীলাদিকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, এখুনি ঘুরে আসব। তোমাদের নৌকাটা একবার দাও না।'

গম্ভীরভাবে সমীর বলল, 'ঐ তো বারান্দার থামে বাঁধা আছে—নিয়ে যা!'

অভিজ্ঞ মাঝির মতো ঝুপ্ করে লাফিয়ে পড়ল জয়া নৌকার উপর, তারপর হাত ধরে আস্তে আস্তে সুনীলাকে তুলে নিল নৌকায়।

নৌকার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমীর বলল, 'একা অসহায় অভিভাবকশূন্য

মেয়েটিকে নিয়ে আপনারা যদি যা খুশি তাই করতে চান আমরা তাতে বাধা দেব।'

অবাক হয়ে জয়ার দিকে চেয়ে আছি। দেখলাম থাম থেকে মোটা দড়ির কাছিটা খুলে নিয়ে নৌকার পাশে মাটিতে পোঁতা লম্বা বাঁশটা অনায়াসে একটানে তুলে নিল জয়া। তারপর আশেপাশে বাঁধা অসংখ্য ডোঙা আর নৌকাগুলোর ভিতর দিয়ে নৌকা বেয়ে চোখের নিমেষে দক্ষিণদিকে ঘন গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডোঙায় করে দুটি ছেলে এসে সমীরকে ডেকে চুপি চুপি কী বললে। পরক্ষণেই দেখি ছেলের দল ঝুপঝাপ্ করে লাফিয়ে নৌকায় আর ডোঙায় উঠে জোরে লগি মারতে মারতে স্টেশনের দিকে চলে গেল।

অবাক হয়ে কৃতান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী মশাই?'

কৃতান্তবাবু বললেন, 'ওদের রিলিফের ব্যাপার বোধহয়, রাতদিন ছেলেগুলো ঐ করে বেড়াচ্ছে।'

ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি একটা মোটা তাকিয়া বালিশের উপর হাতের কনুই দুটো রেখে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছেন নরেশদা। পাশে বসে পড়তেই ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন নরেশদা, তারপর বললেন, 'সুনীলার কোনও অভিভাবক সঙ্গে না এনে কী সর্বনাশই যে করেছি, তাই ভাবছি। অনেক মাথা খাটিয়ে রাজহংসের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ভাবলাম—যাক, ফাঁড়া বোধহয় কাটল। ও বাবা! এবার পড়েছি ব্যায়াম সমিতির পাল্লায়!'

বললাম, 'সমীরের কথাগুলো সব শুনেছেন?'

'সব, গোটা সিরাজগঞ্জই এখন সুনীলার অভিভাবক। বোনটাকে দিয়ে ফুসলে নিয়ে গেল মেয়েটাকে, দ্যাখো আবার কি ভুজুংভাজুং দ্যায়, হয়তো আটকে রেখে দেবে, নয়তো—'।

কৃতান্তবাবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আর একবার চায়ের ব্যবস্থা করি, আর দেখি গিন্নিকে বলে যদি কিছু হালুয়া—দুপুরে যা খাবেন তাতো বুঝতেই পারছি।'

কৃতান্তবাবু ভিতরে চলে যেতেই নরেশদাকে বললাম, 'তাহলে কী ব্যবস্থা করবেন নরেশদা, কাল সকালে তো শুটিং করতেই হবে।'

—'আর শুটিং। আসল কনেসুদ্ধ-নৌকাডুবির সিনটা যদি তুলতে না দেয় কী হবে অন্য সিন নিয়ে।'

'কিন্তু ওরা যে কথাটা বলছে সেটাও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না নরেশদা।'

'হুঁ।' বলে ঘাড় গুঁজে বসলেন নরেশদা।

উঠে বারান্দায় এসে দেখি গিরিজা ও যতীন পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে বসে আছে। বললাম, 'কী যতীন, ব্যাপার কেমন বুঝছ?'

ম্লান হেসে যতীন জবাব দিলে, 'আমি শুধু ভাবছি, কোম্পানির দামি ক্যামেরাটা অক্ষত অবস্থায় কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে যে কী হবে!'

গিরিজা বললে, 'হবে যা তাতো বুঝতেই পারছি, পেটে খেলে পিঠে খানিকটা সইত, কিন্তু খালিপেটে—রাজহংসটা থাকলে তবু খানিকটা লড়তে পারত, তা সবাই মিলে দিলে তাকে—।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'ছাই, কাল ওর সাহসের যা নমুনা পেয়েছি তাতে গোলমালের সূত্রপাতে সবার আগে ওই চম্পট দিত।'

দূরে দেখা গেল যমুনার ধার ঘেঁষে দুরন্ত স্রোতের অনুকূলে বইঠা বেয়ে তীরবেগে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে জয়া। একটু কাছে এলে দেখা গেল সুনীলা বসে আছে নৌকোর মাঝখানে, ভয়ে বিবর্ণ মুখ। কাছে এসে অনায়াসে ডানদিকে দু'হাতে বইঠা ধরে নৌকা ঘুরিয়ে নিল জয়া কৃতান্তবাবুর বাড়িমুখো, তারপর নিমেষে বইঠা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁশের লগি বেয়ে নৌকো নিয়ে দাঁড়াল এসে বারান্দার ধারে। দড়ির কাছিটা ছুঁড়ে বারান্দায় ফেলতেই সেটা নিয়ে জড়িয়ে দিলাম থামের সঙ্গে।

যতীন, আমি, গিরিজা তিনজনেই অবাক হয়ে দেখছিলাম এই মেয়েটার কাণ্ডকারখানা। শাড়িটাকে গাছকোমর করে বেঁধে নিয়ে নৌকো থেকে একরকম লাফিয়ে উঠল জয়া বারান্দায়। তারপর বারান্দা থেকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'এসো সুনীলাদি।'

দোলায়মান নৌকোর উপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না সুনীলা। উঠে দাঁড়িয়েই ঝুপ করে বসে পড়ে। কোনও রকমে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এসে উঠে দাঁড়িয়ে খপ করে জয়ার প্রসারিত হাত দুটো ধরে ফেলল। অসাধারণ শক্তি ধরে ঐ একফোঁটা মেয়ে জয়া, একরকম টেনেই সুনীলাকে বারান্দায় তুলে নিল। সাড়া পেয়ে কৃতান্তবাবু ও নরেশদাও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। জয়া মিনিটখানেক আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, 'আপনিই নায়ক ধীরাজবাবু?'

লজ্জা পেলাম, চোখ নামিয়ে অপরাধীর মতো বললাম, 'হ্যাঁ।'

সেই একইভাবে আমার দিকে চেয়েই জয়া বলল, 'আপনার নায়িকাকে সবাই মিলে ডুবিয়ে মারার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, আর আপনি বিনা প্রতিবাদে তাতে সম্মতি দিচ্ছেন?'

ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন, জবাবটাও সেই রকম দিলাম, 'সম্মতি না দিলে বা বাধা দিলে ছবিটার নাম 'নৌকাডুবি' পালটে 'রাখে কেষ্ট মারে কে' গোছের একটা দিতে হয়।'

খুশি হল না জয়া। কৃতান্তবাবুকে বলল, 'কাকাবাবু! সুনীলাদিকে না ডুবিয়ে আমায় ডোবান না কেন? আমি বলছি দাদা বা কারও আপত্তি হবে না। আপনারা মাঝদরিয়ায় ভরাডুবি করলেও আমি ডুব সাঁতার দিয়ে অনায়াসে চলে আসতে পারব।'

উত্তর দিলেন নরেশদা। কাছে এসে জয়ার কাঁধে হাত দিয়ে ম্লান হেসে বললেন,

'তাতে যদি আমার কাজ হত মা তাহলে কখনই এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে যেতাম না। বাড়ি থেকে বর-কনে নৌকায় উঠবার আগে ঘোমটার ভিতর দিয়ে কনের মুখ দেখিয়ে দর্শককে জানিয়ে দিতে হবে যে, বিয়ের কনেই নৌকায় উঠল। নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে, ক্যামেরাও এগিয়ে যাবে। তারপর লোকালয় ছেড়ে মাঝনদীতে ঘটবে দুর্ঘটনা।'

ভিতর থেকে চিঁড়ে-ভাজা, হালুয়া আর চা এসে গেল। কথা বন্ধ করে সবাই সেগুলোর সদ্ব্যবহারে মন দিলাম। জয়া বলল, 'সুনীলাদি কিছু খাবেন না। আমাদের ওখান থেকে ভাত খেয়ে এসেছেন।' দ্বিরুক্তি না করে গিরিজা সুনীলার প্লেটখানা টেনে নিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে যথারীতি বিদায় নমস্কার করে কৃতান্তবাবুকে সন্ধ্যেবেলায় গাধাবোটে আসতে বলে আমরা নৌকায় উঠলাম। দেখি একপাশে ম্লান মুখে থামে হেলান দিয়ে জয়া দাঁড়িয়ে আছে।

নৌকা চলতে চলতে শুনলাম কৃতান্তবাবু জয়াকে বলছেন, 'খুব দুঃখ পেলে মা?'

জয়া বললে, 'হ্যাঁ কাকাবাবু! তিন-তিনবার সাঁতারে ফার্স্ট হয়েও এমন চমৎকার একটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলাম না, আর দুঃখ হচ্ছে সুনীলাদির জন্যে।'

আর কিছু শুনতে পেলাম না। নৌকা তখন স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছে স্টেশনের দিকে।

সন্ধ্যার কিছু আগে কৃতান্তবাবু এলেন আমাদের বোটে। পরদিন সকালে শুটিং-এ কাকে কাকে বরযাত্রী নেওয়া হবে, ক'খানা নৌকা ভাড়া করতে হবে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় লিস্ট তৈরি হয়ে গেল।

বরকনে বিদায় দেওয়ার সিনে উলু দেওয়া, শাঁখ বাজানো প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কতকগুলি মেয়ের বিশেষ প্রয়োজন। কৃতান্তবাবু বললেন, 'সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না, আমার স্ত্রী, জয়া, জয়ার মা এঁরা তো থাকবেনই। আরও কাছাকাছি কয়েকটি পরিবার থেকে মেয়েদের আমি সকালে নৌকা করে আনিয়ে নেব।'

বরের চেলির জোড়, গরদের পাঞ্জাবি, টোপর, কনের বেনারসি, গয়না—মায় আলতা-সিঁদুর পর্যন্ত স্টুডিওর ড্রেসার নারাণ একটি টিনের তোরঙ্গে সাজিয়ে দিয়েছে। গিরিজার উপর সেগুলোর ভার। নরেশদা বললেন, 'একবার দ্যাখো সব ঠিক আছে কি না।'

সব ঠিকঠাক করে কৃতান্তবাবু নরেশদাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে।'

দুজনে উঠে ডেকের অপর প্রান্তে অন্ধকারে চলে গেলেন। অনুমানে বুঝলাম টাকাকড়ির ব্যাপার। আধঘন্টা বাদে কৃতান্তবাবু চলে গেলেন। নরেশদা আমাকে বললেন, 'তোমার নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়াটা ভাবছি কলকাতায় গিয়ে কোনও

পুকুরটুকুরে নেব।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'বলেন কী নরেশদা! এ রকম একটা ন্যাচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে সে সিন মোটেই খাপ খাবে না। তাছাড়া আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে, সাঁতার জানি। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, দেখবেন আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।'

—'তাতো নেবে। কিন্তু কী ভাবছি জান? যদি দৈবাৎ একটা অঘটন কিছু ঘটে যায় তাহলে এখান থেকে মারধোর না খেয়ে যেতে হয়।'

হেসে বললাম, 'আপনি অনর্থক তিলকে তাল করছেন নরেশদা, কিচ্ছু হবে না। বাধা-বিপদকে ভয় করে এড়িয়ে চলি বলেই আজ বাংলা ছবির এ অবস্থা। আমেরিকান ছবিগুলোর কথা একবার ভাবুন তো, 'এলমো দি ফিয়ারলেস' ছবির নায়ক লেমো লিঙ্কনের যে অদ্ভুত দুঃসাহসিক কার্যকলাপ দেখেছি তাতে মনে হয় আমাদের অভিনয় করাই ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

রাত ঠিক দশটায় গোয়ালন্দের স্টীমার এল। পেট ভরে রাইস-কারি খেলাম। দু'তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম এক ঘুমে রাত কেটে গেল।

সকালে উঠে তাড়াহুড়ো করে রেডি হয়ে সদলবলে যখন কৃতান্তবাবুর বাড়ি পৌঁছলাম তখনও আটটা বাজেনি। কৃতান্তবাবুর বাড়িতেও সাজসাজ রব পড়ে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে অপরিচিত মেয়েদের ভিড়, বাইরে ষণ্ডা-ষণ্ডা ছেলের দল। ছোট বড় মাঝারি নৌকা আর ডোঙার ভিড়ে সামনে খানিকদূর পর্যন্ত জল দেখা যায় না। ছেলের মধ্যে অনেক খুঁজে সমীরকে দেখতে পেলাম না। মনটা একটু দমে গেল।

ব্যস্তসমস্তভাবে নরেশদা এসে আমাকে বললেন, 'ওহে ধীরাজ, কৃতান্তবাবুকে চট করে পাউডার মেক-আপ করে দাও। উনি কন্যাকর্তা, আগে ওঁকে দরকার।'

মেক্-আপ বাক্স খুলে রেডি হয়ে বসলাম, পরম উৎসাহে কৃতান্তবাবু এসে সামনে দাঁড়ালেন। হেসে মনে মনে বললাম—এ রঙকে দাবিয়ে রাখতে পাউডারের বাপের সাধ্যি নেই। একমাত্র পারে সবেদা ও পিউড়ি, ভেসলিনের শিশি থেকে খানিকটা নিয়ে দু'হাতে ঘষে পাতলা করে মুখে মাখিয়ে দিলাম। তারপর পাফ দিয়ে বেশ পুরু করে পাউডার লাগালাম। কুচকুচে কালো ভুরুটাকে কালো পেন্সিল দিয়ে আরও সজাগ করে দিয়ে বললাম, 'যান, মেক-আপ হয়ে গেছে।' ছোট আরশিতে মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে খুশি মনে নরেশদার সন্ধানে চলে গেলেন কৃতান্তবাবু।

এইবার আমার পালা। ঐ একই প্রক্রিয়ায় পাউডার মেখে, চোখে ভুরু এঁকে, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে তিন মিনিটে মেক-আপ শেষ করলাম। গোল বাঁধল ফোঁটা কাটা নিয়ে। নরেশদা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন কপালে ভুরুর উপর থেকে

শুরু করে গাল পর্যন্ত ফোঁটা কাটতে হবে। যতীন ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত, গিরিজাকে বললাম, 'বর-ফোঁটা কাটতে জানিস?' তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে কাজের অছিলায় বরযাত্রীদের দলে মিশে গেল গিরিজা।

মহা বিপদে পড়লাম। নরেশদা ও কৃতান্তবাবু এসে হাজির। নরেশদা বললেন, 'এখনও তোমার মেক-আপ শেষ হয়নি? তোমার হয়ে গেলে সুনীলার মেক-আপ হবে।'

বললাম, 'ফোঁটা কাটতে আমি জানি না নরেশদা।'

মুখের কথাটা লুফে নিয়ে কৃতান্তবাবু বললেন, 'বর-ফোঁটা তো? তা এতক্ষণ বলেননি কেন? ওরে জয়া—' বলতে বলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন কৃতান্তবাবু।

তিনখানা ঘর কৃতান্তবাবুর। প্রথমখানা বাইরের ঘর। সকাল সন্ধ্যা মক্কেল নিয়ে বসেন কৃতান্তবাবু। রাত্রে চাকর পাঁচু ও তার মা শোয়। দ্বিতীয় ঘরখানি ছেলেদের। পড়াশুনা, শোয়া সব ঐ ঘরে। তার পরের ঘরখানি কৃতান্তবাবুর শোবার ঘর। সেই ঘর থেকে বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে অনেকগুলি মহিলার সম্মিলিত কণ্ঠের চাপা গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ গুঞ্জন থেমে গেল, কৃতান্তবাবুর গলা শুনতে পেলাম, 'জয়া, একবার এইদিকে আয় তো মা।' পরমুহূর্তে একরকম ঠেলে জয়াকে নিয়ে এসে আমার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললেন—'ধীরাজবাবুকে ফোঁটা-তিলক কেটে বর সাজিয়ে দাও।'

জয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। বার দুই চেয়ে আমিই চোখ নামিয়ে নিলাম লজ্জায়। এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে জীবনে পড়িনি।

জয়া বলল, 'লবঙ্গ আছে?'

জবাব না দিয়ে অবাক হয়ে চাইলাম।

হেসে ফেলল জয়া। বললে, 'বর-ফোঁটা কাটতে লবঙ্গ দরকার।'

কৃতান্তবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর থেকে একমুঠো লবঙ্গ এনে জয়ার হাতে দিতেই জয়া বললে, 'এত কী হবে? একটা কি দুটো হলেই চলবে।' দুটো লবঙ্গ বেছে নিয়ে মেক-আপ বক্সের ভিতরে, তারপর আশেপাশে চেয়ে কী যেন খোঁজে জয়া, একটু ইতস্তত করে বলে, 'শ্বেতচন্দন খানিকটা চাই যে কাকাবাবু!'

এইবার বেশ বিব্রত হয়ে পড়লেন কৃতান্তবাবু। জবাবটা আমিই দিলাম, 'দেখুন, সত্যিকার বরের জন্য দরকার হয় শ্বেতচন্দনের। কিন্তু সাজা বরের জন্যে এই দিয়েই চলবে।'

মেক-আপ বাক্স থেকে একটা লিচনারের সাদা স্টিক বার করে জয়ার হাতে দিয়ে বললাম, 'তা ছাড়া আপনার ঐ শ্বেতচন্দন ক্যামেরায় ঠিক আসে না। এটা কটকটে সাদা, ছবিতে স্পষ্ট আসবে।'

নিপুণ হাতে লবঙ্গ দিয়ে ফোঁটা কাটতে শুরু করল জয়া। বন্যাবিধ্বস্ত সিরাজগঞ্জে

এরকম সর্বকর্মনিপুণা একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হবে কল্পনাও করিনি। চুপ করে কখনও চোখ চেয়ে কখনও চোখ বুঁজে থাকি, কথা কইবার অছিলা খুঁজে পাই না, অস্বস্তি লাগে।

বললাম, 'সমীরবাবুকে সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না। ব্যাপার কী?'

তিরস্কারের ভঙ্গিতে ফোঁটাকাটা বন্ধ করে জয়া বলল, 'দিলেন তো নড়ে সব মাটি করে? দেখুন তো কী হয়ে গেল?' ছোট আয়নাখানা মুখের সামনে তুলে ধরে জয়া। দেখলাম ছোট্ট রুইতনের টেক্কার চারটে ধার সরু করে একটু বাড়িয়ে দিলে যেমন দেখায় তেমনি তরঙ্গায়িত ঢেউ-এর সারির মতো এক মাপের সুন্দর ফোঁটাগুলোর একটি ফেটে চৌচির হয়ে লাইন ছেড়ে কপালে গিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করলাম। আঁচল দিয়ে থ্যাবড়ানো ফোঁটাটাকে মুছতে যাচ্ছিল জয়া। তাড়াতাড়ি মেক-আপ বক্স থেকে রং তোলার একটা ঝাড়ন এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এইটে দিয়ে তুলুন।' দু'তিন সেকেন্ড আমার মুখের দিকে চেয়ে ঝাড়নটা দিয়ে যত্ন করে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফোঁটাটা তুলে ফেলে আবার শুরু করল জয়া। একটু পরেই ফোঁটাকাটা পর্ব শেষ হল। শেষে জয়া বলল, 'দেখুন, আপনাদের ছবিতে চলবে তো?'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নরেশদা বললেন, 'খুব চলবে, এখন চট করে সুনীলাকে পাউডার মেক-আপ করে দাও ধীরাজ।' সেই ব্যস্তভাবে যতীনকে ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লজ্জার পাহাড় ভেঙে পড়ল মাথায়। চেয়ে দেখি জয়ার চোখে দুষ্টুহাসির চাহনি। আমতা আমতা করে বললাম, 'দেখুন, মানে পাউডার মেক-আপটা খুব সোজা। মানে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কোন অসুবিধা হবে না।' জয়াকে কিছু বলার অবসর না দিয়েই তাড়াতড়ি ভেসলিন থেকে পাউডার মেক-আপের পর কালো পেন্সিল দিয়ে চোখ-ভুরু আঁকা এবং সব শেষে লিপস্টিক লাগানো সব একনিশ্বাসে বলে গেলাম।

কোনও কথা না বলে ঈষৎ হেসে মেক-আপ বাক্সটি হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেল জয়া। রোদ্দুর বেড়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গরদের লাল চেলি পরতে শুরু করলাম। কাছা কোঁচা দিয়ে দেখি দেড়হাত কোঁচা মাটিতে লোটাচ্ছে। বুদ্ধিমান ড্রেসার বেছে বেছে বারো হাত কাপড় আমার জন্যে দিয়েছে। এখন উপায়? ঐ রকম জবড়জং কাপড় পরে নদীতে লাফিয়ে পড়া, সাঁতার কাটা—অসম্ভব। নরেশদাকে বলে এখন কোন ফল হবে না। কোমরের কাছে খানিকটা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে বেশ শক্ত করে দু'তিনটে গেরো দিয়ে পরে, মালকোঁচা দিয়ে কোনো রকমে ম্যানেজ করলাম।

গরদের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে, গলায় কাগজের ফুলের মালা ঝুলিয়ে ঘর থেকে

বেরুতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলাম। বাইরে বারান্দা থেকে শুরু করে বহুদুর পর্যন্ত শুধু মাথা আর মাথা। সামনের বাগান ভর্তি হয়ে গেছে নৌকায় ডোঙায় ভেলায়। গাছের ডাল পর্যন্ত খালি নেই। কে বলবে মাত্র তিন-চারদিন আগে এদের এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। নরেশদা এসে ডাকলেন, 'এই যে তুমি রেডি? এসো, আর দেরি করলে সিনগুলো শেষ করতে পারব না।' কৃতান্তবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'একটু দেখুন না মশাই, কনে সাজানো কদ্দুর হল!'

বারান্দায় এসে দেখি ফুলমিঞার নৌকোতে স্ট্যান্ডসুদ্ধ ডেবরি ক্যামেরাটা ফিট করে মোটা দড়ি দিয়ে স্ট্যান্ড-এর সঙ্গে নিজের কোমরে জড়িয়ে বেঁধে যতীন দাস চারদিকে অবাক হয়ে চাইছে।

লাল বেনারসি শাড়ি পরে, ঘোমটা দিয়ে, মাথায় সোলার মুকুট ও গলায় কাগজের ফুলের মালা পরে সুনীলা এসে দাঁড়াল বারান্দায়, একপাশে কৃতান্তবাবু, অন্যপাশে হাস্যময়ী জয়া। জনসমুদ্রে গুঞ্জনের ঢেউ উঠল। নরেশদা চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টার্ট!' যতীন ক্যামেরা ঘোরাতে লাগল। আর দেরি না করে আমি নির্দিষ্ট নৌকায় আট-দশ জন বরযাত্রী নিয়ে উঠে পড়লাম। আমাদের কেনা পুরোনো নৌকোতে সবাই মিলে সুনীলাকে উঠিয়ে দিলে। দেখলাম জয়াও উঠল কনের নৌকাতে। কেন বলতে পারব না, নিজের অজ্ঞাতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। নরেশদার নির্দেশমতো মেয়েরা বারান্দায় এসে শাঁখ বাজাতে লাগল, অন্যরা দিল উলুধ্বনি। আমাদের নৌকা ছেড়ে দিল।

যতীনের পিছনে দাঁড়িয়ে নরেশদা চিৎকার করে বললেন, 'বরের নৌকা আগে যাবে, তারপর কনের নৌকা।'

তাই হল। লোকালয়ের সীমানা ছাড়িয়ে একটুখানি উত্তরমুখো গিয়ে মোড় ঘুরিয়ে নৌকা স্রোতের অনুকূলে তরতর করে এগিয়ে চলল পশ্চিমমুখো। একটু গিয়েই 'কাট্' বলে চিৎকার করে উঠলেন নরেশদা।

পেছনে চেয়ে দেখি বিরাট জনতা অসংখ্য নৌকা আর ডোঙা করে সঙ্গে সঙ্গে আসছে। নৌকা কাছে এলে নরেশদা বললেন, 'আগে শুকনো সিনগুলো শেষ করে ফেলতে চাই।'

বললাম, 'শুকনো সিন?'

নরেশদা বললেন, 'হ্যাঁ, মানে জলে ডোবার আগের শটগুলো। একবার জলে ডুবলে আর অন্য সিন নেওয়া যাবে না।'

সিনগুলো বুঝিয়ে দিলেন নরেশদা। বরের নৌকা ক্যামেরার সামনে দিয়ে পাস করে যাবে, হারমোনিয়াম তবলা বাজিয়ে বরযাত্রীদল গান বাজনায় মত্ত, শুষ্কমুখে মাঝখানে বসে আছে রমেশ। তারপর যাবে কনের নৌকা। এইভাবে কাছে-দূরে ক্যামেরা বসিয়ে অনেকগুলো পাসিং শট নিয়ে পরে ধরা হবে নৌকাডুবি। তাই হল।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে নানাভাবে অনেকগুলো শট নেওয়া হয়ে গেল। সারা দুপুর কড়া রোদে একরকম খালি পেটে শুটিং করে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। দেখলাম যতীন, গিরিজা, এমনকি নরেশদা পর্যন্ত তৃষ্ণায় বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন। শট নিতে নিতে স্রোতের টানে কৃতান্তবাবুর বাড়ির সামনে এসে গিয়েছিলাম। আধ ঘন্টার জন্য ব্রেক ফর ওয়াটার করা হল। সুনীলা দেবীকে নিয়ে জয়া ভেতরে চলে গেল। আমরা সবাই বাইরের ঘরে ঢালা সতরঞ্চির উপর শুয়ে পড়লাম।

জল খেয়ে আর বিশ্রাম নেবার অবসর পেলাম না। তিনটে বেজে গেছে, যতীন তাগাদা দিতে লাগল। আবার রেডি হয়ে যে যার নৌকোয় উঠলাম। জয়া সুনীলাকে নিয়ে উঠল ভাঙা নৌকাটায়। কী এক অজানা ভয়ে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। জনতার মধ্যে থেকে তিন-চারজন চিৎকার করে বলল, 'কোনও ভয় নেই সুনীলা দেবী, আমরা আছি। আর যদি কিছু দুর্ঘটনা হয় নরেশ মিত্তিরকে আমরা সিরাজগঞ্জ ছেড়ে যেতে দেব না।'

নরেশদার দিকে ভয়ে ভয়ে চাইলাম। নির্লিপ্ত কঠিন মুখ—মাথায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যতীনের পাশে।

প্রথমে আমার নৌকা ক্যামেরার কাছ দিয়ে যাবে—যতীন আমার নৌকা ফলো করে সঙ্গে সঙ্গে যাবে। হঠাৎ বরযাত্রীদের মধ্যে একজন পিছনে চেয়ে চীৎকার করে উঠবে—'রমেশ, কনের নৌকো ডুবে যাচ্ছে।' তাড়াতাড়ি বাইরে এসে একবার ডুবন্ত নৌকাটার দিকে চেয়ে নিয়ে লাফিয়ে পড়ব আমি নদীতে। তখন ক্যামেরা প্যান করে চলে যাবে কনের নৌকার উপর। মোচার খোলার মতো চক্ষের নিমেষে ডুবে যাবে নৌকা কনে বরযাত্রী সবাইকে নিয়ে।

নরেশদা স্টার্ট দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বরযাত্রী চিৎকার করে উঠল। আমিও এক লাফে বাইরে এসে গরদের চাদরটা কোমরে জড়িয়ে লাফিয়ে পড়লাম নদীর মধ্যে। বাইরে অসহ্য গরম, নদীর জল কনকনে ঠাণ্ডা। সারা দেহের উপর দিয়ে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। তারপর জমাট অন্ধকার, আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হল ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, চোখ মেলতে কষ্ট হয়। সারা দেহ ব্যথায় টনটন করছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসার মতো কৃতান্তবাবুর কথা কানে এল, 'আর ভয় নেই, জ্ঞান হয়েছে।'

তিন-চারজন সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে। চোখ চেয়ে দেখবার চেষ্টা করি, পারি না। কৃতান্তবাবু বলেন—'মা জয়া, এক কাপ গরম হরলিকস্ চট করে নিয়ে এসো তো মা।' আগের দিনের ঘটনা ভাববার চেষ্টা করি, তালগোল পাকিয়ে যায়। মাথার যন্ত্রণা দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে। চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে হরলিকস্ খাই, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারব না, মাথার কাছে চাপা গলায় নরেশদা ও

কৃতান্তবাবুর কথোপকথন কানে এল। সাড়া না দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে শুনলাম—

নরেশদা বলেছেন 'যা ভাবনা হয়েছিল মশাই। এই সেদিন বেচারার বাবা মারা গেছেন, বলতে কি একরকম জোর করে ওর মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি ওকে ।'

কৃতান্তবাবু—'গুরুবল যে ধীরাজবাবু বুদ্ধি করে চেলির কাপড়খানা গেরো দিয়ে পরেছিলেন।'

আস্তে আস্তে আগের দিনের ঘটনা মনে পড়ে গেল। কিন্তু গেরো দিয়ে চেলির কাপড় পরার মধ্যে কী গুরুবল লুকিয়ে থাকতে পারে বুঝতে পারলাম না। একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞাসা করি, সুনীলা দেবীর কী হল। লাফিয়ে পড়ার আগে আমি স্পষ্ট দেখেছি, ওদের সবাইকে নিয়ে নৌকা ডুবেছে। তারপর কী হল? কেমন লজ্জা করতে লাগল। চুপ করে রইলাম।

কৃতান্তবাবু বললেন, 'সমীরের দলকে বোকা বানাতে দিয়ে নিজেরাই যে এরকম উজবুক বনে যাব ভাবতেও পারিনি। যাক, আপনার শটগুলো মনোমত হয়েছে তো?'

'পারফেক্ট, ধীরাজ নদীতে লাফিয়ে পড়ার পর ক্যামেরা চলে গেল কনের নৌকোর উপর। যতীনকে ইশারা করতেই ক্যামেরাসুদ্ধ নৌকা নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। কনে, বরযাত্রী সবসুদ্ধ নৌকা মিনিটখানেকের মধ্যে ভুস করে ডুবে গেল। বরযাত্রীদের দল সাঁতার কাটতে শুরু করল, ব্যস্। যতীনের ক্যামেরাও থেমে গেল।'

কৃতান্তবাবু বললেন, 'তার পরের ব্যাপারটা মনে হলে এখনও হাসি চাপতে পারি না।' দুজনে হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমিও কৌতূহল চাপতে পারলাম না। বললাম, 'তারপর কী হল নরেশদা?' হাসি থামিয়ে দুজনে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বসলেন আমার বিছানার পাশে। কৃতান্তবাবু বললেন, 'দাঁড়ান, কোনো কথা নয়। আগে আর এক কাপ হরলিকস্ এনে দিই।'

একটু বাদেই একটা কাচের গ্লাসে খানিকটা গরম হরলিকস্ নিয়ে এসে কৃতান্তবাবু বললেন—'দুধ মাথা খুঁড়লেও মেলে না। অনেক কষ্টে একটা হরলিকস্ যোগাড় করে রেখেছিলাম, তা দেখছি ভাল কাজেই লেগে গেল।'

হরলিকস্ খেয়ে অনেকটা সুস্থ হলাম। বললাম, 'ব্যাপারটা আমায় সব খুলে বলুন তো, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নরেশদা বললেন, 'কনের নৌকা ডোবার পর সমীরের দল হৈহৈ করে লাফিয়ে পড়ল জলে। সমীরই পাণ্ডা। একটু বাদেই ডুবসাঁতার দিয়ে জয়া ভেসে উঠল জলের উপর ঘটনাস্থল থেকে খানিকদূরে। কাছেই নৌকো ছিল, তাতেই উঠে পড়ল জয়া। জলে সাঁতার দিতে দিতেই সমীর চিৎকার করে উঠল—তুই একা যে জয়া? সুনীলা

দেবী কোথায়? জোরে হাওয়া বইছিল, অত দূর থেকে জয়া কী বলল বোঝা গেল না। দ্বিগুণ উৎসাহে ডুবে, ভেসে, ওরা খুঁজতে শুরু করল সুনীলাকে। সমীর ওরই মধ্যে আমাদের নৌকোর কাছে এসে বলল—এটা যে হবে আমি জানতাম। সুনীলা দেবীকে যদি না পাই ফল ভাল হবে না, এও বলে গেলাম। একটু বাদে ওদেরই দলের একজন ভুস করে ভেসে উঠে চেঁচিয়ে বলল— 'পেয়েছি।' আর যায় কোথায়, সবাই সাঁতার দিয়ে ছেলেটির কাছে গিয়ে ডুব দিলে জলের মধ্যে। একটু বাদেই লাল গরদের শাড়ি পরা কনেকে পাঁচ-সাতজনে ভাসিয়ে তুলল জলের উপর। মাত্র এক মিনিট, পরক্ষণেই রাগে আমাদের উদ্দেশে একটা অস্ফুট গালাগাল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুনীলাকে চার-পাঁচ হাত দূরে নদীর মধ্যে। তারপর নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে নৌকোয় উঠে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি, বললাম, 'বুঝলাম না।'

'এবার আমায় বলতে দিন,' বলে কৃতান্তবাবু শুরু করলেন।

—'ওরা রেগে যাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে নদীর মধ্যে সে সুনীলা দেবী নয়। আমারই বাচ্চা চাকর পাঁচু। ছোটবেলা থেকেই পাঁচু জলের পোকা। আধঘণ্টার উপর ডুবে থাকতে পারে নদীতে। নৌকোডুবির ব্যাপারটা নিয়ে যখন সমীররা বাড়াবাড়ি শুরু করল তখনই আমার মাথায় আসে।'

বললাম, 'কিন্তু জয়া? জয়া তো সুনীলার নৌকোতেই ছিল।'

'জয়াকে দলে না টানলে এ প্রহসন এতদূর গড়াত না।' বলে হো হো করে হেসে উঠলেন কৃতান্তবাবু।

—'এইবার তোমার প্রসঙ্গে আসছি। সমস্ত নৌকাডুবির ব্যাপারটা ঘটতে বোধ হয় তিন মিনিটও লাগেনি। হঠাৎ আমার খেয়াল হল—ধীরাজ, ধীরাজ কোথায়? সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, কেউ বলতে পারে না। তখনই নৌকা নিয়ে যেখানটায় তুমি লাফিয়ে পড়েছিলে সেইখানে গেলাম। সমীরের দল চলে গেছে, সেই সঙ্গে ভাল সাঁতারু ছেলেগুলোও সরে পড়েছে। এখন উপায়? চার-পাঁচখানা নৌকো এনে চারপাশ ঘিরে ফেলে একটা ছোকরা মাঝিকে টাকার লোভ দেখিয়ে জলে নামিয়ে দিলেন কৃতান্তবাবু। ডুব দিয়ে এদিক-সেদিক খুঁজে সে বললে 'পালাম না কর্তা!' আমি আর নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম নৌকার উপর।'

চুপ করলেন নরেশদা। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার শুরু করলেন—'হঠাৎ দূর থেকে জয়ার চিৎকার শুনলাম—'পেয়েছি কাকাবাবু, এই দিকে আসুন।' নৌকা নিয়ে সবাই ছুটলাম উত্তরদিকে। অসম্ভব টান স্রোতের, নৌকা এক জায়গায় দাঁড় করানোই শক্ত। কাছে গিয়ে দেখলাম, জয়ার হাতে তোমার গরদের চেলির একটা কোণ। জয়া বলল—'হাওয়ায় ফুলে জলের উপর এই কাপড়ের কোণটা ভেসেছিল। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছেন। আমার নৌকাটা দেখবেন কাকাবাবু।' বলেই চোখের

নিমেষে ঐ কাপড়ের খুঁট ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়া। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট, মনে হচ্ছিল তিন বছর। নৌকা থেকে হাতদশেক দূরে ভেসে উঠল জয়া তোমাকে নিয়ে। কোনও কথা না বলে নিয়ে এলাম তোমায় কৃতান্তবাবুর বাড়ি। তারপর নানা প্রক্রিয়ায় জল বার করে কম্বল চাপা দিয়ে তোমার জ্ঞান ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম।'

শুনতে শুনতে উত্তেজনায় উঠে বসেছিলাম। বললাম, 'স্রোতের অত টানের মধ্যে আমায় পেলেন কী করে?'

কৃতান্তবাবু বললেন, 'সেও এক মজার ব্যাপার। যেখানটায় আপনাকে পাওয়া গেল, বন্যার আগে সেটা ছিল ত্রিলোচন পালের বাড়ি। ভেরেণ্ডা আর বাঁশ দিয়ে বাড়িটার চারদিকে বেড়া দেওয়া ছিল। বন্যায় সব নিয়েছে, পারেনি শুধু ঐ জ্যান্ত ভেরেণ্ডা গাছের বেড়াটাকে। তারই ফোকরে আপনার মাথাটা আটকে গিয়েছিল। আর কাপড়খানা বুদ্ধি করে গেরো দিয়ে পরেছিলেন বলে আপনাকে খুঁজে পাওয়া গেল।'

বললাম, 'জয়া দেবীকে একবার ডাকুন না!'

কৃতান্তবাবু বললেন, 'যতক্ষণ তোমার জ্ঞান হয়নি এ বাড়িতেই ছিল। আজ সকালে বাড়ি গেছে। অদ্ভুত মেয়ে।'

সত্যি অদ্ভুত মেয়ে জয়া। তুচ্ছ বায়োস্কোপের ছবি তুলতে এসে মাতৃজাতির এক অভাবনীয় রূপ দেখে গেলাম বন্যাবিধ্বস্ত সিরাজগঞ্জে।

কলকাতায় ফিরে এসেছি। জলের রাজ্য থেকে ইট-কাঠ-গাড়ি-ঘোড়া গোলমালের রাজ্যে। সিরাজগঞ্জে দেখে এলাম জলের বন্যা, কলকাতায় এসে দেখি টকির বন্যা। সারা কলকাতা সরগরম। ম্যাডান স্টুডিও ছাড়াও চামারিয়া ব্রাদার্স দুটো স্টুডিও খুলে দিয়েছেন। বড় রাধাকিষণ চামারিয়া 'রাধা ফিল্মস্,' ছোট মতিলাল খুলেছেন 'ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মস্।' এছাড়া 'নিউ থিয়েটার্স,' 'ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স' ইত্যাদি নিত্য নতুন স্টুডিও গজিয়ে উঠতে লাগল।

সবাক ছবির সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলল। ম্যাডান থিয়েটার্স ও নিউ থিয়েটার্সই এর মধ্যে অগ্রণী। বাংলা ও হিন্দী সবাক ছবিতে বাজার সরগরম। সবাক ছবির দৌলতে মঞ্চশিল্পীদের কদর বেড়ে গেল, তার উপর যে গান গাইতে পারে তার তো কথাই নেই—মঞ্চের পঁচাত্তর টাকা মাইনের শিল্পী পাদপ্রদীপ ছেড়ে পর্দায় মাসে পাঁচশ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে হাসিমুখে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। প্রতিযোগিতায় বাঙালি শিল্পীদের তুলনায় হিন্দী শিল্পীদেরই চাহিদা বেশি। এই সময়ে নিউ থিয়েটার্সে সাইগল ও ম্যাডানে মাস্টার নিশার ও কজ্জন বাঈ-এর আবির্ভাব হিন্দী সবাক ছবিতে বেশ একটা আলোড়ন এনে দিল। অভিনয়-ক্ষমতা বাদ দিলেও শুধু গানের জন্য এঁদের প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা

দিন দিন বেড়েই উঠতে লাগল।

নির্বাক 'নৌকাডুবি' শেষ করে চুপচাপ বসে আছি। নদীর ঢেউ-এর মতো দিনগুলো একটার পর একটা এগিয়েই চলল। ইতিমধ্যে ম্যাডানে অনেকগুলো হিন্দী- বাংলা সবাক ছবি তোলা হয়ে গেল, ক্রাউনে নয়তো অ্যালফ্রেডে সেগুলো রিলিজও হল। আমার আর ডাক পড়ে না। ভাবলাম, আমার নায়ক জীবনের ছেদ বোধ হয় নির্বাক যুগেই পড়ে গেল। 'রঙমহল' থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করি আর মধ্যে মধ্যে স্টুডিওতে গিয়ে দূর থেকে সবাক ছবির শুটিং দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে আসি।

জ্যোতিষবাবু সবাক 'বিষ্ণুমায়া' তুলতে আরম্ভ করলেন। ভাবলাম, যাক, এইবার একটা পার্ট নিশ্চয়ই পাব। ও হরি—অহীনদা, নরেশদা, শ্রীমতী উমাশশী, শিশুবালা প্রভৃতি সবার ডাক পড়ল, পড়ল না শুধু আমার। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমতী উমাশশীর প্রথম সবাক চিত্রে অবতরণ এই 'বিষ্ণুমায়া'তেই। এর ঠিক পরেই নিউ থিয়েটার্স ওঁকে স্থায়ীভাবে চুক্তিবদ্ধ করে নেন।

১৯৩২ সালের ২৫শে মার্চ 'বিষ্ণুমায়া' এক সঙ্গে শ্যামবাজারে ক্রাউন সিনেমায় ও ভবানীপুর এম্প্রেস থিয়েটারে মুক্তিলাভ করল। এইসময়ে একদিন স্টুডিওতে জাহাঙ্গীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। সাহেব এখন আর শুধু স্টুডিও ম্যানেজমেন্ট নিয়ে থাকেন না। নিজেই পরিচালক সেজে পাঁচ-ছ'খানি হিন্দী ছবি তুলে ফেলেছেন এবং একমাত্র কজ্জন ও নিশারের গানের জন্যই প্রচুর পয়সা পেয়েছেন সেগুলো দেখিয়ে। সাহেবের ঘরে ঢুকে নমস্কার করে দাঁড়ালাম। ঘরভর্তি লোক। তার মধ্যে বেশিরভাগই হল কোরিন্থিয়ান এবং অ্যালফ্রেড থিয়েটারের অ্যাক্টর-অ্যাক্ট্রেস। দেখলাম, সবাক ছবির দৌলতে ওদের বরাত ফিরে গেছে। কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের অডিটোরিয়ামে ছেঁড়া প্যান্ট পরে আগে যাদের বিড়ি খেতে দেখেছি, আজ তারা নতুন স্যুট পরে সিগারেটের টিন হাতে নিয়ে সাহেবের সঙ্গে হেসে কথা কইছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে ভিড় একটু কমলে সাহেবের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সাহেব বললেন, 'কী ধীরাজ! কিছু বলবে?'

বললাম, 'হ্যাঁ স্যার। আমায় যদি কোনও পার্ট না দেওয়া হয় তাহলে শুধু মাস-মাইনে দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। আমায় ছেড়ে দিন।'

একটু চুপ করে থেকে সাহেব বললেন, 'জ্যোতিষবাবু, মিঃ গাঙ্গুলী এঁরা সব স্টেজের বড় বড় আর্টিস্ট নিয়ে মেতে উঠেছেন, কিন্তু তুমি আমাদের পুরানো লোক। তোমায় এভাবে অ্যাভয়েড করছেন কেন বুঝলাম না। যাই হোক, তুমি এক কাজ কর। হিন্দীটা শিখে ফেল। আমার ছবিতে তোমায় নায়কের পার্ট দেব।'

ডায়লগ মাস্টার আব্বাস আলিকে ডেকে 'হাতিলি দুলাল' ছবির নায়কের পার্টটা আমায় লিখে দিতে বললেন। উর্দু সংলাপ বাংলায় লিখে নিলাম। কড়া উর্দু, মানে তো বুঝলামই না, উচ্চারণ করতেও প্রাণ ওষ্ঠাগত। তিন-চারদিন বাড়ি বসে প্রাণপণে মুখস্থ

করে একদিন স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম। সেদিন ফুল রিহার্সাল। কজ্জন বাঈ, মুক্তার বেগম, পেসেন্স কুপার, ললিতা দেবী ছাড়াও কোরিন্থিয়ান ও অ্যালফ্রেড থিয়েটারের একগাদা মুসলমান আর্টিস্ট। বেশ নারভাস হয়ে পড়লাম।

একটু পরেই আব্বাস আলী সাহেব এলেন। পায়ে জরির নাগরা, ঢিলে পায়জামা, কলিদার আদ্দির পাঞ্জাবি। তার উপর জরিদার জহর কোট, মাথায় ফুলদার মুসলমানী টুপি। একগাল পানদোক্তা মুখে জাবর কাটতে কাটতে মেয়েদের সামনে এসে একটা মোটা তাকিয়া হেলান দিয়ে বসলেন। রিহার্সালের নাম গন্ধ নেই, খালি খোশগল্প। হাসি-তামাশা রসিকতায় ঘরের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল।

বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। একজন ছুটে এসে জানালে, জাহাঙ্গীর সাহেব এসে গেছেন। ব্যস সবাই এলার্ট হয়ে বসলেন। আব্বাস আলি মোটা খাতা খুলে রিহার্সাল শুরু করে দিলেন।

একটু পরেই আমার ডাক পড়ল। পেসেন্স কুপার ও মুক্তার বেগমের সঙ্গে একটা দৃশ্য। ডায়লগ মুখস্থ ছিল, গড়গড় করে বলে গেলাম। আব্বাস আলি বললেন, 'কুছ্ নেহি হুয়া, বিলকুল গলৎ হ্যায়।' চুপ করে রইলাম। আবার প্রশ্ন হল, 'আপ গানা গা সকতে হ্যাঁয়?'

বললাম, 'জী নেহি।'

—'তব ক্যায়সে চলেগা? ইস্ নাটকমে হিরোকা কমসে কম এক ডজন গানা হ্যায়!'

আর দ্বিরুক্তি না করে ঘর থেকে বাইরে চলে এলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, এখানে আমার চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। বাড়ি চলে আসছিলাম, পথে জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে দেখা। পাশ কাটিয়ে চলে আসছি, খপ করে আমার হাতখানা ধরে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'এই যে ধীরাজ। তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

—'এতদিন বাদে হঠাৎ?'

—'অভিমান তুমি আমার উপর করতে পার, কিন্তু তুমি তো জান না, ভূমিকা-বণ্টনের ব্যাপারে আমার হাত-পা বাঁধা!'

বললাম, '১৯৩১ সাল। এই পুরো একটা বছরে হিন্দী-বাংলা, মিলিয়ে সবসুদ্ধ দশখানা সবাক ছবি ম্যাডান থেকে বেরিয়েছে, হিন্দীগুলো ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আপনার পরিচালনায় তোলা তিনখানা—'জোর বরাত', 'ঋষির প্রেম' ও 'বিষ্ণুমায়া'তে ইচ্ছে করলে আমাকে একটা পার্ট দিতে পারতেন না?'

এখানে উল্লেখযোগ্য, অধুনাপ্রসিদ্ধ কানন দেবী সবাক চিত্র 'জোর বরাত' ছবিতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'তুমি বিশ্বাস করবে না ধীরাজ, স্টেজে যাদের বেশ নাম আছে তাদের উপরই সাহেবদের ঝোঁক। যথা—দুর্গাদাস, জয়নারায়ণ, অহীন্দ্রবাবু,

শিশিরবাবু, নরেশবাবু। দুর্গাকে পাওয়া যাবে না, নিউ থিয়েটার্স মোটা মাইনেতে ওকে দীর্ঘ চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিয়েছে। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক ছবি শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা'তে জীবানন্দের ভূমিকায় ওর খুব নাম হয়েছে। এখন 'চিরকুমার সভা'য় পূর্ণর ভূমিকায় অভিনয় করছে। বাকি যারা আছে তাদের মধ্যে কয়েকজনকেও নিয়ে নেবার মতলবে আছে। তাই নরেশবাবু, নির্মলবাবু, জয়নারায়ণ এদের সঙ্গে সাহেব নতুন করে কনট্রাক্ট করে নিয়েছেন। তুমি শোননি বোধহয়, আমি সবাক চিত্রে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তুলছি?'

বললাম, 'না।'

জ্যোতিষবাবু বললেন, 'এই নিয়ে গাঙ্গুলীমশাই-এর সঙ্গে কোম্পানির বেশ একটু মন কষাকষি হয়ে গেছে। আমার ভূমিকালিপি হলঃ কৃষ্ণকান্ত—অহীন্দ্রবাবু, গোবিন্দলাল—নির্মলেন্দুবাবু, ভ্রমর—শান্তি গুপ্তা, রোহিণী—শিশুবালা। কেমন হবে?'

আমতা আমতা করে বললাম, 'ভালই, তবে নির্বাক ছবিতে গোবিন্দলালের ভূমিকায় দুর্গাদাস অসম্ভব নাম করেছিলেন। ওঁকে দিলেই—'

কথা কেড়ে নিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'সে চেষ্টা করিনি ভাবো? বহু টাকা অফার করেছি। কিন্তু নিউ থিয়েটার্স ছাড়বে না। যাই হোক, নিশাকরের ভূমিকাটি ছোট হলেও ভাল। ঐটে আমি তোমায় দেব ভাবছি। সাহেবও মত দিয়েছে। কাল একটু সকাল-সকাল স্টুডিওতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।'

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই হনহন করে জ্যোতিষবাবু জাহাঙ্গীর ম্যাডানের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন।

'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' যুক্তিটাকে মেনে অপেক্ষাকৃত খুশি মনে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। গেট পেরিয়ে দেখি, থামের পাশে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে আছে মনমোহন। আমায় দেখেই একগাল হেসে বলল, 'আব্বাস আলির ছবিতে পার্ট পেলি?'

বললাম, 'না।'

—'আমি আগেই জানতাম তোকে দেবে না!'

—'মানে?'

—'মানে হিন্দী-উর্দু ছবি ওরা একচেটে করে রাখতে চায়। সেখানে কোনো বাঙালিকে মাথা গলাতে দিতে নারাজ। অনেক কথা আছে। আয়, মোড়ের দোকানে চা খেতে-খেতে সব বলছি।' জোরে পা ফেলে চলতে শুরু করেছে মনমোহন।

ইচ্ছে বিশেষ না থাকলেও ওর পিছু নিলাম।

টালিগঞ্জের তেমাথায় সেই সবেধন নীলমণি চায়ের দোকানটির পাশে আরও দুটি

দোকান গজিয়ে উঠেছে। দুটিতেই খুব ভিড়। অপেক্ষাকৃত কম ভিড় যে দোকানটিতে, তাতে ঢুকে একটা অন্ধকার কোণে বেঞ্চির উপর দুজনে বসলাম। দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে মনমোহন বললে,'অনেক কথা জমা হয়ে আছে, কোন্‌টা আগে বলব বল?'

বললাম, 'যা তোর খুশি।'

মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে মনমোহন বলল, 'তোর কথা থেকেই শুরু করি। 'হাতিলি দুলালে' যে তোকে কোন পার্ট দেবে না, তা আমি চার-পাঁচদিন আগেই জানতাম।' চা এসে গিয়েছিল, খেতে খেতে মনমোহন আবার বলল, 'দিনকয়েক আগে দুপুরবেলা কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিতে গিয়েছিলাম হেড অফিসে। দেখি কোরিন্থিয়ান অডিটরিয়ামে মিটিং হচ্ছে। আমায় জানিস তো? নিঃশব্দে পাশের দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম। তারপর সবার অলক্ষে পিছনে একটা চেয়ারে ঘাপটি মেরে বসলাম। মাস্টার মোহন, নিশার, সোরাবজী কেরাওয়ালা, আবদুল্লা কাবুলি, নর্মদা শঙ্কর, আব্বাস আলী থেকে শুরু করে কোরিন্থিয়ান আর অ্যালফ্রেডের সব চুনোপুঁটি পর্যন্ত হাজির। সবাই বেশ উত্তেজিত, কড়া উর্দুতে হাত পা নেড়ে আব্বাস আলী কী সব বলছে, একবিন্দুও বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ তোর নামটা কানে যেতেই আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝলাম।'

আমি কিছুই বুঝলাম না। বললাম, 'তারপর?'

চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুটো পান মুখে পুরতে পুরতে মনমোহন বললে, 'জাহাঙ্গীর সাহেব নাকি আব্বাস আলীকে বলেছে, তোকে 'হাতিলি দুলাল'-এ নায়কের পার্ট দিতে, এই ওদের গাত্রদাহ। আব্বাস ওদের বোঝাচ্ছে যে, এই রকম ছুতোনাতায় যদি বাঙালি লোক আমাদের উর্দু রাজত্বে ঢুকে পড়ে, তাহলে সবার অন্ন গেল, দুদিন বাদেই দেখতে পাবে হিন্দী-উর্দু ছবিতে নামছে সব বাঙালিরা। সবাই বেশ উত্তেজিত, 'কভি নেহি, কভি নেহি' ভাব। মাস্টার মোহন ও নিশার বলল, 'এক কাজ করো আব্বাস, ফুল রিহার্সালে দু'একটা সিন বলিয়ে বলে দেবে কিছু হচ্ছে না। তারপর বলবে দশ-বারোখানা গান আছে।' আব্বাস আলী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল 'কিন্তু আমি পার্ট লিখে দেবার সময় যে বলেছিলাম, নায়কের গান নেই।' মাস্টার মোহন বলল, 'কুছ পরোয়া নেহি, সেদিন বলে দিও গান নইলে হিন্দী ছবি চলে না, তাই পরে ওটা ঠিক হয়েছে।' আস্তে আস্তে পিছনের দরজা দিয়ে সরে পড়লাম। তারপর ক'দিন ধরে তোকে গরু-খোঁজা করছি, কিন্তু দেখাই পাইনি।'

বললাম, 'আমি ঐ ক'দিন খেয়ে-না-খেয়ে বাড়ি বসে ডায়লগ মুখস্থ করেছি।'

—'সত্যি তোর জন্যে দুঃখ হয়।' বলেই দুঃখটা কিঞ্চিৎ লাঘব করবার জন্যেই আরও দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিল মনমোহন।

সন্ধে হয়ে গেছে। জনবিরল তেমাথা রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি। মনমোহন

বলল, 'যাকগে, যা হয়ে গেছে, তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। হ্যাঁ রে, মেসোমশাই একটু আগে তোকে কী বলছিলেন রে?'

ম্লান হেসে বললাম 'সবাক 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নিশাকরের পার্ট দেবার জন্যে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।'

'মেসোমশাই? মিথ্যে কথা।' বলেই সজোরে লম্বা টেবিলটার ওপর ঘুষি মারতে গিয়ে ভর্তি চায়ের কাপ দেখে অতিকষ্টে সামলে নিল মনমোহন।

অবাক হয়ে শুধু বললাম, 'বলিস কী মনমোহন?'

মনমোহন টেবিলের উপর রাখা চায়ের কাপটায় ঝুঁকে মুখ লাগিয়ে দু'-তিন সিপ খেয়ে বলল, 'কাস্টিং-এর ব্যাপারে জাহাঙ্গীর সাহেব কখনও ইন্টারফেয়ার করেন না। শুধু নিশাকরের পার্ট যখন উনি জয়নারায়ণকে দেবার জন্যে সাহেবকে জানালেন, তখন সাহেব একদম বেঁকে বসলেন। বললেন—'না ব্যানার্জি, এটা ধীরাজকে দাও।' দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আমি নিজের কানে শুনে এসেছি।'

ভাবছিলাম, ফিল্মি দুনিয়ার কথা। এই আজব দুনিয়ায় সবই সম্ভব। কাকে বিশ্বাস করব? দু'-তিনজন বাইরের লোক চা খেতে ঢুকল। আমায় দেখেই ঢুকেছে বুঝলাম। চা খাওয়াটা অছিলা মাত্র। মনমোহনকে ইশারায় কোনও কথা না কইতে বলে নিঃশব্দে দুজনে চা খেতে লাগলাম।

নবাগত ছেলে তিনটি তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিল :

১ম । 'দেনা-পাওনা' দেখেছিস পটলা?

পটলা মাথা নাড়াল।

১ম । দেখিস, দুর্গাদাস কী পার্ট করেছে মাইরি! পয়সা উশুল হয়ে যাবে।

৩য় । স্টুডিও বলতে ঐ একটাই তো হয়েছে—নিউ থিয়েটার্স। অন্যগুলো, বিশেষ করে ম্যাডান, তো হরি ঘোষের গোয়াল।

১ম । যা বলেছিস কেষ্টা। সেদিন ক্রাউনে 'জোর-বরাত' দেখতে গেলুম। কী বিচ্ছিরি ছবি। ঠিক স্টেজের মত সিনের পর সিন তুলে গেছে। তার উপর অর্ধেক কথা বোঝা যায় না।

৩য় । বাংলা তো তবু পদে আছে। দেখে আয় ম্যাডানের প্রথম উর্দু ছবি। 'শিরী-ফরহাদ', নিশার আর কজ্জনকে এক জায়গায় বসিয়ে খান দশ-বারো গানই শুনিয়ে দিলে।

পটলা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। নির্বাক শ্রোতার মতো চায়ের কাপটি শেষ করে বলল, 'আচ্ছা, ধীরাজ ভট্টাচার্যকে টকিতে একদম দেখা যাচ্ছে না, কেন বল তো?'

১ম । টকি জিনিসটা কি এতই সহজ মনে করিস পটলা? রীতিমত শিখতে হয়,

পরীক্ষা দিতে হয়। হয়তো ওর গলা টকির উপযুক্ত নয় বলে ছেঁটে দিয়েছে।

আলোচনা হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলত। সামনের তেমাথায় কী একটা গণ্ডগোল তাল পাকিয়ে উঠতেই ওরা চায়ের পয়সা দিয়েই তাড়াতাড়ি সেই দিকে ছুটল।

চুপ করে বসে মনে করবার চেষ্টা করছিলাম, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি, একটার পর একটা এতগুলো সুসংবাদ। চিন্তায় বাধা পড়ল মনমোহনের কথায়, 'চল বাড়ি যাই—রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।'

ম্লান হেসে বললাম, 'এরই মধ্যে বাড়ি কি রে? বস্। একতরফা আমাকে নিয়েই তো এতক্ষণ কাটল, এইবার তোর কথা বল। এতদিন ছিলি কোথায়? স্টুডিওতেও দেখা পাই না।'

কথা কইতে পেলে বেঁচে যায় মনমোহন। বলল, 'দেখা পাবি কী করে? আমি তো এখানে ছিলাম না। মার্কনির সঙ্গে বেনারসে ছবি তুলতে গিয়েছিলাম।'

হেঁয়ালিতে কথা বলছে মনমোহন। হাত ধরে বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'কী যা তা বলছিস। মার্কনির সঙ্গে ছবি তুলতে তুই বেনারসে গেলি কিসের জন্যে?' বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে দোকানের বাচ্চা বয়টাকে দু'খিলি গুন্ডি-পান আনতে বলে মনমোহন বলল, 'আমি আর এডিটিং ডিপার্টমেন্টে নেই। ইতালীয়ান ক্যামেরাম্যান টি. মার্কনির অ্যাসিস্টেন্ট।'

অবাক হলাম না। মনমোহনের পক্ষে সবই সম্ভব। কৌতূহল হল, বললাম, 'ব্যাপার কী?'

মনমোহন বলল, 'মধ্যে যতীন দাস, মংলু, পল ব্রিকে—এদের চাকরি যায়-যায় হয়ে উঠেছিল জানিস?'

—'ঐরকম একটা গুজব শুনেছিলাম বটে, তবে আসল ব্যাপারটা কিছুই জানতে পারিনি।' দু'খিলি পান মুখে পুরতে পুরতে বলল মনমোহন, 'সাইলেন্ট ছবি এডিট করার চেয়ে টকি এডিটিং ঢের ইন্টারেস্টিং ও সোজা। সামনে সিনারিওর খাতা খোলা আছে—শট কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় শেষ হয়েছে সব লেখা আছে; শুধু এডিটিং মেশিনে চালিয়ে দেখে আর অ্যাম্‌প্লিফায়ারে শুনে নিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে জুড়ে দেওয়া, ব্যস্। সত্যি বলতে কি, নির্বাক ছবি এডিট করতে মন বসত না—খালি ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। টকি ভারি মজার, ধর নিশার কি কজ্জনের একখানা গান খুব ভাল লাগল—পাঁচ-সাতবার সেটা চালিয়ে শুনে নিলাম।'

অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'আসল ব্যাপার থেকে তুই অনেক দূরে চলে গেছিস। আমি তোর কাছে সবাক ছবির এডিটিং শিখতে চাইনি। ক্যামেরাম্যানদের চাকরি নিয়ে টানাটানি কেন হল, তাই বল।'

রেগে গেল মনমোহন, 'গোড়া থেকে না শুনলে ছাই বুঝবি।' পরক্ষণেই হেসে ফেলে বলল, 'আসল ব্যাপার থেকে দূরে যাইনি। সবটা শোন্ আগে। ছবি যেমন

যেমন তোলা হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে লেবরেটারিতে পাঠিয়ে ডেভলপ করে সোজা চলে এল আমার এডিটিং রুমে। ক্ল্যাপস্টিক টু ক্ল্যাপস্টিক জয়েন করে আবার পাঠিয়ে দিলাম লেবরেটারিতে রাশ প্রিন্টিং-এর জন্যে। এইভাবে তিন-চারটে রোল প্রিন্ট হয়ে গেলে পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, লেবরেটারির লোক সব প্রাইভেটে ছবি চালিয়ে দেখে নেয় কেমন হচ্ছে। হিন্দী 'লয়লা মজনু' আর বাংলা 'ঋষির প্রেম' ছবি দু'টোর ছটা রিল প্রোজেকশন দেখে সবার আক্কেলগুড়ুম। সারা ছবিতে তারা ভর্তি— কোনটায় নিশারের নাক নেই, লম্বা স্ক্র্যাচ, কোনটায় কজ্জনের চোখ নেই, এমনি ছটা রিলে কিছু না কিছু আছেই। প্রথমেই দোষ লেবরেটারির উপর। নিশ্চয় ডেভলপ বা প্রিন্ট করবার সময় অসাবধানে ওরাই কিছু একটা করেছে।

লেবরেটারি ইনচার্জ মিঃ সুলম্যান তখনই সবাইকে ডেকে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, একই সলিউশন বাথ-এ মিঃ গাঙ্গুলীর 'প্রহ্লাদ' ছটা রীল ডেভলপ ও প্রিন্ট হয়েছে তাতে কোনও দাগ নেই, পরিষ্কার ছবি। তবে? তাহলে নিশ্চয়ই খারাপ ফিল্ম। মার্কনি 'প্রহ্লাদে'র ক্যামেরাম্যান, সে তখনি দেখিয়ে দিলে একই নম্বরের ফিল্ম থেকে তিনটে ছবিই তোলা হয়েছে। তাহলে? ক্যামেরাম্যানদের মুখ শুকিয়ে গেল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সবাই পরীক্ষা করতে বসল নেগেটিভ।' এই পর্যন্ত বলেই চুপ করল মনমোহন।

আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। বললাম, 'তারপর কী হল বল?'

নিজের মনেই খানিকটা হেসে নিয়ে হঠাৎ মনমোহন বললে, 'এখনও বুঝতে পারিসনি ব্যাপারটা?'

সত্যিই পারিনি, মাথা নাড়লাম।

মনমোহন বলল, 'পরদিন সকাল দশটার আগে হেড অফিসে চলে গিয়ে রুস্তমজীর সঙ্গে দেখা করলাম। সব শুনে সাহেব হেসে ফেলল, বলল, এখন তাহলে তুমি কী করতে চাও? সোজা বলে দিলাম—আমাকে ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টে দিন। মার্কনি সাহেবের সঙ্গে কাজ করতে চাই। সাহেব তখনি একটা কাগজে অর্ডার দিয়ে দিলেন। অমন মনিব হয় না রে ধীরাজ! ব্যস্, আর আমায় পায় কে? ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে খাকি প্যান্ট ও হাফ শার্ট পরে পরদিন থেকেই মার্কনির ক্যামেরার কাজে লেগে গেলাম। কোম্পানির খরচায় আজ এদেশ কাল সেদেশ দেখা, তোফা ঘুরে বেড়াচ্ছি—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'তাতো বেড়াচ্ছিস, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছিল বললি না তো?'

—'বলছি দাঁড়া' বলে উঠে বাইরে গিয়ে পান আর খানিকটা দোক্তা মুখে পুরে বার দুই পিক ফেলে আমার পাশে এসে বসল মনমোহন। তারপর অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় বলল, 'জানিস তো আমি পানটা একটু বেশিই খাই। এডিটিং করবার সময়

নিশার, কজ্জন আর যে কোনো গাইয়ের গান আমার ভাল লাগত, সেগুলো অনেকবার করে অ্যামপ্লিফায়ারে বাজাতাম আর সেই সঙ্গে গলা ছেড়ে গাইতাম গানটা শিখে নেবার জন্যে। নেগেটিভের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে লিপ মুভমেন্ট দেখে মশগুল হয়ে গাইতাম। এদিকে মুখ থেকে ছর্‌রার মতো ছিটকে পানের পিক আর ছোট ছোট সুপুরির কুচি সারা নেগেটিভটিকে চিত্তির-বিচিত্তির করে দিত। ফিল্ম জড়াবার সময় এই সুপুরীর কুচির ঘষা লেগে নেগেটিভে স্ক্র্যাচ্ হয়ে যেত। শুধু চোখে দেখা যেত না। কাজেই লেবরেটারি কিছু বুঝতে না পেরে নেগেটিভ তেল দিয়ে পরিষ্কার করে প্রিন্ট করে যেত। গাঙ্গুলীমশাই-এর 'প্রহ্লাদ' ছবিতে স্ক্র্যাচ হয়নি কারণ সেটা এডিট করেছিল মুখুজ্যে। এইবার ব্যাপারটা বুঝলি হাঁদারাম?'

এইবার হাসবার পালা আমার। ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট সব ভুলে অনেকদিন বাদে হাসলাম।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ছবিতে নিশাকরের পার্ট সত্যিই পেলাম। ছোট্ট ভূমিকা কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগল। এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে শুধু আমি কেন, ম্যাডান স্টুডিওর অনেকেই বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল। মিঃ গাঙ্গুলী ম্যাডানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে স্থায়ীভাবে যোগ দিলেন মতিলাল চামারিয়ার স্টুডিও 'ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মস্'-এ। কেউ কেউ বলল সবাক ছবির বাজারে সাহেবরা হিন্দী ছবিকে প্রাধান্য দেওয়ায় উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। আবার কেউ বলল, আগে ফিল্ম ডিপার্টমেন্টে একরকম সর্বময় কর্তা ছিলেন—টকি আসায় হিন্দী ডিপার্টমেন্ট ওঁর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। গুজব যাই হোক, মিঃ গাঙ্গুলী যে দীর্ঘদিন বাদে ম্যাডান ছাড়লেন এইটেই সত্যি। এর কিছুদিন বাদেই শুনলাম যতীন দাসও ম্যাডান ছেড়ে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্'-এ যোগ দিয়েছে। ভাঙন শুরু হল এই থেকেই। আজ লেবরেটারির দু'জন কর্মী, কাল পেন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে চারজন, এইভাবে রোজ একটা না একটা কিছু ঘটতেই লাগল। আগে ম্যাডান ছাড়া কোনও স্থায়ী স্টুডিওই ছিল না, কাজেই মাইনে বাড়ানোর কথা বলতে কারও সাহস হত না। সবাক যুগে এসে চারদিকে স্টুডিও গজিয়ে উঠতে লাগল, কর্মীদেরও কদর আর মাইনে গেল বেড়ে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র শুটিং শেষ করে বাইরে একটা বেঞ্চে বসে এইসব কথাই মনে মনে আলোচনা করছিলাম আর সেই সঙ্গে আমার পাথর-চাপা অদৃষ্টের কথা ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। অপরিচিত একটি লোক সামনে এসে নমস্কার করে বলল—'আপনার নামই তো ধীরাজবাবু?' বললাম, 'হ্যাঁ।' লোকটি কাছে এসে চুপিচুপি বলল, 'আপনাকে 'ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মস'এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ খেমকা একবার ডেকেছেন। ওঁদের প্রথম দোভাষী 'রাধাকৃষ্ণ' ছবিতে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের পার্ট দেবেন ঠিক করেছেন।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতেও ভয় হচ্ছিল।

ম্যাডান স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাট রোড ধরে সোজা পুবমুখো মাইলখানেক হেঁটে, দাঁড়িয়ে ডানদিকে চাইলেই প্রথমে নজরে পড়বে, সামনে বহুদূর পর্যন্ত ধু ধু করছে বৃক্ষলতাহীন বিস্তীর্ণ পোড়ো জমি। তারও ওপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে দেখা যাবে দূরে—ঐ বিস্তীর্ণ মাঠের পশ্চিম প্রান্তে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছবির মত একটা বাড়ি। একটু চেষ্টা করলে পড়াও যাবে সামনে বড় গেটটার মাথা জুড়ে একটা সাইনবোর্ড, বড় বড় হরফে লেখা, 'ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মস্ লিঃ'। গেটের সামনে সদ্য তৈরী করা লাল সুরকির পথটা সোজা এসে মিশেছে বড় রাস্তায়, দেখলেই মনে হবে স্বাগতম জানাচ্ছে।

লাল সুরকির পথ বেয়ে এসে বাধা পেলাম গেটে, দরওয়ানের কাছে। বন্ধ গেটের বাইরে টুল পেতে বসে আছে মোটা খাকি কোট পরা মাথায় পাগড়ি দরওয়ান, ভিতরে ঢুকতে হলে কার্ড বা স্লিপ চাই। দরওয়ানের কাছ থেকেই একটা কাগজ পেন্সিল চেয়ে নিয়ে খেমকাবাবুর নাম লিখে নিচে সই করে দিলাম। একটু পরেই ভিতরে যাবার অনুমতি এল। ঢুকেই সামনে পড়ে গোল ফুলের বাগান, তার দুপাশ দিয়ে লাল সুরকির পথ মিশেছে গিয়ে গাড়ি বারান্দার নিচে। মোটরে গেলে সেইখানে নামতে হয়। চারদিক চেয়ে দেখলাম, প্রায় দশ-বারো বিঘে বাগানের উপর বাড়িটা। শুনেছিলাম, বাড়িটা ভবানীপুরের তখনকার দিনের বিখ্যাত উকিল দ্বারিকানাথ চক্রবর্তীর বাগানবাড়ি। দীর্ঘমেয়াদী লিজ নিয়ে মতিলাল চামারিয়া স্টুডিও করেছেন। গেটের ঠিক উত্তরে একটি সাউন্ড ফ্লোর তৈরী হচ্ছে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম স্টুডিও। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গাড়িবারান্দার পাথরের সিঁড়ি বেয়ে একটু উপরে উঠেই ডানদিকে যে বড় ঘরটি পড়ে সেইটে হল আফিস। কেরানী, টাইপিস্ট, ক্যাশিয়ার সব বসে সেই ঘরটায়। বাঁদিক দিয়ে চওড়া কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। উঠেই প্রথমে ডানদিকে একটা পার্টিশন দেওয়া ঘর, মাঝেই সুইং ডোরটার ঠিক উপরে চকচকে পিতলের হরফে লেখা—মিঃ বি. এল. খেমকা, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। দরজা ঠেলে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখি, তিনটি অবাঙালি মেয়ের সঙ্গে হেসে গল্প করছেন মিঃ খেমকা। আমায় দেখেই বললেন—'একটু পরে এসো ধীরাজ, এদের সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।'

পার্টিশনের বাইরে একটা পরিষ্কার বেঞ্চি পাতা ভিজিটার্সদের জন্যে। সেটায় না বসে এগিয়ে গাড়ি-বারান্দার ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। দূরে গড়িয়াহাট রোডের দিকে চেয়ে আনমনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশা-নিরাশার নাগরদোলায় দুলছিলাম। বেয়ারা এসে সেলাম দিল—'সাহেব ডাকছেন।'

ঘরে ঢুকে নমস্কার করে দাঁড়াতেই অতি পরিচিতের মতোই হেসে খেমকাবাবু বললেন, 'বোসো ধীরাজ।'

ম্যাডান স্টুডিওতে সাহেবদের সঙ্গে বার দুই-তিন দেখেছিলাম খেমকাবাবুকে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা, সবসময় মুখে হাসি লেগেই আছে। একবার কাছে গেলেই অপরিচয়ের বাধা লজ্জা পেয়ে দূরে সরে যায় আপনা থেকেই।

সিগারেটের টিনটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে খেমকাবাবু বললেন, 'তোমাকে আমার প্রথম ছবি 'রাধাকৃষ্ণ'তে শ্রীকৃষ্ণের পার্ট দেব বলে ঠিক করেছি।'

কিছু না বললে খারাপ দেখায়, বললাম, 'কাগজে কিন্তু ডলি দত্তের নামে বিজ্ঞাপন দেখলাম।'

'ওটা গাঙ্গুলীমশায়ের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি আপত্তি করেছি। মেয়েছেলেকে দিয়ে কেষ্টর পার্ট ছবিতে অন্তত চলে না বলেই আমার ধারণা। যাই হোক, হিন্দী-বাংলা দুটো ছবিতেই তোমায় কেষ্টর পার্ট করতে হবে। আমি তোমার সঙ্গে ছ'মাসের কনট্রাক্ট করতে চাই, মাসে দেড়শো টাকা দেব। তোমার কিছু বলবার থাকে তো বলো ভাই।'

স্পষ্টবাদী লোক, মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। খুব ভাল লাগল খেমকাবাবুকে। তখনই রাজী হয়ে কনট্রাক্ট সই করে দিয়ে এলাম।

বেয়ারাকে দিয়ে ড্রাইভারকে ডাকিয়ে এনে খেমকাবাবু বলে দিলেন, 'ধীরাজকে ট্রামডিপোয় ছেড়ে দিয়ে এসো।'

নমস্কার করে চলে আসছি, খেমকাবাবু বললেন, 'বেলা এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ট্রামডিপোয় কোম্পানির গাড়ি অপেক্ষা করবে। তারপর এলে তোমায় হেঁটে বা নিজের পয়সায় রিক্সা বা ট্যাক্সি করে আসতে হবে। শুটিং থাকলে গাড়ি তোমায় বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে, পৌঁছে দেবে।'

সামনের মাস থেকে ইস্ট ইন্ডিয়ার কনট্রাক্ট শুরু, এখনও আট-ন দিন বাকি। পরদিন দুপুরে ম্যাডান স্টুডিওয় গিয়ে জ্যোতিষবাবুকে সব বললাম।

শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন জ্যোতিষবাবু, তারপর বেশ একটু অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ভালই করেছ। বুঝতে পারছি, ভাল ভাল সব আর্টিস্টগুলোকে এইভাবে ভাঙিয়ে নিয়ে গাঙ্গুলীমশাই ম্যাডানকে জব্দ করছেন।'

হেসেই বললাম, 'ভালর দলে আমাকে টানবেন না। আজ দেড় বছরে এতগুলো ছবি তুললেন আপনারা। আশি টাকা মাইনের আর্টিস্টকে ছোটখাটো একটা পার্ট দেবার কথাও মনে হয়নি কারও। এ লাইনে বেঁচে থাকতে হলে একটা কিছু করা ছাড়া আমার আর উপায় কী ছিল বলুন?'

জাহাঙ্গীর সাহেব পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, জ্যোতিষবাবু এগিয়ে গিয়ে বললেন— 'ধীরাজকে গাঙ্গুলীমশাই ইস্ট ইন্ডিয়ায় নিয়ে নিয়েছেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে সাহেব হেসে বললেন—'আই অ্যাম

গ্ল্যাড ধীরাজ! উইশ ইউ সাকসেস।'

বহুদিনের পুরোনো কর্মস্থল, কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। জঙ্গলে যেখানটায় মাধবাচার্য পর্ণকুটির দাহ করেছিলেন—সেখানটায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড আর একটা সাউন্ড ফ্লোর, জাল সাহেব বীণার পায়ে রিস্টওয়াচ বেঁধে যে ন্যাড়া সিমেন্টের ফ্লোরটায় নাচিয়েছিলেন, সেখানটায় গজিয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা গুদাম ঘর। ছোট-বড় কাঠ কেটে সেটিং মিস্ত্রীরা রাতদিন তৈরী করছে সেটের ফ্রেম-সিঁড়ি, বাড়ির দরজা, জানলা, টেবিল চেয়ার। খুটখাট শব্দে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কানে তালা লেগে যায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পুবদিকে মেক-আপ রুমের সামনে দাঁড়লাম। একটিও চেনা মুখ পেলাম না। চারিদিকে কিলবিল করছে কোরিন্থিয়ান আর অ্যালফ্রেড থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল। প্রকাণ্ড লম্বা মেক-আপ রুম, চারপাশে দেওয়ালে কাত করে রাখা দামী লম্বা আয়না। তার উপরে পাশে অসংখ্য বেশি পাওয়ারের দামী ইলেকট্রিক বাতির মালা। মেক-আপের জিনিসও দেখলাম বদলে গেছে। জার্মানির লিচেনারের স্থান অধিকার করেছে আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাক্সফ্যাক্টারের মেক-আপ পাউডার, পেন্সিল-লিপস্টিক সব। আয়নার সামনে অসংখ্য চেয়ারগুলোতে বসে আছে রংবেরং-এর বিচিত্র পোশাক পরা শিল্পীর দল। পাঁচ সাতজন নতুন মেক-আপ ম্যান গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে মেক-আপ করতে। একজন উঠতে না উঠতেই আর একজন এসে বসছে। মেক-আপ করতে করতে চোখ বুজে কেউ দেখি বিড়বিড় করে সংলাপ আওড়াচ্ছে, আবার কেউ গানের তান ও গমক রপ্ত করতে ব্যস্ত। কতক্ষণে ফ্লোরে গিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি সংলাপ অথবা গলা ভর্তি তানগুলো উগরে দিয়ে নিশ্চিত হবে, এই এক চিন্তা সবার মনে।

নয়া ফিল্ম দুনিয়ার এই আজব চিড়িয়াখানার কথা ভাবতে ভাবতে এক নম্বর ফ্লোরের সামনে এসে হাজির হলাম। আজ চেনা মুখ একটাও দেখতে পাচ্ছি না। মনমোহন, জয়নারায়ণ, মুখুজ্যে, লেবরেটারির দু'-তিনটে বাঙালি ছেলে—কারও দেখা নেই। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলাম—অদূর ভবিষ্যতে ম্যাডান স্টুডিওতে সবাক ছবির তরঙ্গাঘাত সহ্য করে ভেসে থাকা বাঙালির পক্ষে খুব শক্ত। কানের কাছে তারস্বরে ইলেকট্রিক হর্নটা আর্তনাদ করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশের সাউন্ড ট্র্যাকের অ্যাম্‌প্লিফায়ারে ভেসে এল জাহাঙ্গীর সাহেবের গলা—'খামোশ! মনিটার।' সবাক ছবির শুটিংএ 'মনিটার' কথাটা রিহার্সালের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। কেন হয়, বলতে পারব না।

অ্যাম্‌প্লিফায়ারে মাস্টার নিশার ও কজ্জন বাঈ-এর গলা শুনতে পেলাম। এক লাইন সংলাপ বলে নিশার শুরু করে গান। সেটা শেষ হতেই কজ্জনের সংলাপ শোনা যায়, তার পরেই গান। শুনেছিলাম ছবিটার নাম 'চন্দ্র-বাকাওলে'—দুটি

প্রেমিক-প্রেমিকার অমর উপাখ্যান। মনিটার শুনে অবাক হয়ে ভাবলাম, এই গানের কুরুক্ষেত্রে প্রেম কোথায় আত্মগোপন করে থাকতে পারে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। 'মনিটার' শেষে জাহাঙ্গীর সাহেব বেরিয়ে এলেন সাউন্ড ট্র্যাকের কাছে রেকর্ডারের কিছু বক্তব্য আছে কিনা জানতে। সাহস করে সামনে গিয়ে ইংরেজিতে বললাম— 'আমি শুটিং দেখতে চাই স্যার!'

সাহেব তখনই বললেন—'কাম ইন ধীরাজ।'

ভেতরে ঢুকে পাশের দিকে একখানা চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়লাম।

শুটিং না গানের জলসা? সমস্ত ফ্লোরটার অর্ধেকেরও বেশী জুড়ে সেটা। নানা কারুকার্য করা রংবেরং-এর থাম, সমস্ত দেওয়ালগুলোয় লতাপাতা আঁকা। তারই মধ্যে নগ্নবক্ষ দু'-তিনটে সুন্দরী মেয়ে ফুল হাতে অর্ধনিমীলিত চক্ষে এক বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। সামনে প্রকাণ্ড হল ঘর। ঘর না বলে উঠোনও বলা চলে। তার ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড বেদীর মতো ফরাশ, মেঝে থেকে দশ-বারো ইঞ্চি উঁচু। তার উপর বিচিত্র কারুকাজ করা মখমলের জাজিম পাতা। ফরাশের চারপাশে প্রকাণ্ড মখমলের তাকিয়া, তাতেও জরির কাজ। মাঝখানে তাম্বুলাধার, গোলাপ জলাধার, সুরাপাত্র। দু'ধারে দুটো মূল্যবান ফুলদানিতে বড় বড় বাসরাই গুলাব (কাগজের)। একদিকে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে নায়ক মাস্টার নিশার। পরনে সাটিনের ঢিলে পায়জামা, তার উপর ঢিলে হাতা জরির নকশা করা সাটিনের পাঞ্জাবি, তার উপর সাচ্চা জরির জ্যাকেট, মাথায় সোনালী জরির টুপি, হাতে গড়গড়ার নল। নলের উৎস খুঁজতে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বেশ খানিকটা ঘুরে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে দূরে সেটের শেষ প্রান্তে রাখা প্রকাণ্ড একটা পিতলের তাওয়া দেওয়া কলকে। অপর প্রান্তে আর একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চোখ-ধাঁধানো জরির সামলা পায়জামা, ওড়না ও একরাশ জড়োয়া গহনা পরে বসে আছেন হাড়সার ডিগডিগে রোগা কোকিলকণ্ঠী কজ্জনবাঈ, হাতে মখমলের উপর জরির কাজ করা পাখা। তার পাশে বসে আছেন অপেক্ষাকৃত কম জলুসদার পোশাক ও গহনা পরে পেসেন্স কুপার, মিস শীলা ও মুক্তার বেগম, বোধ হয় কজ্জনের সখি। সিন-সিনারি, পোশাক-আশাক সব মিলিয়ে এটা মোগল বাদশাহের আমলের কাহিনী, না বাগদাদের হারুণ-অল-রসিদের সময়ের ঘটনা বলা খুব শক্ত।

এদের উপর থেকে চোখ সরিয়ে চারপাশের অসংখ্য থামওয়ালা বারান্দায় দৃষ্টিপাত করলে প্রথমটা অবাক হয়ে যেতে হবে। সাধারণ মুসলমানী পোশাক — লুঙ্গি, পায়জামা, ঢিলে পাঞ্জাবি, মাথায় পাতলা সাদা মুসলমানী টুপি পরে এক-একটি থামের আড়ালে এক একটি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শিকারী বেড়ালের মতো ওত পেতে বসে আছে একটি করে মুসলমান বাদ্যযন্ত্রী। পরে বুঝলাম ক্যামেরার ফোকাসের বাইরে রাখতে হবে বলে ওদের ঐভাবে থামের আড়ালে আত্মগোপন করে বসানো হয়েছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, আওয়াজ যার তীক্ষ্ণ তাকে বসানো হয়েছে তত দূরে। যেমন ক্ল্যারিওনেট, বাঁশের বাঁশি, করনেট, তবলা ইত্যাদি। এছাড়া বেহালা, সারেঙ্গী ও পিয়ানো মাইক্রোফোনের কাছে।

পরিচালক জাহাঙ্গীর সাহেবের সহকারী কোরিন্থিয়ানের একটি মুসলমান অভিনেতা মোটা বাঁধানো খাতা হাতে নিশার ও কজ্জনকে সংলাপ পড়াতে শুরু করলেন। সব কথার মানে না বুঝলেও ভাবার্থ এই—

নিশার—তোমাকে দেখার পর বেহেস্তের হুরী এসেও যদি আমায় প্রেম নিবেদন করে, আমি ফিরেও চাইব না। বলেই গান ধরবে নিশার। গান শেষ হলে তাকিয়া থেকে সোজা হয়ে উঠে বসে কজ্জন বলবে—যাও যাও, তোমাদের পুরুষ জাতটাই বেইমান। মুখে বলছ এক, এখান থেকে বেরিয়েই বলবে অন্য কথা। তারপর চলবে গান। দু'-তিনবার মনিটার হল, কে বলবে এটা প্রেমের সিন, এ যেন কে বড় গাইয়ে তারই চরম পরীক্ষা। গানের বাণী স্পষ্ট বোঝা যায় না, শুধু তান আর গিটকিরির খণ্ডযুদ্ধ। বাদ্যযন্ত্রীরাও কম যায় না। প্রাণপণে বাজিয়ে প্রতিপন্ন করতে চাইছে তারা প্রত্যেকেই এক-একটি যন্ত্রবিশারদ, ফলে সবাই লাউড। গান, সংলাপ, বাজনা সব মিলিয়ে শুধু মনে হবে—সুরের কালবৈশাখীতে অসুরের তাণ্ডব নাচ।

ঘন্টা দিয়ে সবাইকে নিস্তব্ধ করে যথারীতি শুটিং আরম্ভ হল। একটা জিনিস স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম, হিন্দী ছবির পারিপার্শ্বিক সব কিছু দৃষ্টিকটু হলেও নিশার ও কজ্জনের অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠের ঝংকার শ্রবণে মধু বর্ষণ করে, গান থেমে গেলেও মনে হয় আর একবার শুনি। নিশার গান শেষ করে হাসিমুখে কজ্জনের দিকে চাইতেই উঠে বসে সংলাপ বলে নিশারের দিকে হাত বাড়িয়ে তান শুরু করলো কজ্জন। উঁচু পর্দা থেকে গিটকারির গমকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করলো সুর। তারপর তানে লয়ে গান আরম্ভ হল। হঠাৎ বিকট বেসুরো আর্তনাদ করে ইলেকট্রিক হর্ন বেজে উঠল। সবাই অবাক, চমৎকার হচ্ছিল শটটা, এভাবে থামিয়ে দেওয়ার মানে কী?

নিস্তব্ধ ফ্লোরে বোধহয় জোরে নিশ্বাস নিলে আওয়াজ শোনা যায়, হুড়মুড় করে দরজা খুলে দু'-তিনটি পার্শি ভদ্রলোক ঢুকে পড়লেন ফ্লোরে। চুপিচুপি জাহাঙ্গীর সাহেবকে কী বলতেই দেখলাম একরকম ছুটে চললেন সাহেব বাইরে গেটের দিকে। ব্যাপার কী? বাইরে এসে দেখলাম, কারও মুখে কথা নেই, সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। গাড়ি গেটের কাছেই ছিল, ছুটে গিয়ে উঠে স্টার্ট দিয়ে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন জাহাঙ্গীর সাহেব। লেবরেটারি বন্ধ করে মিঃ সুলম্যান ছুটে চলেছেন গেটের দিকে। যাকে জিজ্ঞাসা করি, উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে। এক নম্বর ফ্লোরের ভিতরে উত্তরদিকে পুরু কাঁচের পার্টিশনে ক্যামেরাম্যান চার্লস কীড প্রকাণ্ড সুপার পারভো ডেব্রি ক্যামেরায় শুটিং করেছিলেন। ক্যামেরা

ঘরের দরজা বন্ধ করে ব্যস্ত হয়ে গেটের দিকে চলেছেন দেখে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম—'ব্যাপার কী?'

অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে কীড সাহেব বললেন—'তুমি শোননি ধীরাজ? এই মাত্র হার্টফেল করে মারা গেছেন রুস্তমজী সাহেব।'

.

আমার যোগসূত্রহীন বিক্ষিপ্ত নায়ক জীবনে যে ক'টি স্মরণীয় চরিত্রের নিকট-সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল, পরোপকারী কর্মবীর রুস্তমজী সাহেব তার মধ্যে অন্যতম। এর বেশী কিছু বলতে গেলে সেটা বাড়াবাড়ির মতো শোনাবে, নয়তো তাঁকে ছোট করা হবে। তাই সেদিন সবার সঙ্গে সমারোহ করে সমবেদনা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে ৫ নং ধর্মতলায় যেতে পারিনি, জনশূন্য স্টুডিও-শ্মশানে একা প্রেতের মতো অনেকক্ষণ বসে থেকে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলাম।

হঠাৎ নোঙর-ছেঁড়া নৌকা দুরন্ত স্রোতের মুখে পড়লেও সজাগ মাঝির পাকা হাতের গুণে আবার নিরাপদে তীরে ভিড়তে পারে, কিন্তু মাঝির অভাবে তার অনিশ্চিত পরিণামের কথা চিন্তা করতেও ভয় হয়। সারা ভারতব্যাপী বিবিধ ব্যাবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জে. এফ. ম্যাডান কোম্পানির অবস্থা একমাত্র রুস্তমজীর অভাবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জটিল পরিস্থিতির ভয়াবহ আবর্তে ঘুরপাক খেতে লাগল। শুরু হল ভাঙন। ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া বিবাদ মনোমালিন্য এতদিন যা প্রচ্ছন্ন ছিল তারই রূঢ় প্রকাশ দেখা দিল—ভিন্ন হয়ে সবকিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা করে পৈত্রিক বাসস্থান '৫ নং ধর্মতলা' ছেড়ে যে যার আলাদা-আলাদা বাড়ি ভাড়া করে বা কিনে বাস করার মধ্য দিয়ে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতেও দেরি হল না। এক-এক করে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো দেনার দায়ে নয়তো দেখাশোনার অভাবে উঠে যেতে লাগল। স্টুডিওর অবস্থা দাঁড়াল সরকারী মায়ের মতো। ভাইয়েদের যার যখন খুশি এসে খানিক কর্তৃত্ব করে যান। মাসদেড়েকের মধ্যেই শোনা গেল, পুরোনো ও নতুন পাওনা ঋণের উপর আরও কিছু দিয়ে স্টুডিওর সর্বস্বত্ব কিনে নিয়েছেন ধনকুবের রায়বাহাদুর সুখলাল কারনানি। দিনপনেরোর মধ্যেই দেখলাম ম্যাডান স্টুডিওর বড় গেটের মাথায় হলিউডের অনুকরণে বড় বড় হরফে লেখা 'টলিউড স্টুডিও'। পরে নাম পালটে রায়বাহাদুরের নাতি ইন্দ্রকুমারের নামানুসারে রাখা হয়—'ইন্দ্রপুরী স্টুডিও'। শুরু থেকে বাংলার ফিল্ম শিল্পের অগ্রগতির একটানা ইতিহাসের পূর্ণচ্ছেদ এইখানে পড়ে গেল। নতুন করে লেখা আরম্ভ হল এক অনাগত বৈচিত্র্যময় মুখর অভিযানের ভূমিকা। যাক, সে পরের কথা।

নির্দিষ্ট দিনে ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওয় গিয়ে হাজির হলাম। নতুন ভাড়াটের মতো চারদিকে ঘুরে ঘুরে সব দেখে বেড়াচ্ছিলাম, খেমকাবাবুর বেয়ারা এসে জানালে যে, বাবু ডাকছেন। উপরে খেমকাবাবুর ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

সামনের চেয়ারে দামী স্যুট পরে হাতে ৫৫৫ সিগারেটের টিন নিয়ে গম্ভীরভাবে বসে রয়েছে রাজহংস। খেমকাবাবুর হাতে একটা লম্বা ফর্দ। সেইটের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন—'বসো ধীরাজ।'

আমার দিকে একনজর চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোনও কথা না বলে টিন থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে টানতে লাগল রাজহংস। কেমন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে চুপ করে বসে রইলাম। একটু পরে ফর্দটার নিচে নাম সই করে সেটা রাজহংসকে দিতে-দিতে খেমকাবাবু বললেন— 'তোমার সঙ্গে ধীরাজের আলাপ নেই?'

কাগজখানা পকেটে রাখতে রাখতে অম্লানবদনে রাজহংস বলল—'ইয়েস, উই ওয়ার্কড অ্যাট ম্যাডানস্।' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুটের ভঙ্গিতে নমস্কার করে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কৌতূহল চাপতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—'রাজহংস কি এখানে আসছে?'

—'হ্যাঁ, আমার প্রথম উর্দু সবাক 'King for a day' বা 'এক দিনকা বাদশা' ছবিটা ওরই লেখা এবং পরিচালনাও ওই করবে। তারই এসটিমেটেড লিস্টটা অ্যাপ্রুভ করে সই করে দিলাম।'

অদ্ভুত ছেলে এই রাজহংস। মনে মনে ভাবলাম, সেদিন রাত্রে সিরাজগঞ্জে সুনীলার কেবিনে ঢুকে অসার দম্ভ যে করেনি, তার প্রমাণ তো হাতে-হাতে পেলাম। অর্ধেক রাজত্ব যখন পেয়েছে তখন রাজকন্যার দেখা পেতেও যে বেশি দেরি হবে না, এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল এবং সেটা যে সম্পূর্ণ ঈর্ষার, এটা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

খেমকাবাবু বললেন—'তোমায় দেড়শ টাকা মাইনেতে নিয়েছি শুনে গাঙ্গুলীমশাই খুব খুশী হননি।'

—'কেন?'

—'উনি বললেন—ম্যাডানে ওকে মাত্র ষাট টাকা মাইনেতে নিয়েছিলাম আমি, আমায় একবার জিজ্ঞাসা না করে ডবলেরও বেশী মাইনে দিলেন আপনি?'

একটা জব্বর উত্তর ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল, কষ্টে সংবরণ করলাম। ভাবলাম—ওঁরই অধীনে এখন আমায় কাজ করতে হবে, সুতরাং—

খেমকাবাবু বললেন—'উত্তরে আমি কী বললাম জান?'

খেমকাবাবুর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

'আমি বললাম—দেখুন, আমরা মাড়োয়ারির ছেলে, ব্যবসা আমাদের অস্থিমজ্জাগত। ম্যাডানে ওর মাইনের খবর নিয়েই দেড়শো টাকা ঠিক করেছি। নইলে আমি তিনশো টাকায় কনট্র্যাক্ট করতাম ওর সঙ্গে।'

—'শুনে কী বললেন উনি?'

হেসে জবাব দিলেন খেমকাবাবু,—'শুনে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাকগে, দরকারি কথাটা শোন। বাংলা ভারসন-এর নাম হয়েছে 'যমুনা পুলিনে' আর হিন্দীটার 'রাধাকৃষ্ণ।' দুটো ভারসনে সবসুদ্ধ চারখানা গান আছে তোমার। নিচে মিউজিক রুমে গিয়ে কেষ্টবাবুর কাছ থেকে সুরটা তুলে নাও। রোজ এসে রিহার্সাল দেবে। তোমার যা কিছু অসুবিধা হবে আমায় এসে বোলো। যাও নিচে গিয়ে দেখো, কেষ্টবাবু বোধহয় এতক্ষণ এসে গেছেন।'

নমস্কার করে নিচে চলে এলাম। সিঁড়ি থেকে নেমেই ডানদিকে একটা ঘর, তার প্রকাণ্ড দুটো দরজা, সব সময় বন্ধ থাকে। তারই ভিতর দিয়ে অস্ফুট চাপা গানের সুর কানে এল। দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে বন্ধ দরজায় দু'-তিনটে টোকা দিলাম। একটা চাকর দরজা খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকে পড়লাম, আবার দরজা বন্ধ করে দিলে। অন্ধকার ঘর। সদ্য কেনা দামী ইলেকট্রিক আলো ও যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। চাকরটা বলল 'এ ঘর সব সময় বন্ধ থাকে—গান ঘরে ঢুকতে হলে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। বাবুর হুকুম, সব সময় এ ঘর চাবি বন্ধ থাকবে আর একজন পাহারা দেবে।'

লজ্জা পেয়ে বেরিয়ে এসে দক্ষিণ দিকে ঘুরে সামনে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। সামনে প্রকাণ্ড বড় হল ঘর। ঘর জুড়ে কার্পেট পাতা, তার উপর সাদা চাদর বিছানো। তিন চারটে তাকিয়াও ইতস্তত ছড়ানো দেখলাম। অত বড় হল ঘর মেয়ে-পুরুষে প্রায় ভর্তি। ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা (ঝরিয়া), বীণাপাণি (রেডিও), ধীরেন দাস, তুলসী লাহিড়ী (কাহিনী ও গীতিকার) ছাড়াও আরও পাঁচ-ছটি অচেনা মেয়ে, বোধহয় কোরাস গানের জন্য একপাশে বসে আছে। অন্যধারে বাদ্যযন্ত্রের মেলা—পিয়ানো, হারমোনিয়াম থেকে শুরু করে ক্লারিওনেট, বাঁশের আড়বাঁশি, করনেট চেলো, সারেঙ্গী, পাঁচ-ছখানা বেহালা, একগাদা চীনে মাটির বাটি সাজিয়ে জলতরঙ্গ, তবলা, খোল, মৃদঙ্গ, করতাল। এককথায় দেশী-বিদেশী মিলিয়ে প্রায় সব বাদ্যযন্ত্রই আমদানি হয়েছে। এ যেন এক বিরাট গানের জলসা। মাঝখানে একটা বক্স হারমোনিয়াম নিয়ে গুনগুন করে গানের সুর দিচ্ছেন বিখ্যাত অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, পাশে বসে খাতা পেন্সিল নিয়ে সুরের নোটেশন তুলে নিচ্ছেন সহকারী কালী ভট্টাচার্য। একটু পরে গান থামিয়ে পান খেয়ে, সিগারেট ধরালেন কেষ্টদা। দেশলাই জ্বালাতে জ্বালাতে কালী কী বলতেই অনুমানে আমার দিকে ফিরে বললেন—'ধীরাজ? তা ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়।'

কাছে গিয়ে বসলাম। কেষ্টদা বললেন—'তোর গানেরই সুর দিচ্ছিলাম।'

চুপি চুপি বললাম—'কিন্তু চারখানা গান, আমি কি পারবো কেষ্টদা?'

—'আলবত পারবি। শ্রীরামপুরের 'বসন্তলীলা' প্লের কথা আশা করি এত শিগগির ভুলে যাসনি। সেদিন আমিই তোকে জোর করে নামিয়েছিলাম, আজও

বলছি, তোর বদনাম হবে না। গানের সুর তো আমি দেব রে। তুই কিচ্ছু ভাবিসনি।'

ভাবনা তবুও গেল না। আস্তে আস্তে বললাম—'এত সব নাম-করা গায়ক-গায়িকার মধ্যে আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে অনুমান করতে পারছো কেষ্টদা?'

—'পারছি, আর সেইজন্যেই আবার বলছি, মাভৈঃ, কথায় আছে 'রাখে কেষ্ট মারে কে'। আর একটা কথা মনে রাখিস, এখন থেকে ডবল কেষ্ট' তোকে ব্যাক করবে, এক রাধিকার কেষ্ট, দুই তোর কেষ্টদা।'

ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। ভারি লজ্জা পেলাম। চুপ করে আছি, গম্ভীরভাবে আমার দিকে ঝুঁকে চাপা গলায় বললেন কেষ্টদা, 'ওরে মূর্খ, এই গানের অজুহাতে তোকে বাতিল করে দিচ্ছিল। আমিই জোর করে বললাম যে, গানের ভার আমার। খেমকাবাবুও আমাকে খুব সাপোর্ট করলেন। ওদের ইচ্ছে ছিল—'

কথা শেষ হল না। পাশের ঘর থেকে ঈষৎ নাকিসুরের সঙ্গে কান্নার আওয়াজ মিশিয়ে মেয়েলি কণ্ঠে কে বলে উঠল, 'ছকি, হামার কুনো দুঃখ নাই।'

সবাই চুপ। চুপিচুপি কেষ্টদাকে বললাম, 'ব্যাপার কী?'

হেসে জবাব দিলেন কেষ্টদা, 'পাশের ঘরে শ্রীরাধিকা তোমার বিরহে হা-হুতাশ করছেন।'

আবার একটা হাসির গুঞ্জন উঠল ঘরে। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'সত্যিই ব্যাপারটা কী বলবে?'

ইশারায় কাছে ডেকে ফিসফিস করে কেষ্টদা বললেন, 'ব্যাপারটা প্রকাশ্যে আলোচনা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মোদ্দা কথা হল, গাঙ্গুলীমশাই আর মুখুজ্যের ধারণা বাঙালি মেয়েদের মধ্যে রাধার পার্ট করার যোগ্যতা ও রূপ নেই বললেই চলে। তাই অনেক গবেষণা করে নির্বাক যুগের নামকরা অ্যাংলো নায়িকা 'সবিতা দেবী'কে (মিস্ আইরিশ গ্যাসপার) রাধিকার ভূমিকায় মনোনীত করেছেন। সবিতাকে বাংলা শেখাবার ভার নিয়েছে গাঙ্গুলীমশায়ের সহকারী জ্যোতিষ মুখুজ্যে। রোজ দুপুর থেকে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত মুখুজ্যে আদা-জল খেয়ে লেগেছে। যা শুনলি তা হল আট-দশ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের একটা সুপক্ক ফল। যাক, অনেক বাজে কথায় সময় নষ্ট হল, এইবার তোমার গান চারখানা লিখে নাও তো মানিক!'

কালীর কাছ থেকে কাগজ-পেন্সিল চেয়ে নিয়ে গান চারখানা লিখে নিলাম। কেষ্টদা বললেন—'তোর একখানা গানের সুর হয়ে গেছে। গানের সিচুয়েশনটা শুনে নে। কেষ্টর ভয়ে রাধিকাকে বাড়ির বার হতে দেয় না, জটিলা-কুটিলা সব সময় কড়া নজরবন্দী করে রাখে। এমনি সময় একদিন তুই মেয়েছেলে সেজে একতারা হাতে গান গাইতে-গাইতে আয়ান ঘোষের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চলছিস। গানটা হল, 'আজকে আমার একতারাতে (শুধু) তোমারি নাম বাজিয়ে চলি।'

গানটা পুরো গেয়ে গেলেন কেষ্টদা, চমৎকার লাগল। সাদাসিধে সুর, তান বা লয়ের প্যাঁচ নেই। বার দুই গেয়ে অনেকটা ভরসা পেলাম।

কেষ্টদা বললেন, 'এখন পালা, রোজ এসে দু-একবার গেয়ে যাবি। অন্য গানগুলোর সুর এখনও দিইনি, পরে তুলে দেব।' ইন্দুবালাকে কাছে ডেকে কুটিলার গানের রিহার্সাল দিতে শুরু করলেন কেষ্টদা।

অনেকদিন মুখুজ্যের সঙ্গে দেখা হয়নি, তাছাড়া এই অছিলায় সবিতা দেবীর সঙ্গে আলাপের লোভটাও সামলাতে পারছিলাম না। উঠে বারান্দা দিয়ে ঘুরে পাশের ঘরের ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মে আই কাম ইন?'

ভেতর থেকে মুখুজ্যে বলল, 'কাম ইন।'

ঘরে ঢুকে দেখি, ধবধবে সাদা লাল-পেড়ে শাড়ি পরে ঘর আলো করে বসে আছেন সবিতা দেবী। সামনে একটা ছোট টেবিল, তার পাশে একখানা চেয়ারে ঘর্মাক্ত কলেবর সাদা পাঞ্জাবি গায়ে প্রকাণ্ড একখানা খাতা হাতে বসে আছে মুখুজ্যে। আমায় দেখেই বলে উঠল, 'এই যে ধিনি-কেষ্ট। তোমার কথাই হচ্ছিল।'

বললাম, 'কেন?'

সবিতা দেবী বললেন, 'আই ওয়াজ জাস্ট এনকোয়ারিং—।'

হুংকার দিয়ে উঠল মুখুজ্যে, 'সবিতা, আবার?'

—'ও, আই অ্যাম সরি। জানেন মিঃ ভট্চায, হামার গুরুদেবের আদেশ, ইংরেজি বলা একদম বন্দ্।'

মুখুজ্যের পাশে খালি চেয়ারটায় বসে বললাম, 'কেন, এরই মধ্যে আপনি তো বাংলা বেশ ভালই শিখে ফেলেছেন। পাশের ঘরে গানের রিহার্সাল দিতে দিতে আপনার ডায়লগ শুনছিলাম। আমি তো ভেবেছিলাম কোনও বাঙালী মেয়ে—' মুখুজ্যের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলাম। ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে বেশ একটু রেগেই বলল মুখুজ্যে, 'হুঁ, ঠাট্টা হচ্ছে! আর সাতটা দিন বাদে দেখো, তাক লাগিয়ে দেব। রোজ বেলা বারোটা থেকে পাঁচটা-ছটা পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে খাটুনি খাটছি সেটা বৃথা যেতে দেব ভেবেছ?'

ঘরটায় তখনও পাখা ফিট হয়নি, বন্ধ ঘরে এমনিতেই ঘেমে উঠতে হয়। মুখুজ্যের কপালটা ঘামে ভরে উঠেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম কপাল থেকে বুকে পড়ে সাদা পাঞ্জাবির বুকের কাছটা ভিজে সপসপ করছে। বললাম, 'মাথার ঘাম পায়ে না পড়লেও কপালের ঘাম বুকে ফেলে যে খাটুনিটা তুমি খাটছ, তা যেন সার্থক হয় এই কামনা করি।'

সবিতা দেবী খিলখিল করে হেসে উঠতেই মুখুজ্যে সত্যিই রেগে গেল, বলল, 'সরে পড়ো দেখি, এটা আড্ডা দেওয়ার জায়গা নয়, সখিদের সঙ্গে ওর পুরো সিনের ডায়লগটা আজ তৈরী করে না দিলে গাঙ্গুলীমশাই ভীষণ রাগ করবেন।'

সবিতা দেবীকে বিদায় নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালাম। পুরো উদ্যমে খাতা খুলে ডায়লগ পড়াতে শুরু করল মুখুজ্যে। মনে হল, মুখুজ্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে বাংলা মাকে বাঙালি পাড়ায় ধরে রাখতে আর সবিতা চাইছে টেনে হিঁচড়ে চৌরঙ্গীতে অ্যাংলো পাড়ায় নিয়ে গিয়ে গাউন পরাতে। একটু দাঁড়ালেই হেসে ফেলতাম। তাড়াতাড়ি পশ্চিমদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লাম। রাস্তাটা উত্তরমুখো খানিকটা গিয়ে বেঁকে পুবদিকে গিয়ে পড়েছে গেটের কাছে। বাড়িটার পশ্চিমদিকের তিনখানা বড় বড় ঘর নিয়ে হয়েছে লেবরেটারি। দেখলাম, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সব ফিট করতে লেগে গেছে মিস্ত্রীরা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে আবার চলতে শুরু করলাম। হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, কালো মেঘ একটু একটু করে ছেয়ে ফেলছে সমস্ত আকাশটা। ঝড় অথবা বৃষ্টি, নয়তো দুই-ই আসবার সম্ভাবনা। জোরে পা চালিয়ে দিলাম গেটের দিকে। কানে এল, 'ধীরাজ!' পরিচিত গলা। বাঁ দিকের লতাকুঞ্জের ভেতর থেকে আওয়াজটা এল। একবার ভাবলাম, চলেই যাই—কী ভেবে দাঁড়ালাম, তারপর আস্তে আস্তে ঘন লতার গেটের ভিতর ঢুকে পড়লাম। দেখি, চারপাশে নয়নাভিরাম নানা জাতের ফুলের গাছ, মাঝখানে ঘন সবুজ ঘাস, সেই ঘাসের ওপর একটি সুন্দরী অবাঙালি মেয়েকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে বসে আমার দিকে চেয়ে হাসছে, ইস্ট ইন্ডিয়ার একাধারে নট, নাট্যকার ও পরিচালক রাজহংস।

মেয়েটি নতুন বলেই মনে হল। বয়েস কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। ফরসা রং, স্বাস্থ্যও ভাল। বোধহয় অদূর ভবিষ্যতে একাধারে হিরোইন ও জমিদার-গৃহিণী হবার তালিম নিচ্ছিল রাজহংসের কাছে। আমায় দেখে লজ্জা পেয়ে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে সরে বসতে চায় মেয়েটি। রাজহংস জোর করে আরও নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'তারপর, খবর কী ধীরাজ, তুমি একা যে? সুনীলা দেবীকে সঙ্গে আনোনি?'

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। বললাম, 'আনব কি! সিরাজগঞ্জে কী যে গুরুমন্ত্র কানে দিয়ে এসেছ, কলকাতায় এসেই ছুটেছে লাহোরে। যাবার সময় আমায় বলে গেল—আমি লাহোর যাচ্ছি রাজহংসের জমিদারি দেখতে, যদি পছন্দ হয় ফিরে এসেই বরমালা গেঁথে নিয়ে স্টুডিওয় গিয়ে মালাবদল করব। আপনি দয়া করে রাজহংসকে বলবেন আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন হিরোইন ঠিক না করে ফেলে।'

অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, নির্লজ্জ হাসিতে প্রকাণ্ড মুখখানা কদর্য হয়ে উঠছে রাজহংসের। কোম্পানির বাস স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ পেলাম। একরকম ছুটে গিয়ে উঠলাম বাসে। বাইরে তখন ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

টালিগঞ্জের ট্রামডিপো পর্যন্ত তর সইল না। মুষলধারে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়

শুরু হয়ে গেল। কেষ্টদা ও অন্যান্য কর্মীরা ঝড়ের আভাস পেয়ে আগেই সরে পড়েছেন। বাসের ভিতর আমি ও তিন চারটি কাঠের মিস্ত্রী। থেমে, আস্তে চালিয়ে প্রায় আধঘন্টা পরে বাস টালিগঞ্জের তেমাথায় পৌছল। রাস্তায় জল থৈথৈ করছে। দু'-তিনটে গাছ উপড়ে আড় হয়ে পড়েছে ট্রাম লাইনের উপর। বুঝলাম কপালে দুঃখ আছে। অন্ধকার জনশূন্য রাস্তা। একা হেঁটে চলেছি। একটু এগিয়ে পুলিশ ফাঁড়ি। তেমাথার মোড়ে কতকগুলো লোক জটলা করছে। বুঝলাম ট্রাম বা রিকশার আশায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু থেমে আবার উত্তরমুখো চলতে লাগলাম। জামা-জুতো ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। একবার ভাবলাম শখের দামী জুতোটা অন্তত হাতে নিয়ে নিই। পরক্ষণেই ভাবলাম টালিগঞ্জ পাড়ার চেনা অচেনা কেউ না কেউ দেখে ফেলবেই যে, নায়ক জুতো হাতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে চলেছে। এ খবরটা শাখাপল্লবিত হয়ে রটতেও দেরি হবে না, তখন? জুতোর মায়া ত্যাগ করে জল ভেঙে হেঁটেই চললাম। পুলিশ ফাঁড়ি ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে বাঁ দিকে পড়ে প্রকাণ্ড একটা বস্তি, ঐ বস্তির একটা সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মাথায় একটি মেয়েকে ধরে টানাটানি করছে একটা লোক।

অদ্ভুত অবাস্তব কিছু নয়। পুলিশে চাকরি করার সময় পল্লীবিশেষে এর চেয়েও বীভৎস নাটকীয় দৃশ্য চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। এসব ক্ষেত্রে না দাঁড়িয়ে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ, করছিলামও তাই । কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম মেয়েটির কথায়, 'শুনুন, দেখুন না এরা আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

এরা? গলিপথে দৃষ্টি প্রসারিত করেও জনপ্রাণীকে দেখতে পেলাম না; শুধু একটি লোক মেয়েটার হাত ধরে টানাটানি করছে। লোকটা মাতাল, জড়িতস্বরে বলল, 'কেন মিছেমিছি লোক ডাকাডাকি করছ, লক্ষ্মী মেয়ের মতো সুড়সুড় করে চলে এসো, কাছেই আমাদের ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, ঘণ্টাখানেক বাদে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব।'

কিছুদূরে অন্ধকার গ্যাসপোস্টের নিচে আলো নিবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানা ট্যাক্সি। মনে হল ভিতরে লোকও রয়েছে তিন-চারজন। কী করি? বীরত্ব প্রকাশের এরকম একটা সুযোগ ছাড়তেও মন চাইছিল না। আবার স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে সাহসও হচ্ছিল না। দোটানায় পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জড়িতস্বরে মাতালটা বলল, 'কেউ তোমায় রক্ষে করতে আসবে না মানিক! ভাল কথা বলছি, চলে এস। এক ঘন্টায় পাঁচ টাকা—আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেহি দশ টাকাই দেব—'

—'চাই না আপনার টাকা, আমায় ছেড়ে দিন।'

—'তা কি হয়? একটু আগে বলছিলে—মায়ের অসুখ, দুটো টাকা দিন, এর মধ্যেই—'

ছোট ড্রেনটা লাফ দিয়ে পার হয়ে একেবারে সামনে গিয়ে পড়লাম। মাতালটা আশা করতেই পারেনি এই দুর্যোগে নোংরা গলিতে ততোধিক নোংরা ব্যাপারে আর কেউ মাথা গলাতে আসবে।

বললাম, 'হাত ছেড়ে দাও।'

চুরচুরে মাতাল, ঠিক হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। মেয়েটার হাত ধরে কোন মতে টাল সামলে বলল, 'ভাল চাও তো সরে পড়। আমি একা নই, গাড়িতে আমার লোক বসে আছে।'

বড় রাস্তায় দেখলাম—এরই মধ্যে জনকয়েক হুজুগপ্রিয় নিষ্কর্মা লোক মজা দেখতে দাঁড়িয়ে গেছে! তাদেরই একজনকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'পাশে পুলিশ ফাঁড়িতে একটা খবর দিন তো।'

কাজ হল। হাত ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল লোকটা, 'আচ্ছা, এর ফল দু'-এক দিনের মধ্যেই পাবে।' অস্ফুটস্বরে কয়েকটা অশ্লীল গালাগালও আমার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়ে গেল। প্রতিবাদ করে কেলেঙ্কারি করতে সাহস ও প্রবৃত্তি হল না। কাছ থেকে ভাল করে দেখলাম মেয়েটিকে। বয়েস পনেরো-ষোলো বলেই মনে হল। শীর্ণ চেহারা, পরনে ঈষৎ ময়লা একখানা শাড়ি, ভিজে লেপটে গেছে দেহের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'নাম কী তোমার?'

কাঁদছিল মেয়েটা, আবার জিজ্ঞাসা করলাম। ময়লা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে জবাব দিল, 'রাধা।'

—'এখানে কোথায় থাক?'

চুপ করে থাকে মেয়েটা। রাগ হয়, বললাম, 'কথার জবাব দাও।'

বেশ একটু অনিচ্ছা ও সংকোচের সঙ্গেই বলে, 'এই বস্তির ভিতরে, কালিদাসী বাড়িউলির বাড়িতে।'

হুজুগপ্রিয় নিষ্কর্মা দর্শকের দল দেখলাম রাস্তার উপরে বেড়েই যাচ্ছে। গলির পশ্চিমদিকে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গায় রাধাকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছ?'

—'অনেকক্ষণ, সন্ধ্যের আগে থেকে।'

—'ঐ মাতালটার কাছে তুমি দুটাকা চেয়েছিলে?'

বুঝিবা লজ্জায় চুপ করে থাকে রাধা। দর্শকদের মধ্যে থেকে সরস বাক্যবাণ বর্ষণ শুরু হয় আমাদের উদ্দেশে। কেউ বলে, 'এ যে বাবা অতিথ এসে গেরস্থকে তাড়ায়।' কেউ বলে, 'নতুন কি আর, এ তো এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।'

মরিয়া হয়ে গেলাম, এর একটা হেস্তনেস্ত না করে আজ আর বাড়ি যাচ্ছিনে। রাধার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে রুক্ষস্বরে বললাম, 'টাকা চেয়েছিলে?'

অন্ধকারেও বুঝলাম ভয় পেয়ে গেছে রাধা, বলল, 'হ্যাঁ।'

—'কেন চেয়েছিলে?'

—'আমার মায়ের অসুখ, ওষুধ-পথ্যি কেনবার পয়সা নেই।'

—'বাড়িতে কে কে আছে?'

—'মা আর আমার ছোট ভাইবোন চার-পাঁচটি।'

—'ঝড়বৃষ্টির সময় কোথায় ছিলে?'

—'এইখানেই।'

কেমন একটা খটকা লাগল। দেহের বিনিময়ে সওদা করতে যারা আসে, অত জলে-ঝড়ে এই নোংরা গলিতে তাদের আবির্ভাব আকস্মিক দুর্ঘটনার সামিল। তবুও এই অনাবৃত গলিপথে দু'ঘন্টার উপর কীসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটা ঝড়জল তুচ্ছ করে?

—'তোমার বাবা কোথায়?'

জবাব না দিয়ে চুপচাপ থাকে মেয়েটা। আবার বলি, 'তোমার বাবা বেঁচে নেই?'

আবার কান্না শুরু হয়ে যায় রাধার, কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'বাবা আমাদের দেখে না, কারখানায় কাজ করে। কদাচিৎ বাড়ি আসে, দু'-এক টাকা দেয়। তাতে চলে না।'

অনুমানে ব্যাপারটা যেন মোটামুটি অনেকটা বুঝলাম, তবে এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না যে টাকার প্রত্যাশায় রাস্তায় দাঁড়ানো রাধার আজ নতুন নয়।

বললাম, 'চলো তোমাদের বাড়ি, মাকে দেখে আসি।'

আঁতকে উঠে তিন-পা পিছিয়ে গেল রাধা, তারপর ভয়ে ভয়ে বলে, 'আপনি দয়া করে দুটো টাকা দিন, ওষুধ কিনে নিয়ে না গেলে মা বাঁচবে না।'

বললাম, 'বেশ তো, চলো না তোমাদের বাড়ি গিয়ে তোমার মাকে দেখে টাকা দিচ্ছি।'

অন্ধকারে কান্নায় পায়ের উপর ভেঙে পড়ল মেয়েটা, 'দোহাই আপনার, সেখানে আপনি যাবেন না, নোংরা ঘরে এক মিনিটও দাঁড়াতে পারবেন না—।' কী একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'বেশ শুধু হাতে যদি টাকা না দিতে চান, তাহলে চলুন বাড়িউলির একখানা খালি ঘর আছে। ঘন্টায় চার আনা, পরিষ্কার—।'

আর শোনার প্রবৃত্তি হল না। রাগে ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ রিরি করে উঠল। সজোরে রাধার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললাম গলি বেয়ে, বললাম, 'ভাল চাও তো কোন ঘরখানা তোমাদের দেখিয়ে দাও, নইলে আমি তোমায় থানায় নিয়ে যাব। এই বয়েস থেকে যে ব্যবসা শুরু করেছ তা শুনলে তোমায় জেলে আটকে রেখে দেবে।'

আর আপত্তি করে লাভ নেই বুঝতে পেরেই বোধহয় অনিচ্ছার সঙ্গে চলতে লাগল মেয়েটা। অন্ধকারে দেড়হাত চওড়া গলি, পাশে অপরিষ্কার ড্রেন, বৃষ্টির জল পড়ে ছাপিয়ে উঠেছে রাস্তায়। দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। গলিটার মাঝামাঝি এসে ডানদিকে একটা খোলার ঘরের বন্ধ দরজা হাত দিয়ে দেখিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েটা।

ভিতরে হ্যারিকেন বা কেরোসিনের লম্ফ জ্বলছিল বোধহয়, তারই অস্পষ্ট কয়েকটা রেখা ভাঙা দরজার ফাটল দিয়ে বাইরে এসে পড়েছিল। একটু ইতস্তত করে দরজায় টোকা দিলাম।

ভেতর থেকে ভারী গলার আওয়াজ পেলাম, 'কে রে? রাধি এলি?'

ভীত করুণ কণ্ঠে রাধা জবাব দেয়, 'হ্যাঁ বাবা, আমি।'

আবার আওয়াজ আসে, 'আমার ওষুধটা এনেছিস?'

এবার কোনও জবাব দেয় না রাধা। ভিতর থেকে চিৎকার শোনা যায়, 'কথার জবাব দে হারামজাদি?'

ভয়ে এতটুকু হয়ে যায় রাধা, আস্তে বলে, 'না বাবা!'

—'না বাবা! তোকে না বলেছি দুটো টাকা না নিয়ে বাড়ি আসবিনি—যা, যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়, নইলে দরজাও খুলব না, খেতেও দেব না।'

চুপিচুপি রাধার হাতে দুটো টাকা দিয়ে যদি সরে পড়ি, ব্যাপারটার সাম্প্রতিক মীমাংসা হয়ত তখনই হয়ে যায়, হল না। বেপরোয়া ভূতে পেয়েছে তখন আমায়! বেশ একটু জোরে দরজায় ঘা দিলাম। মনে হল মাটির দেওয়াল পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল। ভিতরে একদম চুপ। একটু পরে দরজা ইঞ্চি-দুই ফাঁক হল, সেই সঙ্গে সংশয়াকুল গলায় প্রশ্ন, 'কে?'

বললাম, 'চিনবেন না—দরজা খুলুন।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভিতর থেকে একটা চাপা ফিসফাস আওয়াজ শুনতে পেলাম। হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল রাধা। জোর করে ধরে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে, একটা মিটমিটে কালিপড়া ভাঙা হ্যারিকেন-লণ্ঠন হাতে নিয়ে ছেঁড়া তালি দেওয়া একটা ময়লা লুঙ্গি পরে মোটাসোটা গোছের একটা লোক দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে আমার দিকে চেয়ে কঠিন স্বরে বলল, 'কে আপনি?'

পরক্ষণেই রাধার দিকে নজর পড়তেই গলায় মধু ঢেলে বলল, 'ওঃ রাধি, সঙ্গে করে এনেছিস বুঝি বাবুকে? বাড়িউলির ঘর খালি নেই বুঝি? তা একটু দাঁড়া—'

অকল্পিত বিস্ময়ে রাধার হাত ছেড়ে দিয়ে দু'পা পিছিয়ে পাশে ড্রেনে পড়তে পড়তে কোনও মতে সামলে নিলাম। আপনা হতেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'হারু!'

অন্ধকারে তখনও চিনতে পারেনি আমায়। হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরে মুখের দিকে চেয়েই ভয়ে বিস্ময়ে বাকরোধ হয়ে গেল হারুর।

হারু, ইন্দ্রপুরি স্টুডিওতে সেটিং মাস্টার বটু সেনের অধীনে কাজ করে, মাইনে চল্লিশ টাকা। সেট তৈরির ব্যাপারে রং দিয়ে দেওয়ালে ফ্রেসকো পেইন্টিং-এর কাজে হারু বটুবাবুর ডান হাত ছিল। সমস্ত স্টুডিওর মধ্যে ভালমানুষ বলে একটা খ্যাতিও হারুর ছিল। অল্প মাইনে, একপাল ছেলেপুলে। তার উপর একটার না একটার অসুখ

লেগেই আছে। এইসব কারণে আমরা মধ্যে মধ্যে চাঁদা তুলে দু'-পাঁচ টাকা হারুকে দিতাম। ভাবতাম সত্যই একটা সৎকাজে টাকাটা দিচ্ছি। প্রয়োজনবোধে ইচ্ছে থাকলেও হারুর আসল নামটা গোপন করে গেলাম।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'আজ কলম্বাসের চেয়েও মস্ত একটা আবিষ্কার করলাম হারু। যে কোনও নামজাদা অভিনেতা তোমার পায়ের কাছে বসে এখনও দশ বছর তালিম নিতে পারে।'

ভয়ে পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে থাকে হারু। রাধা একবার আমার দিকে, একবার ওর বাবার দিকে চেয়ে রহস্যের কিনারা করবার চেষ্টা করে, পারে না। ভিজে কাপড়ের খুঁটটা দাঁতে কামড়ে অর্থহীন ফ্যালফেলে চাউনি মেলে অন্ধকার গলিপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘরের ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেল, 'শোনো!'

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হ্যারিকেনটা দরজার কাছে রেখে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল হারু। পরমুহূর্তে রুগ্ন ক্ষীণকণ্ঠ হলেও স্পষ্ট শুনতে পেলাম, 'তুমি কী? রাস্তায় জল-কাদায় ওঁকে দাঁড় করিয়ে না রেখে ভিতরে এনে বসাও।'

সংকোচে লজ্জায় এতটুকু হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল হারু। প্রবৃত্তি ছিল না। একবার ভাবলাম যথেষ্ট হয়েছে, এদের এইসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার কী? বাড়ি চলে যাই। গেলাম না। ঘরে ঢুকে পড়লাম।

লম্বায় খুব বেশি যদি হয় আট হাত, চওড়া পাঁচ হাত। ঐ একটি মাত্র দরজা ছাড়া ঘরে আর জানলা নেই। বাঁশের বেড়ার উপর মাটি লেপে দেওয়াল, উপরটা খোলা দিয়ে ছাওয়া। মেঝেটা সিমেন্ট করা, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। ঘরের পুব দিকে ময়লা তেলকুচে একটা ছেঁড়া কাঁথায় সর্বাঙ্গ ঢেকে রক্তশূন্য পাংশু মুখ আর কোটরে ঢোকা চোখ দুটো বার করে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। অনুমানে বুঝলাম হারুর স্ত্রী। তারই কোল ঘেঁষে লোভাতুর চোখে চেয়ে আছে তিন-চারটে নগ্ন ও অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়ে। ঐ ঘরেরই পশ্চিমদিকে রান্নার ব্যবস্থা। একটা তোলা উনুন, কালিপড়া মাটির হাঁড়ি, এঁটো কলাইওঠা দু'তিনটে থালা-বাটি চারপাশে ছড়ানো। মাঝখানে একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা, তার উপর কয়েকটা শালপাতার ঠোঙা, কয়েকটা পেঁয়াজি, বেগুনি ইতস্তত ছড়ানো। এরকম একটা নোংরা ঘরে মানুষ বাস করতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। একটা পচা ভ্যাপসা গন্ধের সঙ্গে দেশী ধেনো মদের গন্ধ মিশে একটা উৎকট আবহাওয়া জমে আছে ঘরের মধ্যে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অবাক হয়ে চারদিকে চাইছি—নজরে পড়ল তোলা উনুনটার পাশে লুকিয়ে রাখা একটা খালি দেশী-মদের পাঁট ও কানাভাঙা একটা ময়লা কাচের গ্লাস। রাধাকে দিয়ে ওষুধ আনানোর ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় নাটকে নভেলে লন্ডনের নোংরা বস্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই

পড়েছিলাম, কিন্তু ভদ্রঘরের ছেলে হারু একফোঁটা মেয়ের দেহবিক্রির টাকায় মদ খায়, এটা কল্পনা করতে কষ্ট হয়। বললাম, 'উপদেশ দিয়ে, ধমকে অথবা ভাল-ভাল নীতিকথা বলে তোমাকে শোধরাতে যাওয়া আর বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো একই কথা, সেদিক দিয়ে যাব না। শুধু একটা কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি হারু, মাত্র সাতদিন সময় দিলাম তোমায়। এর মধ্যে যদি এ ধরনের ঘটনা কিছু ঘটে—আমি সোজা জাহাঙ্গীর সাহেবকে বলে তোমার চাকরি খতম করে দেব। যদি মনে কর আমি জানব কী করে, সেইজন্য বলছি—পাশের পুলিশ ফাঁড়িতে আমার একটি পরিচিত লোক আছে। তাকে বলে যাব তোমাদের ওপর নজর রাখতে।'

মুখ নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল হারু। দেখি এরই মধ্যে রাধা ওর মায়ের কোল ঘেঁষে বসে নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখি গোটা আড়াই টাকা আছে। তা থেকে দুটো টাকা নিয়ে হারুর হাতে দিয়ে বললাম, 'আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এ নিয়ে খাবার কিনে এনে তোমার ছেলেমেয়েদের আর স্ত্রীকে খেতে দাও।'

টাকা নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হারু।

মহান পরোপকার ব্রত উদযাপন করে বেশ খানিকটা আত্মপ্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরতে সেদিন রাত দশটা বেজে গেল। ভেবেছিলাম সবাই শুয়ে পড়বে, চুপিচুপি গিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে আমার জন্য রাখা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ব। এসে দেখি মায়ের ঘরে আলো জ্বলছে, সাড়া পেতে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ছোট বোনটা। বাবার মৃত্যুর পর আমার পারিবারিক জীবনে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, মাসতিনেক আগে ছোট বোনটির বিধবা হওয়া। জামাকাপড় খুলতে যাচ্ছি, কাছে এসে চুপিচুপি বোনটি বলল, 'ছোড়দা, মায়ের টাইফয়েড।'

আঁতকে উঠলাম। তখনকার দিনে টাইফয়েড-নিউমোনিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি। কোনও ওষুধ নেই, শুধু শুশ্রূষা ও পথ্যের দিকে নজর দিয়ে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকা ছাড়া। কয়েকটা বছর, কিন্তু মনে হয় এই সেদিন, এইরকম একটা গোলমেলে জ্বরে বাবাকে হারিয়েছি। আজ মা-ও যদি বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন! আর ভাবতে পারছিলাম না। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। ঝুপ করে বিছানার এক- পাশে বসে পড়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলাম।

বোনটা বলেই চলল, 'ক'দিন ধরে অল্প অল্প জ্বর হয়, মা গ্রাহ্য করেন না, তার উপরই নাওয়াখাওয়া সব করেন। কাল থেকে জ্বরটা খুব বেড়েছে, উঠতে পারেননি। আজ পাশের বাড়িতে ডাক্তার নৃপেন সেন এসেছিলেন, শুনলাম ওঁর বাড়ি আমাদের দেশের কাছে। সাহস করে পাশের বাড়ির জ্যাঠাইমাকে দিয়ে বলাতেই উনি এসে অনেকক্ষণ ধরে মাকে দেখে বলে গেলেন—জ্বর টাইফয়েডে দাঁড়িয়েছে। খুব সাবধানে শুশ্রূষা করতে হবে আর পথ্যের দিকে নজর রাখতে হবে। রোগী দেখে বাইরে এসে আর

একটা কথা বিশেষ করে আমাকে বলে গেছেন। যেন কোনও কারণে মা উত্তেজিত না হন। হার্ট খুব দুর্বল। একটু উত্তেজনাতেই হার্টফেল হতে পারে।'

জবাব দেবার কিছুই নেই, শুনে গেলাম। কথা শেষ করে আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে বোনটা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি আর কিছু নেই, চুপ করে বসে আছি। ঘরের পশ্চিম দিকের দেওয়াল ঘেঁষে ছোট একখানা তক্তপোশে ছোট ভাই রাজকুমার ঘুমোচ্ছিল। পাশ ফিরতে গিয়ে চোখে আলো পড়তেই ঘুম ভেঙে উঠে বসল। তারপর কোনও কথা না বলে বালিশের নিচে থেকে একখানা খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'রঙমহল থিয়েটারের একটা পিওনগোছের লোক দিয়ে গেছে, আমি সই করে নিয়েছি।'

আঘাত খেয়ে-খেয়ে মানুষ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছয় যেখানে আর কোনও অনুভূতিই সাড়া জাগাতে পারে না। আমার অবস্থাও তাই। চিঠিটা পড়লাম। কর্তৃপক্ষের মূল বক্তব্য হল, সম্প্রতি আমেরিকা বিজয় করে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার কলকাতায় ফিরে এসে সদলবলে রঙমহলে স্থায়ীভাবে যোগদান করেছেন। সামনের মাসেই যোগেশ চৌধুরীর নাটক 'বিষ্ণুপ্রিয়া'য় তিনি দীর্ঘদিন বাদে নাট্যপিপাসু দর্শকদের অভিবাদন জানাবেন। সুতরাং বাড়তি, অকেজো, পরগাছা শিল্পীদের একমাসের সময় দিয়ে চাকরি যাওয়ার নোটিশ। বলা বাহুল্য ঐ সব অবাঞ্ছিত শিল্পীদের মধ্যে আমি ব্যতিক্রম নই, অন্যতম।

'যমুনা পুলিনে' শুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। সেদিন সকাল থেকে গাছপালায় ঘেরা আয়ান ঘোষের বাড়ির পাশের রাস্তায় আমার গান টেক হচ্ছিল। বর্তমানে প্লে-ব্যাকের দৌলতে গান টেক করা জলের মতো সোজা। অপরের গাওয়া গান অ্যামপ্লিফায়ারে বাজিয়ে তার সঙ্গে বারকতক রিহার্সাল দিয়ে সুর-তাল-লয়ে ঠোঁট নেড়ে যাও—ব্যস্, তুমি গাইয়ে হয়ে গেলে। কিন্তু তখন সবে টকির শুরু, প্লে-ব্যাকের নাম শোনা দূরে থাক, কল্পনাও কেউ করতে পারত না। কাজেই সে এক দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার। গানটাকে চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে, গাইতে শুরু করে সমের মুখে ছেড়ে দিলাম। বাজতে লাগল শুধু নেপথ্য সংগীত। ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হল। ছোট ট্র্যাকের ওপর ক্যামেরা, গাইতে গাইতে আমি এগিয়ে চলি—ক্যামেরা চলে পিছিয়ে—মুখের সামনে মাইক্রোফোন, স্ট্যান্ডে ঝোলানো—সেটাও প্যান করে চলে সঙ্গে-সঙ্গে। আমার চলার সঙ্গে ক্যামেরা ও মাইক সমতা ও দূরত্ব ঠিক রেখে চলবে। এর একটু ব্যতিক্রম হলেই কাট, মানে আবার গোড়া থেকে শুরু। গানের সঙ্গে যেসব যন্ত্রপাতি বাজবে তারা আর একটি মাইক্রোফোনের সামনে ক্যামেরার চোখের আড়ালে বসে আছে। চার-পাঁচটা শটে এইভাবে গান শেষ করতে সারা দিনটাই কেটে গেল, বেলা চারটের পর রোদের জোর কমে আসে—শুটিং বাধ্য হয়েই বন্ধ করতে হয়। বলতে ভুলে গেছি, বাংলা 'যমুনা

পুলিনে'র একটা শট নেবার পরই ঠিক ঐ একই পদ্ধতিতে হিন্দী 'রাধাকৃষ্ণ' নেওয়া হতে লাগল। ফলে বাংলা-হিন্দী দু'টো গানই নেওয়া হয়ে গেল।

দু' সপ্তাহ কেটে গেল, মায়ের জ্বর ছাড়ল না। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ডাক্তার সেন দু'-এক দিন অন্তরই এসে দেখে যান। শুধু বলেন, শুশ্রূষা ও পথ্যের দিকে ভাল করে নজর রাখুন। হার্ট খুব দুর্বল—কোনও কারণে ওঁকে উত্তেজিত হতে দেবেন না।

তাই হল। সারাদিন ছোটবোনটা মাকে আগলে বসে থাকে। সন্ধ্যের পর শুটিং থেকে এসে ওকে খানিকটা বিশ্রাম দিই। এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটল। রোগে ভুগে-ভুগে মায়ের মেজাজ হয়ে উঠল রুক্ষ, খিটখিটে। পান থেকে চুন খসলেই চেঁচিয়ে অনর্থ বাধিয়ে দেন। অনেক করে বুঝিয়ে মিষ্টি কথায় শান্ত করি।

সেদিন নিয়মিত শুটিং-এ গিয়ে শুনি, সাউন্ড মেশিনের কী একটা কল বিগড়ে গেছে। আজ শুটিং বন্ধ। সকাল সকাল বাড়ি চলে এলাম। অনেকদিন সিনেমা দেখিনি, ভাবলাম আজ ম্যাটিনি শো'তে যা হোক একটা ছবি দেখে আসব। ফরসা কাপড় পরে বেরুতে যাচ্ছি, মায়ের ঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'ওকে আজ বেরুতে মানা করে দে খুকি (আমার ছোটবোনকে মা খুকি বলেই ডাকতেন)।' থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটু পরেই ঘর থেকে বোনটা বেরিয়ে এসে অপেক্ষাকৃত একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আজ তুমি বেরিও না ছোড়দা!'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন রে?'

একটু ইতস্তত করে বোন বলল, 'গোপালপুর থেকে আজ তোমায় পাকা-দেখা দেখতে আসবে।' মেঘশূন্য আকাশ থেকে হঠাৎ বাজ পড়ে। ধারে-কাছে যারা থাকে আঁতকে কেঁপে ওঠে, কারও-কারও কানে তালা লেগে যায়। কিন্তু যে হতভাগ্যের মাথায় পড়ে তার অবস্থা কী হয় সম্যক জানা না থাকলেও, আজ ছোটবোনের ছোট্ট একটা কথায় খানিকটা উপলব্ধি করলাম। বাকশক্তিহীন হয়ে দরজার কপাট ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বোনটা গড়গড় করে একগাদা কথা বলে যেতে লাগল। কতক শুনলাম না, শুধু মোটামুটি বুঝলাম—আমি শুটিং-এ বেরিয়ে গেলে মায়ের বন্ধু, পাড়ার কয়েকটি বিধবা পরোপকারী মহিলা এসে অনতিবিলম্বে আমার বিবাহ দেওয়ার জন্য মাকে ক্রমাগত তাগিদ দিতে থাকেন। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার দুর্নীতি ও ম্লেচ্ছাচারের আবর্তে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এটাও অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে কসুর করতেন না। ফলে মা দিশেহারা হয়ে আমার এক দূরসম্পর্কের কাকাকে ডেকে আনিয়ে তাঁরই সাহায্যে বিয়ের সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। আজ গোপালপুর থেকে চিঠি এসেছে, বিকেল চারটের সময় পাকা দেখতে আসবে।

বিয়ে! বিয়ে জিনিসটাকে কোনদিনই সাধারণ ডাল-ভাতের মতো সহজ ভাবতে পারিনি। ছেলেবেলা থেকেই বিয়ে জিনিসটাকে ভাবতাম কল্পনার সুখস্বপ্ন, বিলাস।

থাকবে না সাংসারিক অভাব-অনটন-অশান্তি। শান্তির সংসারে বাইরে থেকে বধূরূপে বরণ করে আনব একজনকে। লক্ষ্মীর মতো হাসিমুখে, সে এসে বসবে আমার মনোরাজ্যে সোনার সিংহাসনে, আমার উপচে-পড়া সুখ ও শান্তির বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখব তাকে চির-অচলা করে। নইলে স্বার্থপরের মতো শুধু দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে ইচ্ছে করে একটি নিরীহ মেয়েকে অভাব-অনটনের অংশীদার করে নিয়ে আসা—

আর ভাববার সময় পেলাম না, মায়ের চিৎকার শোনা গেল, 'ও কি বেরিয়ে গেল খুকি? আমি জানি, ও আমার কথা রাখবে না।'

করুণ আবেদন-ভরা চোখে বোনটা আমার মুখের দিকে চাইল। আর ভাবনার সময় নেই, কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। ছুটে মায়ের ঘরে ঢুকে দেখি, উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসেছেন মা। সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতে দিতে বললাম, 'কোন দিন তোমার অবাধ্য হয়েছি মা? তুমি যা ঠিক করেছ, তাই হবে। তোমার কথার ওপর কথা বলার স্পর্ধা ও সাহস কোনও দিন যেন আমার না হয়, শুধু এই আশীর্বাদ করো।'

কোনো কথা না বলে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন মা। চোখের কোণ দিয়ে শুধু দু' ফোঁটা জল আশীর্বাদের মতো গড়িয়ে পড়ল। রুমাল দিয়ে মুছে হাওয়া করতে লাগলাম।

যথাসময়ে আশীর্বাদ হয়ে গেল। বিয়ের দিন স্থির হল মাসদেড়েক পরে। পুরোদমে শুটিং চলছে 'যমুনা পুলিনে'র। কিছুদিন হিন্দী-বাংলা একসঙ্গে তোলা হয়ে হিন্দীটা বন্ধ রাখা হল। শুনলাম এক মাসের মধ্যেই 'যমুনা পুলিনে' রিলিজ—পরে হিন্দীর বাকি অংশটা তোলা হবে। সকাল দশটায় স্টুডিও যাই, বাড়ি ফিরি রাত দশটা-এগারটায়। মধ্যে একদিন সেট তৈরীর জন্য শুটিং বন্ধ রাখা হল। স্টুডিও কম্পাউন্ড জুড়ে বাইরে বিরাট সেট। শুনলাম ওটা রাজহংসের 'একদিন কা বাদশা'র রাজসভার সেট। দুপুরে স্টুডিওয় গিয়ে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার। লোকে লোকারণ্য। একপাল এক্সট্রা, সবাই রঙিন পায়জামা, জরির জ্যাকেট , মাথায় পাগড়ি বা টুপি পরে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। মুসলমানী গল্প, কাজেই দাড়ি বা নূর থাকবেই। সকাল ছটা থেকে মেক-আপ শুরু হয়ে শেষ হতে দুটো বেজে গেল। সেখ ইদু চুলের কাজ ভাল করে বলে ওকে মাস-মাইনেতে রাখা হয়েছে, তাছাড়া আব্দুল বারির চুলের দোকান থেকে তিন-চারজন এসেছে দাঁড়ি-গোঁফ-পরচুলো ফিট করতে। ক্যামেরাম্যান যতীন দাস অত বড় সেটটায় রিফ্লেক্টার ফিট করতে হিমসিম খেয়ে তিরিক্ষি মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'-তিনজন সহকারী ভয়ে কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না । বিবর্ণ মুখে একপাশে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি জটলা করছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, রাজ কাপুর ইউনিটের বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান রাধু কর্মকার ইস্ট ইন্ডিয়ান যতীন দাসের সহকারী রূপে বহুদিন কাজ করেছেন।

পরিচালক রাজহংস আজ আর আমাদের চিনতে পারছেন না, পারবার কথাও নয়।

দামী সিল্কের স্যুট পরে একবার মেক-আপ রুম, একবার সেট, একবার সাউন্ড ট্র্যাক—নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই, আজ যেন ওরই রাজ্যাভিষেক।

কৌতূহলী দর্শকের ভূমিকা নিয়ে একপাশে দাঁড়ালাম। শুটিং আরম্ভ হল বেলা তিনটেয়। বিচারের দৃশ্য নেওয়া হল। আবু হোসেন বাদশার অদ্ভুত বিচার। খুনে আসামীকে দিচ্ছে বেকসুর খালাস, আবার সামান্য চুরির অপরাধে দিচ্ছে প্রাণদণ্ড। দু' তিনটে শট নিতে-নিতেই রোদের আলো ফুরিয়ে গেল। বন্ধ-ঘরের দরজা খুলে আনা হল অসংখ্য ইলেকট্রিক আলো। শুনলাম, ঐ আলো ফিট করে শুটিং শুরু হতে রাত আটটা বাজবে। অতক্ষণ অপেক্ষা করে শুটিং দেখার ধৈর্য বা কৌতূহল ছিল না। আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। প্রায় পোয়াটাক পথ চলে এসেছি, হঠাৎ মোটরের দুটো পাওয়ারফুল হেডলাইট মুখে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিল। সভয়ে সরে গিয়ে একটা গাছের ঝোপের ভিতর দাঁড়ালাম। সামনে এসে গাড়ি থেমে গেল। ভিতর থেকে মুখ বাড়ালেন মালিক মতিলাল চামরিয়া । নমস্কার করতেই প্রশ্ন, 'কাঁহা যাতা হ্যায় ধীরাজ?'

বললাম, 'বাড়ি।'

—'কেঁও, শুটিং হুয়া নেহি?'

—'না, রাজহংসের 'কিং ফর এ ডে'র শুটিং হচ্ছে। তাছাড়া সেট তৈরি হয়নি বলে 'যমুনা পুলিনে' শুটিং বন্ধ।'

—'উঠো গাড়িমে।'

বেশ একটু অবাক হয়ে দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি থামল এসে দরবার সিনের কাছে। একখানা চেয়ারে অবসন্নভাবে বসে যতীন টোস্ট আর ডিম-সিদ্ধ খাচ্ছিল। গাড়ি থেকে নেমেই মতিলালবাবু যতীনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ ধীরাজ কা কুছ্ কাম হুয়া যতীন?'

জবাব না দিয়ে খেতে লাগল যতীন। সুর একটু নরম করে মতিবাবু বললেন, 'আরে, একঠো ক্লোজ-আপ তো লে লেও।'

খিঁচিয়ে উঠল যতীন, 'দেখুন, যা বোঝেন না, সে সম্বন্ধে কথা কইতে আসবেন না। ধীরাজের ক্লোজ-আপ নিতে গেলে রাজহংসের এইসব পাগলামি বন্ধ করে দিতে হয়। কোনটা করব বলুন?'

জুয়োখেলায় সর্বস্ব হেরে গেলে মানুষের মুখচোখের অবস্থা যা হয়, ঠিক সেই রকম চোখে প্রায় মিনিটখানেক আমার দিকে চেয়ে থেকে মতিবাবু বললেন, 'তব তুম ঘর চলা যাও ধীরাজ।'

বাড়ি এসে শুনলাম, মায়ের জ্বর ছেড়ে গেছে, যাকে রেমিশন বলা হয় তাই। ডাক্তারবাবু বলেছেন, 'দু'একদিন বাদেই অন্ন-পথ্য দেবেন।' বুকের ওপর থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল।

পরদিন স্টুডিও গিয়ে শুনলাম, আগের দিন রাত বারোটা পর্যন্ত শুটিং করেও সব সিন শেষ করতে পারা যায়নি। আজও 'যমুনা পুলিনে' বন্ধ, হবে রাজহংসের 'এক দিনকা বাদশা।' মেক-আপ রুমে ঢুকে হেড মেক-আপ ম্যান হরিবাবুর সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে বসলাম। হরি বলল, 'কাল সকাল-সকাল না পালিয়ে একটু থেকে গেলে অনেক হাসির খোরাক পেতে ভটচায।'

বললাম, 'কী রকম?'

হরি, 'রাজহংস বলে একভাবে শট নিতে, যতীন বলে অন্য রকম, শেষপর্যন্ত একটা আপস রফা করে শুটিং আরম্ভ হল। প্রায় দু'শো মব—সামনে দরবারে বসে আছেন পাত্র-মিত্র-সভাসদ নিয়ে বাদশা। বাদশার অদ্ভুত বিচারে বিদ্রোহী হয়ে গোলমাল করতে করতে এগিয়ে যাবে ঐ দু'শো এক্সট্রা। বড় একটা উঁচু জায়গার ওপর ক্যামেরা ফিট করে যতীন ছবি তুলতে শুরু করল। বাদশার বিচার শেষ হয়ে গেল, জনতা কিন্তু এগোলোনা। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সামনে থেকে হাত-মুখ নেড়ে অনেক রকমে ওদের এগিয়ে যেতে বললে রাজহংস—কিন্তু সব বৃথা। শেষকালে অধৈর্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজহংস ঐ জনতার মাঝে। তারপর কিল-চড়-ঘুঁষি মেরে ঠেলে দিতে লাগল দরবারের দিকে, অনেক কষ্টে শটটা শেষ হল। ঘর্মাক্ত কলেবরে রাজহংস এসে জিজ্ঞাসা করল, 'শটটা কেমন হল যতীন?' একমুখ বিরক্তি নিয়ে ক্যামেরার পাশে একটা ছোট্ট টুলে বসেছিল যতীন, বলল, 'শটে যা যা করবে, আগে থেকে আমায় একটু বলে রেখ রাজহংস, নইলে ভারি অসুবিধায় পড়তে হয়।'

বিস্মিত হয়ে রাজহংস বলল, 'কেন, মনিটারে যা হয়েছে তাইতো টেক করলাম।'

যতীন বলল, 'মোটেই না, তুমি যে জনতার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে কিল ঘুঁষি মারতে-মারতে ওদের সামনে ঠেলে দেবে, এটা মনিটারে করোনি।'

বোয়াল মাছের মতো হাঁ করে বলল রাজহংস, 'ওটাও ক্যামেরায় উঠেছে নাকি?'

যতীন বললে, 'নিশ্চয়! উঁচু তড়পার ওপর মুখ নিচু করে আছে ক্যামেরা, যা কিছু হবে সবই উঠবে।'

হতাশভাবে রাজহংস বলল, 'তখনই সিনটা কাট করে দিলে না কেন?'

যতীন, 'মাইরি আর কী। তুমি পরিচালক—তুমি কাট না বললে আমি ক্যামেরা থামাই কী করে? শেষে তুমি এসে বলবে—ওটা আমার একটা নতুন স্টান্ট। এমনিতেই তো দেখছি মিনিটে মিনিটে তোমার মাথায় নতুন প্যাঁচ গজিয়ে উঠছে। আর তাছাড়া ক্যামেরা সম্বন্ধে এটুকু জ্ঞান তোমার নেই, অথচ এত বড় একটা ছবি পরিচালনা করছ এটা আমি ভাবি কী করে?'

রাজহংসের বিয়োগান্ত কাহিনী শেষ করে খানিক হেসে নিয়ে হরি বলল, 'সকাল থেকে দাড়ি গোঁফ আর নূর তৈরী করে ইদু'র আর আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। আজ যদি জনতার সিন শেষ না হয়, তাহলে চুলের অভাবে শুটিং বন্ধ হবে। আব্দুল বারির

দোকানে দেশি-বিলাতী ক্রেপ সব সাবাড়।'

কাজ বেশি ছিল না, সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যেই প্যাক-আপ হয়ে গেল। মেক-আপ ড্রেসিং রুমে তিলধারণের স্থান নেই। গিসগিস করছে এক্সট্রার দল। কেউ পোশাক ছাড়ছে, কেউ মেক-আপ তুলছে। হঠাৎ হরির চিৎকার শুনলাম, 'মোল্লা, যাকে পাকা দাড়ি-গোঁফ দিয়ে মোল্লা সাজিয়েছি সে কোথায়?'

কে একজন বলল, 'পোশাক ছেড়ে সে তো অনেকক্ষণ বাড়ি চলে গেছে।'

হরি, 'দাড়ি? দাড়ি কোথায় রেখে গেছে? খেমকাবাবুর হুকুম দাড়ি-গোঁফ খুলে রেখে যেতে। বিলাতি ক্রেপের দাম অনেক, ঐ দাড়ি গোঁফ দিয়ে অন্য মেক-আপ হবে।'

বললাম, 'হঠাৎ এ রকম হুকুমের মানে?'

হরি, 'কাল রাতে অর্ধেকের বেশি লোক দাড়ি নিয়েই বাড়ি চলে গেছে।'

এক একজন এক্সট্রা ঘরে ঢোকে, হরি আর তার দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ থেকে দাড়ি-গোঁফ ছিঁড়ে নিয়ে পাশের টেবিলে স্তূপাকার করে রাখে। হাসব না কাঁদব বুঝতে না পেরে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

সাউন্ড ফ্লোরের সামনে চওড়া লাল সুরকির পথ, দু'পাশে ফুলের বাগান। কিছুটা এগিয়ে দেখি মেক-আপ ম্যান সেখ ইদু ম্লানমুখে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী ইদু, দাঁড়িয়ে যে?'

ইদু বলল, 'রোজার মাস এটা, সারাদিন উপোস, আজ সকাল-সকাল শুটিং শেষ হয়ে গেছে যখন, বাবুকে বলে বাড়ি যাব।'

বললাম, 'খেমকাবাবু এদিকে আসছেন নাকি?'

হাত দিয়ে গাড়িবারান্দার নিচেটা দেখিয়ে ইদু বলল, 'ঐ যে, ওখানে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছেন।'

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইচ্ছেটা, খেমকাবাবুকে বলে আমিও বাড়ি চলে যাব। নইলে হয়তো আবার কালকের ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি হবে—মতিবাবুর সঙ্গে দেখা হলে। একটু পরেই জোরে পা চালিয়ে খেমকাবাবু দেখি মেক-আপ রুমের দিকে চলেছেন। কাছে আসতেই নমস্কার করে বললাম, 'বাড়ি যাচ্ছি।' কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেলেন খেমকাবাবু। ইদুর কাছে যেতেই দেখলাম, ইদু নমস্কার করে কী বলতেই বেশ একটু রেগেই কী একটা বলে এগিয়ে চললেন খেমকাবাবু। পরক্ষণেই দেখি লুঙ্গি পরে একরকম ছুটতে ছুটতেই চলেছে ইদু খেমকাবাবুর পিছনে পিছনে। কেমন কৌতূহল হল, এগিয়ে গেলাম। একটু দূরে থেকে শুনলাম খেমকাবাবু শুধু বলে চলেছেন, 'কোনও কথা শুনতে চাইনে—ওগুলো খুলে রেখে যেও।' আর বেচারী ইদু দুহাতে দাড়ি ধরে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলতে বলতে ছুটেছে, 'এটা আমার নিজের স্যার।' এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। আর এগোতে পারলাম না, হাসতে হাসতে পথের উপর বসে পড়লাম।

'যমুনা পুলিনে' রিলিজ ডেট আর আমার বিয়ের তারিখ, সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল। দুটোর জন্যেই বেশ নারভাস হয়ে পড়লাম। এই সময় ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স থেকে বাবুলাল চৌখানি ডেকে পাঠালেন ওঁদের প্রথম সবাক ছবি 'চাঁদ-সদাগরে' লখিন্দরের ভূমিকা করবার জন্য। পরিচালনা করবেন নির্বাক যুগের জাঁদরেল পরিচালক প্রফুল্ল রায়। লোভও হচ্ছিল, অথচ ইস্ট ইন্ডিয়ার কনট্রাক্ট তখনও শেষ হয়নি। কী করি, মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। অনেক ভেবে একদিন খেমকাবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। সব শুনে খেমকাবাবু বললেন, 'যমুনা পুলিনে' শেষ হয়ে গেছে—হিন্দী 'রাধাকৃষ্ণ' আরম্ভ হতে দেরি আছে, এ অবস্থায় চুপচাপ বসে না থেকে তুমি যদি ওঁদের ছবিতে কাজ কর, আমার আপত্তি নেই। আমার 'রাধাকৃষ্ণ' ছবি আরম্ভ হলে তুমি এসে কাজ করবে, ওটা ওদের জানিয়ে তবে কনট্রাক্ট সই করবে।'

পরদিন ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে গিয়ে বাবুলাল চৌখানির সঙ্গে দেখা করলাম, প্রফুল্ল রায় পাশেই চেয়ারে বসেছিলেন। বিরাট লম্বা-চওড়া চেহারা, কথা কইতে ভয় হয়। নির্বাক যুগের হিমাংশু রায়ের ইউনিটে বিলেত-জার্মানি নানা দেশ ঘুরে ইন্টারন্যাশনাল খ্যাতি অর্জন করেছেন। ওঁর ছবিতে কাজ করব—কী ভাগ্য আমার। আলাপ হতেই নমস্কার করলাম। আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বাবুলালজীকে বললেন, 'একে ডেকেছেন কেন? কী পার্ট করবে আমার ছবিতে?'

একগাল হেসে বাবুলাল বললেন, 'কেনো—আমার নায়ক লখিন্দর? ইস্ট ইন্ডিয়ার 'যমুনা পুলিনে'তে কেষ্ট করেছে ধীরাজ!'

তাচ্ছিল্যভরে হোহো করে হেসে উঠলেন প্রফুল্লবাবু; তারপর বললেন, 'তা লখিন্দর চলবে, ওটাও তো একরকম কেষ্টামার্কা পার্ট। আজকাল কী হয়েছে জানেন বাবুলালজী, রাঙা মূলোর মতো মেয়েলি চেহারা নিয়ে এই সব ছেলেগুলো সিনেমায় নায়ক হবার স্বপ্ন দেখে। ওরে বাপু, হিরো হওয়া অত সহজ নয়। পুরো ছফুট সাড়ে ছফুট লম্বা হওয়া চাই, ইয়া জোয়ানের মতো বুকের ছাতি।'

বলতে বলতে বিশাল বুকখানা ফুলিয়ে প্রায় ডবল করে উঠে দাঁড়ালেন প্রফুল্লবাবু। সভয়ে এক পা পিছিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। প্রফুল্লবাবু বললেন, 'এদেশে সেরকম চেহারা নজরেই পড়ে না। দু'একটা যা আছে, তা দিয়ে কোনো রকমে কাজ চালিয়ে নিতে হয়। এ রকম করে কি ছবি হয়?'

মনে মনে ভাবলাম, প্রফুল্লবাবুকে ভগবান জার্মানি অথবা রাশিয়ার জন্যে তৈরি করে অন্যমনস্ক হয়ে ভারতে পাঠিয়েছেন। কনট্র্যাক্ট সই করে এলাম, কিন্তু যতখানি উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিলাম, ঠিক ততখানি নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে এলাম।

কয়েকদিন বাদেই বিয়ের দিন। স্টুডিও থেকে ছুটি নিয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে রওনা হলাম। দিনক্ষণ কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে সেই দিনই 'যমুনা পুলিনে' রূপবাণীতে রিলিজ। সামনে দিয়েই যাবার রাস্তা। ভীষণ ভিড়—গাড়ি থামাতে হল। আমায় চিনতে

পেরে গাড়ির চারপাশে ছেলের দল ভিড় জমিয়ে বলতে শুরু করল, 'ছকি, হামার কুনো দুঃখ নাই।'

হেসে মনে মনে ভাবলাম, এতদিনে মুখুজ্যের কপালের ঘাম বুকে ফেলা সার্থক।

ছ'মাস পরের কথা। 'চাঁদ সদাগর' ও হিন্দী 'রাধাকৃষ্ণ' ইতিমধ্যে শেষ করে দিয়েছি। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। জ্যোতিষবাবু ইন্দ্রপুরী ছেড়ে রাধা ফিল্মস্-এ যোগদান করেছেন। একদিন দেখা হতেই বললেন, 'কাল একবার স্টুডিওতে দেখা কোরো, কথা আছে।' করলাম। জ্যোতিষবাবু বললেন, 'বিরাট ছবি ধরেছি ধীরাজ, 'দক্ষযজ্ঞ'। এতে নায়ক শিবের ভূমিকা তোমায় দেব ভাবছি।' বললাম, 'কেষ্টবিষ্টু তো আমার একচেটে। ভোলানাথকেই বা ভুলে থাকব কেন?'

রাধাকিষণ ও মতিলাল চামারিয়ার মাস্টারমশাই হরিপদ ব্যানার্জী স্টুডিওর সর্বময় কর্তা। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ও টার্মস্ ঠিক হয়ে গেল। দক্ষযজ্ঞ ছবিতে চারশো টাকার বিনিময়ে হিমালয়ের গুহা ছেড়ে আমি মর্ত্যে অগণিত নরনারীকে দর্শন দিয়ে তাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দেব এই মর্মে চুক্তিপত্রে সই করে এলাম। বাড়ি এসে কনট্র্যাক্টের কপিটা ভাল করে পড়ে দেখি 'দক্ষযজ্ঞ' ছবির নিচে খুব ছোট্ট হরফে লেখা আর একটা ছবির নাম 'রাজনটী বসন্তসেনা', পরিচালনা করবেন চারু রায়। ছুটে গেলাম স্টুডিওয়। হরিপদবাবু কদাচিৎ হাসেন, আমার কথা শুনে একগাল হেসে বললেন, 'তোমার ভালর জন্যই করেছি ধীরাজ। এখন যত বেশি ছবিতে কাজ করতে পারবে, ততই তোমার পক্ষে ভাল। দুখানা ছবিই প্রায় একসঙ্গে তোলা হবে, কাজেই সেদিক দিয়েও তোমার লাভ।'

লাভবান হয়ে চুপচাপ বাড়ি ফিরে এলাম। দক্ষযজ্ঞের ভূমিকালিপিও বেশ লোভনীয়। দক্ষ —অহীন্দ্র চৌধুরী; শিব—আমি; নারদ—মৃণাল ঘোষ এবং সতীর ভূমিকায় নামবেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী। এখানে উল্লেখযোগ্য, দক্ষযজ্ঞই চন্দ্রাবতীর প্রথম সবাক ছবি। এর আগে দু'-একখানা নির্বাক ছবিতে চিত্রাবতরণ করেন, সেগুলো উল্লেখযোগ্য নয়। চন্দ্রাবতীর রিহার্সাল দরকার, রোজ দুপুরে রাধা ফিল্মস্-এ রিহার্সাল দিয়ে যাই। একদিন জ্যোতিষবাবু বললেন, 'ধীরাজ, নাচতে জান?'

অবাক হয়ে বললাম, 'না, নাচিনি কখনও। কেন বলুন তো?'

চিন্তিতভাবে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'পতিনিন্দা শুনে দক্ষের যজ্ঞসভায় সতীর দেহত্যাগের পর সবাই বলছেন তোমার একখানা তাণ্ডব নাচ দিতে। যেখানে ভূত-প্রেত নিয়ে যজ্ঞসভা লণ্ডভণ্ড করছ তুমি।'

মহা ভাবনায় পড়ে গেলাম। নাচের মাস্টার তারক বাগচী জ্যোতিষবাবুর টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, 'কোনও ভাবনা নেই বাঁড়ুজ্যেমশাই, নাচ আমি শিখিয়ে দেব। তবে আমাকে মাস-দুই রিহার্সাল দেবার সময় দিতে হবে।'

তাই হল। রোজ গিয়ে ডায়লগের রিহার্সাল দিয়ে মিউজিক রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাণ্ডব নাচ শিখতে শুরু করি। দু'দিন নেচেই সর্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে গেল। আর একটা বিপদ হল এই যে, নাচের পর প্রচণ্ড খিদে পায়। ভয়ে-ভয়ে জ্যোতিষবাবুকে বললাম, 'দেখুন কিছু খাবারের ব্যবস্থা না করলে আর দু'চারদিন বাদে আমি নেচেই মারা যাব।' ফল, সন্দেশ, দই-এর ব্যবস্থা হল।

মহা-আড়ম্বরে শুটিং শুরু হয়ে গেল। অনেকরকম ক্যামেরার কসরত আছে বলে পুণার বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান জি. টি গুণেকে নিয়ে আসা হয়েছে দক্ষযজ্ঞ ছবির জন্যে। সেট-সেটিং সাজপোশাক কোনও দিক দিয়েই খামতি নেই। খানিকটা সান্ত্বনা পেলাম।

দক্ষের অন্তঃপুরের সেট শেষ হবার পরই হিমালয়ের গুহার সেট পড়ল। সকাল থেকে সর্বাঙ্গে চুনকাম করার মতো মেক-আপ করে দুটো বড় বড় ড্যাবডেবে চোখের ওপর কপালে আর একটা চোখ এঁকে, এক টুকরো বাঘছালে সিকি অঙ্গ কোনও মতে আচ্ছাদন করে সেটে এলাম। চন্দ্রাবতীর মেক-আপ তখনও শেষ হয়নি। অসংখ্য লোক সেটে। শুটিং দেখতে এসেছে। সেটের এক পাশে দেখি সাপখেলার ঝাঁপি নিয়ে এক সাপুড়ে বসে আছে। ব্যাপার কী? একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে জবাব পাই না। জ্যোতিষবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম। সেটের মধ্যে নিরিবিলি একটা জায়গায় আমায় নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সবাই বলছে শিবের গলায় গোখরো সাপ ঝোলানো না থাকলে শিবই নয়, তাই —'

বাধা দিয়ে বললাম, 'বলেন কী মশাই, জ্যান্ত গোখরো সাপ গলায় দিয়ে অভিনয় করতে হবে?'

ভরসা দিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'আহা তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, সাপুড়ে সাপের বিষ-দাঁত ভেঙে দেবে।'

কিছুমাত্র ভরসা না পেয়ে বললাম, 'ভেঙে দিলেও অনেক সময় খানিকটা বিষ থেকে যায়, যদি—'

হরিপদবাবু এসে পড়লেন। বললেন, 'তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন বাপু, জ্যান্ত সাপ গলায় নিয়ে শিবের পার্ট করলে নামটা কী রকম হবে, সেটাও একবার ভেবে দ্যাখো।'

জ্যোতিষবাবু সায় দিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া তোমার যদি কিছু হয় ব্যাটা সাপুড়েকে আস্ত রাখব ভেবেছ?'

দশচক্রে ভগবান ভূতের মতন। আর কোনো যুক্তি বা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেলাম না। বেশ খানিকটা নিরুৎসাহ হয়ে বেদীর উপর বসে পড়লাম। বেদীর উপর বাঘছাল পাতা, পাশে ত্রিশূল। আলো-অন্ধকারের একটা ভয়াবহ নির্জনতা যেন চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে গুহাটাকে। প্রথমে কয়েকটি শট নেওয়া হল ধ্যানমগ্ন মহাদেবের। শটের ঠিক আগে ঝাঁপি খুলে গলায় ঝুলিয়ে দ্যায় গোখরো সাপ। সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। চোখ বুঁজে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকি। ইলেক্‌ট্রিক আলো

পড়লে সাপ মাথা গুঁজে বুকের উপর লেপটে থাকে ভয়ে। লকলকে জিভটা দিয়ে গলা বুক চাটতে থাকে। কোনরকমে আমার একার শটগুলো শেষ হল। মেক-আপ শেষ করে এলোচুল পিঠের ওপর ফেলে, চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি পরে, গলায়-হাতে ফুলের গহনা পরে চন্দ্রাবতী সেটে এলেন। গুহার অন্ধকার কেটে গেল।

দু'তিনবার মনিটার হল। সিনটা হল— ফুলের সাজি হাতে হাসিমুখে সতী এসে ধ্যানমগ্ন শিবের বেদীর নিচে হাঁটু গেড়ে বসে সাজি থেকে দু'হাত ভরে ফুল নিয়ে শিবের উদ্দেশে প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'নাথ! ধুতুরা-বেলপাতা তোমায় এইসবে মানায় না। আজ আমি ফুলে-ফুলে তোমার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে দেব।' মহাদেব হাসিমুখে চোখ মেলে চাইবেন। গোল বাধল সাপ নিয়ে। শটের আগে আমার গলায় জ্যান্ত গোখরো সাপ দেখে সতী-শিরোমণি পতির ত্রিসীমানায় আসতে রাজি হলেন না। সাপ নিয়ে তিন-চারটে শট করে সাহস আমার খানিকটা এসে গিয়েছিল, অভয় দিয়ে বললাম, 'এই দেখুন না, সাপ আমার বুকে নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। আপনার কোনো ভয় নেই।' বলতে বলতেই দেখি সাপটা সড়সড় করে আমার বুকের ওপর থেকে নেমে চৌকির ওপর দিয়ে নিচে নামছে। মরিয়া হয়ে হাত দিয়ে ধরে গলায় পেঁচিয়ে দিলাম। অনেক বলে কয়ে রাজি করানো গেল চন্দ্রাবতীকে, কিন্তু বেদীর গা ঘেঁষে বসতে কিছুতেই রাজি করান গেল না। শুটিং শুরু হল। আলো দিতেই নেতিয়ে বুকের ওপর লেপটে রইল সাপটা। ফুল হাতে সতী কিছুদূরে বসে সংলাপ শুরু করলেন। নির্বিষ নেতিয়ে পড়া সাপটা আস্তে আস্তে ফণা তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল চন্দ্রাবতীর দিকে। তারপর একটু একটু করে ঝুঁকতে লাগল ফুলসুদ্ধ প্রসারিত হাতের দিকে। সুন্দরী স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দুর্বলতা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে এতদিন জানতাম। আজ নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। দেখি চন্দ্রার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, সেখানে এসে জড়ো হয়েছে রাজ্যের ভয়। দু'-একটি সংলাপ ঐ অবস্থায় বলেই— 'বাবা রে মা রে!' করে পিছনে পড়ে প্রায় অজ্ঞান। বেশ কিছু সময় কেটে গেল। তারপর ক্লোজ শটে সিনটা কেটে-কেটে কোন মতে কাজ শেষ হল।

সারা দেহে সাপের একটা বিটকেল গন্ধ লেগে আছে। নিজেরই ঘেন্নায় বমি আসছে। পূর্বের ব্যবস্থা মতো গরম জল আর কার্বলিক সাবান দিয়ে বেশ করে স্নান করে বাড়ি এলাম।

ইতিমধ্যে 'চাঁদ সদাগর' ক্রাউনে রিলিজ হল। হিট ছবি। নাম করলেন পরিচালক প্রফুল্ল রায়, অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেন নাম-ভূমিকাভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রচুর পয়সা পেলেন প্রযোজক বাবুলাল চৌখানি, শুধু রাজ্যের অপযশ ও নিন্দার মালা পরে দর্শক ও সমালোচকদের বিদ্রূপের খোরাক হয়ে দাঁড়ালাম হতভাগ্য আমি। কেষ্টামার্কা পার্ট হলেও খানিকটা বাঁচতাম, এ তার চেয়েও মেয়েলি ভূমিকা; ছবিটার গোড়ার দিকে

মা-বাপের নয়নের মণি আদুরে দুলাল লখিন্দর অস্ত্রশিক্ষকের কাছে তলোয়ার খেলা শেখে, আর ওরই মধ্যে পুত্রগতপ্রাণা মা সনকা এসে পরিশ্রান্ত ছেলেকে ফল-দুধ খাইয়ে যান। কিছুদিন বাদেই লখিন্দরের বিয়ে হল—বাসরঘরে সাপের কামড়ে বেচারি অকালে মৃত্যু বরণ করে। এরপর সারা ছবিটায় সতী-শিরোমণি বেহুলার সতীত্ব প্রচারে উপলক্ষ্য হয়ে মড়া হয়ে ভেলায় শুয়ে থাকা ছাড়া বেচারির আর কিছু উপায় নেই। ছবি দেখে লজ্জায়-ঘেন্নায় আমারই নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল, দর্শক ও সমালোচকের দোষ কী?

কয়েকমাস আগে 'যমুনা পুলিনে' রিলিজ হয়ে ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। এইবার তাতে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর গজিয়ে উঠল।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার উপায় নেই। অরসিক দুষ্টু ছেলের দল পিছু লাগে। কেউ বলে, 'বাবা লখিন, বড্ড পরিশ্রম করেছ। যাও দুধ খেয়ে এস।'

আর কেউ, 'তোমার ছকি কেমন আছে কলির কেষ্ট?'

এতেও শেষ হয় না। ঘরে-বাইরে অশান্তি। বাড়ি এসে দেখি স্ত্রীর মুখ ভার। চার-পাঁচদিন কথা বন্ধ! রোজ রাত্রে কত-করে বোঝাই, 'দ্যাখো আমি তো তোমায় প্রতারণা করে বিয়ে করিনি। তোমার অভিভাবক, দাদা নিজে দেখে-শুনে, আমি বায়োস্কোপ থিয়েটারে কাজ করি জেনেই তো বিয়ে দিয়েছেন। তা হলে আমার দোষটা কোথায়?'

অভিমান বা রাগ তবু যায় না। অনেক কষ্টে আবিষ্কার করি, আমি কেষ্ট সেজে একপাল মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করি তাঁর খুব খারাপ লাগে। তাঁর ধারণা ঐ ধরনের ভূমিকা অভিনয় করা যেন সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমার ইচ্ছার উপর। হায় ভাগ্য!

ইতিমধ্যে অনেকগুলো সামাজিক ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। আমার ভাগ্যে সবগুলো যেন এক সুরে বাঁধা। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অভাবের সঙ্গে লড়াই করে আর ফোঁসফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাগ্যদেবতাকে অভিসম্পাত দ্যায়। ড্যাবডেবে করুণ চোখে চেয়ে দর্শকের করুণার চেয়ে বিরক্তি উৎপাদনই বেশি করে মেরুদণ্ডহীন বোকা ভালমানুষ নায়ক।

ভাবলাম দেখা যাক 'দক্ষযজ্ঞ' ছবিতে জ্যান্ত সাপ গলায় ঝুলিয়ে ভূতপ্রেতের সঙ্গে তাণ্ডব নেচে যদি মোড় ঘোরাতে পারি, ভোলানাথকে ভোলাবার চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম।

একদিন স্টুডিওতে গিয়ে শুনলাম 'দক্ষযজ্ঞ' ছবির বহির্দৃশ্য তুলতে আমাকে দার্জিলিং যেতে হবে। আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম যেন। একে কলকাতা নানা কারণে অসহ্য, তার উপর ছেলেবেলা থেকে আমার কল্পনার স্বর্গরাজ্য ধবল তুষারমৌলি হিমালয় দেখার অদম্য বাসনা। এত শিগগির সে সুযোগ আসবে কল্পনাও করিনি। নির্দিষ্ট দিনে বেডিং-সুটকেস নিয়ে দার্জিলিং মেলে রওনা হয়ে পড়লাম।

জ্যোতিষবাবু কী কারণে যেতে পারলেন না, সঙ্গে গেলেন 'শ্রীহীন কৃষ্ণে'র লেখক পরিচালক তড়িৎকুমার বোস, এম. এ.। চমৎকার আমুদে লোক তড়িৎদা, পথের কষ্ট জানতেই পারলাম না।

দার্জিলিং পৌঁছে 'স্নো ভিউ' হোটেলে সদলবলে উঠলাম। দু'-তিন দিন আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে বৃষ্টি; শুটিং হল না। সকালে চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি, আবার দুপুরে এসে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার প্রকৃতির খামখেয়ালির রাজ্যে ঘুরে বেড়াই। ছোট শহর দার্জিলিং, দু'একদিন ঘুরলেই দর্শনীয় সব কিছু দেখা হয়ে যায়। তবু যেন আশা মেটে না।

চতুর্থ দিনে রাত্রি চারটের সময় সোরগোল করে তড়িৎদা সবাইকে তুলে দিলেন, বললেন, 'আজ ভোর থেকে রেডি হয়ে বসে থাকব। রোদ উঠলেই শুটিং। এভাবে চুপচাপ বসে থাকলে কোম্পানি ভাববে কী?'

তাই হল, শীতে কাঁপতে কাঁপতে সারা গায়ে চুনকাম করে জটাজুটো পরে সদলবলে ম্যালে গিয়ে উঠলাম। ওখানে সবচেয়ে উঁচু টিলাটার উপর বাঘছাল বিছিয়ে হিমালয়কে পিছনে করে ধ্যানে বসলাম। কোথায় রোদ! কুয়াশা কাটতেই বেলা নটা বাজল। তারপর যদিও বা একঝলক রোদ দেখা গেল, ক্যামেরাম্যান গুণে ক্যামেরা আর রিফ্লেক্টার ঠিক করতে না করতেই তা চলে গেল, এল বৃষ্টি। কোম্পানির ছাতা মাথায় দিয়ে বসে ভিজলাম খানিকক্ষণ। এইভাবে বেলা বারোটা-একটা পর্যন্ত বসে হোটেলে চলে এলাম। এইভাবে তিন-চার দিন কাটল। এতদিনে সূর্যদেব করুণা করলেন। সকাল থেকেই পরিষ্কার রোদ বেশ কিছুক্ষণ পাওয়া গেল। নানা এ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়েফিরিয়ে কতকগুলো শট নেওয়া হল। হিমালয়ের সামনে বসে ধ্যানমগ্ন মহাদেব। ধ্যান ভেঙে সামনে চেয়ে দেখি বেদীটার সামনে ক্যামেরার পাশে ভিড় জমে গেছে। সর্বজাতের সমন্বয়। একটি ইউরোপীয়ান মহিলা ক্যামেরা হাতে এগিয়ে এসে আমার ছবি তুললেন। মনে হল ভারতবর্ষের চিড়িয়াখানা থেকে অদ্ভুত জীবের নমুনা দেশের লোককে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই ছবিটা নিলেন। ছবি তোলা হয়ে গেলে মহিলাটি আমার একেবারে কাছে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন—'হু আর ইউ?'

বেশ একটু দোটানায় পড়ে গেলাম। ভাবলাম, আমার সত্যিকার নাম জানতে চাইছে, না যা সেজে আছি তার নাম। যা থাকে কপালে, বললাম, 'শিব।'

'শিব কে?'

'একজন দেবতা।'

'দেবতা? এখানে বসে কী করছ?'

'ধ্যান করছি, পিছনের ঐ পাহাড়টা আমার রাজ্য।' বলে, হাত দিয়ে সগর্বে হিমালয় দেখিয়ে দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে মহিলাটি একবার হিমালয়

একবার আমার দিকে দেখতে লাগলেন, তারপর সংশয়াকুল কণ্ঠে বললেন, 'ঐটেই যদি তোমার রাজত্ব হয় তাহলে ওখানে না গিয়ে এখানে বসে আছ কেন?'

মহা সমস্যায় পড়লাম। বোঝাই কী করে যে ওখানে মানুষ উঠতে পারে না, তাই ওর যতটা কাছে সম্ভব—। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে নিজেই সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'আই সি! অন্য দেবতা এসে তোমার রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে। তাই ধ্যান করে দেবতাদের তুষ্ট করে ওখানে ফিরে যাবার চেষ্টায় আছ।'

মনে-মনে ভাবলাম, 'ধ্যান করে তুষ্ট করতে হবে না, আর দিনকতক খালি গায়ে এখানে বসে থাকলেই ওখানে যাবার পথ সুগম হয়ে যাবে।'

তড়িৎদা কাছে এসে গল্পটা বুঝিয়ে দিলেন মেমসাহেবকে, মাঝেমাঝে কী সব নোট করে নিয়ে আমাদের কাছে অযথা বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে হৃষ্টমনে চলে গেলেন তিনি।

ফিরে এলাম কলকাতায়। দার্জিলিং-এর শটগুলোয় ছবির উন্নতি হোক বা না হোক আমাদের স্বাস্থ্যের খানিকটা উন্নতি হল। ইতিমধ্যে চারু রায় 'রাজনটী বসন্তসেনা' আরম্ভ করে দিয়েছেন। পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে গেলাম। ও হরি, আমার ভাগ্যে সেই ড্যাবডেবে চোখ নিয়ে শুধু নর্তকী বসন্তসেনার সঙ্গে প্রেম করা—। খুব নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম। ঠিক এই সময় পুরোনো মনিব জাহাঙ্গীর সাহেব ম্যাডানের সব স্বত্ব হারিয়ে খিদিরপুরে ময়ূরভঞ্জ রোডে একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে 'কেশরী ফিল্মস্' নাম দিয়ে নিজস্ব একটি প্রতিষ্ঠান খুলে আমায় ডেকে পাঠালেন। পরদিনই গিয়ে দেখা করলাম। দেখলাম, ম্যাডানের অনেকগুলো পুরোনো মুখ সাহেবের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সাহেব বললেন, 'ধীরাজ! দশ জায়গায় ঘুরে না বেড়িয়ে আমার এখানে স্থায়ীভাবে যোগ দাও, সতীশ দাসগুপ্তকে নিয়ে 'বাসবদত্তা' তুলব ঠিক করেছি। তুমি নায়ক উপগুপ্ত, বাসবদত্তা—কাননবালা।' কাননের তখন চারদিকে বেশ নাম ও চাহিদা, তার বিপরীতে নায়ক, রাজি হয়ে গেলাম। মাইনে ঠিক হল মাসে একশো পঁচাত্তর টাকা।

দিনপনেরো বাদেই শুটিং আরম্ভ হল। চমৎকার গল্পটি। যাক এবার বদনাম খানিকটা ঘোচাতে পারব। তখনও কোনও ফ্লোর তৈরি হয়নি। সিমেন্টের একটি উঁচু বেদীর উপর সিন খাটিয়ে রোদের আলোয় ছবি তোলা হতে লাগল। ক্যামেরার কাজে ধীরেন দে নির্বাক যুগে বেশ নাম করেছিলেন, তাঁকেই নেওয়া হয়েছে। সাউণ্ডে ম্যাডানের ভূতপূর্ব সেটিং মাস্টার দীনশা ইরাণীর ছেলে বর্তমানে নাম করা রেকর্ডার জে. ডি. ইরাণী। বেশ উৎসাহ নিয়ে রোজ শুটিং করে যেতে লাগলাম। মাঝে ব্যবসা সংক্রান্ত, না পারিবারিক ব্যাপারে সাহেব স্টুডিওয় আসা বন্ধ করে দিলেন। আড়াই মাস শুটিং বন্ধ। বাইরে থেকে দু'-একটা অফার এলেও নিতে পারলাম না, এক বছরের জন্য চুক্তি। কী করি, প্রায় তিন মাসের মাইনে বাকি পড়ে গেল। হঠাৎ

একদিন সাহেব স্টুডিওয় এলেন। দেখা করে সব বললাম। সাহেব বললেন, 'ধীরাজ! তুমি আমার নিজের লোক, তাই তোমায় বলছি। খুব অর্থসংকটে পড়ে গেছি। দার্জিলিং-এর বিলাতি মদের দোকানটা আমার ভাগে পড়েছিল, ভাল আয় হত তা থেকে। বহুদিনের পুরোনো ম্যানেজার প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ভেঙে আত্মগোপন করেছে। তাই পাগলের মতো ছুটেছিলাম দার্জিলিং-এ। গিয়ে লস্ দিয়ে দোকান বিক্রি করেও সব দেনা শোধ করতে পারিনি। এখন ভরসা এই ছবিটা। কোনও রকমে ছবিটার শুটিং শেষ করে দাও। এটা আমি আউটরাইট বিক্রি করে দেব এক লাখ পঁচিশ হাজারে। তার আগে কাউকে এক পয়সাও দিতে পারব না।'

সবাইকে বলা হল, কেউ শুনল, কেউ শুনল না। যারা শুনল না, সাহেব তাদের বাকি মাইনে চুকিয়ে দিলেন। আমাকে ডেকে গোপনে বললেন, 'এ ছবির পর ওদের তাড়িয়ে দেব। শুধু থাকবে তোমরা ক'জন আমার বিপদের বন্ধু।'

বুক ভরে গেল। এতদিন যাদের নিমক খেয়েছি তাদের দুর্দিনে যে কিছু কাজে লাগতে পারলাম এতেই ধন্য হয়ে গেলাম। সংসারে অভাব অনটন দেখা দিল, দিক। ক'দিন বই তো নয়! এতদিন যখন দুঃখ-কষ্টে কেটেছে তখন আর একটা মাস কোনরকমে কাটিয়ে দিতে পারব। সবাই মিলে পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে লাগলাম। ছবিটার দশআনা আগেই হয়ে গিয়েছিল, এক মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হল। বুক ফুলিয়ে সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পিঠ চাপড়ে সাহেব বললেন, ' ভেরি গুড! এর পুরস্কার তোমরা পাবে।'

বললাম, 'সাহেব এইবার আমাদের মাইনের একটা ব্যবস্থা করুন।' সাহেব বললেন, 'ছবিটা রাশ প্রিন্ট হতে দিনচারেক লাগবে। তারপর যারা কিনবে তাদের দেখাব। এই ধর দিনসাতেকের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলব। তোমরা সামনের সোমবার আমার সঙ্গে দেখা কর।'

খুশি মনে বাড়ি চলে গেলাম। সোমবার বেলা বারোটার সময় আমি, ইরাণী, ধীরেন এবং লেবরেটরির সাত-আটজন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। হাসিমুখে সাহেব বললেন,'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজ রাত্রে বিক্রি কবলায় সই হয়ে টাকা পাব। তোমরা কাল দশটায় এসে টাকা নিয়ে যেও।'

পরদিন দশটায় দিয়ে দেখি গেটে মস্ত বড় তালা। আশেপাশের লোকের মুখে শুনলাম, সাহেব রাতারাতি সব বিক্রি করে কলকাতার বাইরে চলে গেছেন।

কেশরী ফিল্মস-এর ধাক্কা সামলাতে বেশ কিছুদিন লাগল। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস বেকার বসে রইলাম। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি রাধা ফিল্মস্ থেকে ডাক এল। ছবি হবে 'কৃষ্ণ সুদামা'। সুদামা—অহীন্দ্র চৌধুরী, রুক্মিণী—কানন, আর কিছু না বললেও সবাই বুঝতে পারবে শ্রীকৃষ্ণ কে । শুটিং চলতে লাগল—আর কিছু না হোক, বেকার

চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে অনেক ভাল। 'দক্ষযজ্ঞ' রিলিজ হল ক্রাউন সিনেমায়। সারা কলকাতা সরগরম হয়ে উঠল। কোন পৌরাণিক ছবিই এর আগে এত সাড়া জাগাতে এবং একাদিক্রমে একই সিনেমায় ত্রিশ সপ্তাহের গৌরব অর্জন করতে পারেনি। ভাবলাম, ভোলানাথ হয়তো বা তুষ্ট হয়েছেন। কথায় আছে, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে। আমারও হল ঠিক তাই। 'সমালোচকের' দল সব কিছুর প্রশংসা করে আমার সম্বন্ধে লিখল, 'শিবের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয় আমাদের একদম ভাল লাগেনি, ঐ একঘেয়ে ড্যাবডেবে চোখের চাহনি আর মেয়েলি ঢং-এ সংলাপ অসহ্য। তবে আমরা তাঁর তাণ্ডব নাচটির প্রশংসা করব, আর করব তাঁর গলায় ঝোলানো রবারের সাপটির। ওটি যিনি তৈরি করেছেন তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

রবারের সাপ? প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে জলজ্যান্ত গোখরো সাপ গলায় ঝুলিয়ে লাভ হল এই? নায়ক জীবনটার ওপরই ধিক্কার এসে গেল।

একদিন 'কৃষ্ণ সুদামা' মুক্তি পেল, পৌরাণিক ছবির জন্যে ইতিপূর্বেই রাধা ফিল্মস বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—'কৃষ্ণ সুদামা' সে খ্যাতি আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল। গোল বাধল আমাকে নিয়ে, পোস্টারে আমার আর কাননের মুখ বেশ বড় করে ছাপা হল—সিনেমা হাউসের সামনে দর্শকের মধ্যে রীতিমত বাজি ধরা শুরু হয়ে গেল। কোনটা আমার মুখ আর কোনটা কাননের। দু'জনেরই বড় বড় চোখ, উন্নত নাক, তার উপর পৌরাণিক পোশাক আর গয়না মুকুটে একটু দূর থেকে মনে হবে যমজ বোন। ব্যস্ আর চাই কী? সমালোচকদের বেশ খানিকটা মুখরোচক খোরাক জুটে গেল। এতেও নিস্তার নেই, পাড়ার কয়েকটি ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছবি দেখে এসে প্রকাশ্যে আমাকে আশীর্বাদ করে করে বলে গেলেন, 'এই রকম ছবিতে নেবো তুমি—আহা কেষ্টঠাকুর তো কেষ্টঠাকুর।'

সুকুমার দাশগুপ্ত কমলা টকিজের হয়ে ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের বিখ্যাত উপন্যাস 'রাজগী'র চিত্ররূপ দেবেন, নায়কের ভূমিকায় আমাকে নির্বাচন করে ডেকে পাঠালেন। প্রথমটা বিশ্বাস করতেই পারিনি ওরকম একটি জটিল মনস্তত্ত্বমূলক ভূমিকায় কী করে আমায় মনোনীত করলেন। সত্যিকার রক্তমাংসের জলজ্যান্ত নায়ক—স্ত্রী থাকতেও অপর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। মোট কথা, যে ধরনের ভূমিকা আমি বরাবর করে এসেছি তা থেকে বেশ কিছু ব্যতিক্রম। মন-প্রাণ দিয়ে অভিনয় করলাম, ভালও বলল সবাই, সমালোচকের ছুরি কলম হয়ে লিখল 'আজ পর্যন্ত যা করেছেন তার মধ্যে 'রাজগী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।'

কিন্তু কী ফল লভিনু হায়, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বেজে উঠল—আবার ছুটলাম বৃন্দাবনে। এবার রাধা ফিল্মস্ তুলবেন 'নর-নারায়ণ।'

হাতি-মার্কা ছবি তখন বাজার একচেটে করে ফেলেছে। যে ছবি বেরোয় নিউ

থিয়েটার্স থেকে, দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চণ্ডীদাস, পুরাণ ভকত, ভাগ্যচক্র, মুক্তি— একটার পর একটা হিট ছবি বেরুতে লাগল ঐ একমাত্র বাঙালি প্রতিষ্ঠান থেকে। ভাবলাম, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি, যদি ওখানে ছবিতে চান্স পাই, আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে।

গেলাম একদিন সকাল ন'টার সময় নিউ সিনেমায়, হেড আর্ফিসে। দুরুদুরু বক্ষে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে দেখি মিঃ সরকারের দরজার সামনে টুল পেতে পুরু খাকির ওপর লাল এন. টি. ছাপা কোট গায়ে বুক ফুলিয়ে বসে আছে বেয়ারা। সাহেবের সঙ্গে দেখা করব বলতেই পকেট থেকে একটা ছোট কাগজের স্লিপ ও পেন্সিল এগিয়ে দিল আমার দিকে। লিখে দিলাম। একটু পরেই ভিতরে ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকতেই খালি একটা চেয়ার দেখিয়ে মিঃ সরকার বললেন, 'বসুন'।

দেখলাম ৫৫৫ সিগারেটের টিন থেকে একটার পর একটা শুধু খেয়েই চলেছেন। একটা শেষ হয়ে যাবার আগেই আর একটা ধরিয়ে নেন। চুপচাপ বসে চারদিক দেখছি। মিঃ সরকার বললেন, 'বলুন'।

কী বলি! হাউহাউ করে একসঙ্গে বলে গেলাম আমার পাথরচাপা বরাতের ফাঁপা একরাশ কথা। সব শেষে বললাম, 'আপনি আমার শেষ ভরসা, আপনার এখানে একটা চান্স পেলে আমার সব দুর্নাম ধুয়েমুছে নিঃশেষ হয়ে যাবে, এ লাইনে আমি হয়তো আরও কিছুদিন টিকতে পারব।'

প্রথম আলাপ। দেখলাম খুব কম কথা ক'ন ভদ্রলোক। সব শুনে চুপ করে কী যেন একটু ভেবে নিলেন, তারপর টেবিলের ওপর প্যাডে পেন্সিল দিয়ে কী একটা লিখে আমায় বললেন, 'আপনি নেক্সট্ উইকে, মানে সামনের সোমবার, আমার সঙ্গে দেখা করবেন।' নমস্কার করে চলে এলাম।

সপ্তাহকে মাস হতে দেখেছেন কেউ? আমার ভাগ্যে এক সপ্তাহ এক মাস দীর্ঘ হয়ে আমার ধৈর্যের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে দিল, সোমবার আর আসে না। নির্দিষ্ট দিনে একটু আগেই নিউ সিনেমায় গিয়ে হাজির হলাম, বেয়ারা বলল, 'সাহেব এখনও আসেননি।' মিঃ সরকার একটু দেরি করেই আফিসে এলেন। স্লিপ পাঠালাম। ডাক আর আসে না। আধঘন্টা পরে স্লিপটা হাতে করে বেয়ারা এসে বলল, 'সাহেব এতেই লিখে দিয়েছেন।'

রুদ্ধনিশ্বাসে স্লিপটার উল্টো পিঠে পেন্সিলে লেখা ইংরেজি লাইন দুটো বার চারেক পড়ে ফেললাম। সেই মামুলি ঘুরিয়ে নাক দেখানোর কথা, 'দুঃখিত, বর্তমানে লোকের দরকার নেই, পরে প্রয়োজন হলে আপনাকে ডেকে পাঠাব।'

ব্যস। আর কোন ক্ষোভ নেই আমার। এইবার নিশ্চিন্তমনে একঘেয়েমির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারব। রেলিং ধরে তিনতলার খাড়া সিঁড়িগুলো দিয়ে কোনো রকমে নেমে বাড়ি চলে এলাম।

দিনচারেক বাদে একদিন মনমোহনের সঙ্গে দেখা, ধর্মতলার মোড়ে। দেখতে পেয়েই কাছে এসে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল মাঠের দিকে, মনুমেন্টের কাছাকাছি এসে হাত ছেড়ে দিয়ে হাসতে শুরু করল মনমোহন। একটু পরে বলল, 'হ্যাঁ রে, তুই নিউ থিয়েটার্সে ঢোকবার চেষ্টা করেছিলি? ওরা তোকে কোনো দিনই নেবে না।'

রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল মিঃ সরকারের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া এবং তার ফলাফল আমি আর মিঃ সরকার ছাড়া আর কেউ জানে না। কথা কইব কী, হাঁ করে চেয়ে রইলাম মনমোহনের দিকে। আমার অবস্থা দেখে বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে মনমোহন বলল, 'ভাবছিস আমি জানলাম কী করে? তুই বোধ হয় জানিসনে, আমি এখন নিউ থিয়েটার্সের ক্যামেরাম্যান। কয়েকদিন আগে স্টুডিওর গোলঘরের আদালতে সন্ধ্যেবেলায় তোর মামলা তুলেছিলেন মিঃ সরকার। পাবলিক প্রসিকিউটর অমর মল্লিক লাফিয়ে উঠে প্রতিবাদ করে বললেন, 'এ হতেই পারে না, ও একটা আর্টিস্টই নয়, ওকে নিউ থিয়েটার্সে নিলে আমাদের প্রেস্টিজের হানি হবে।'

ব্যস, কেস ডিসমিস হয়ে গেল। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, সদালাপী, হাস্যময় নাদুসনুদুস মল্লিকমশায়ের কথা। সামান্য মৌখিক আলাপ ছিল, দেখা হলেই অতি পরিচিতের মতো গায়ে পড়ে আলাপ-আপ্যায়ন করেন, অজ্ঞাতে কবে কী ক্ষতি তাঁর করেছি! অনেক ভেবেও কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না।

বললাম, 'যাকগে, তোর কথা বল। নিউ থিয়েটার্স লাগছে কেমন?'

—'চমৎকার, দশটায় যাই, বেলা দুটো পর্যন্ত লাইট ফিট করি—তারপর লাঞ্চের ছুটি। খেয়ে-দেয়ে তিনটে নাগাদ ফ্লোরে আসি। চারটের সময় একটা শট নেওয়া হয়, আবার ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে লাইট করা শুরু হয় । পাঁচটা, সাড়ে-পাঁচটায় আরেকটা শট নেওয়া হয়। তারপরই সবাই উৎকর্ণ হয়ে থাকি মোটরের হর্নের অপেক্ষায়, সন্ধ্যে ছটা-সাড়ে ছটায় শ্যামের বাঁশি বেজে ওঠে, সব ফেলে ছুটে যাই গোলঘরে। সাহেব ঘন্টাখানেক থাকেন, দৌড় ঐ গোলঘর পর্যন্ত। ঐখানে বসে স্তাবকদের মুখে স্টুডিওর খুঁটিনাটি সব খবর নিয়ে চলে যান বাড়ি। আমাদেরও ছুটি।'

পরিচালক মধু বসু সদলবলে সবাক চিত্রজগতে অবতীর্ণ হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। অভিজাত বংশের নরনারীদের নিয়ে 'আলিবাবা' এঁদের প্রথম ছবি। এবার তিনি ভারতলক্ষ্মীর হয়ে মন্মথ রায়ের গল্প 'অভিনয়'-এর চিত্ররূপ দেবেন। নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য আমাকে ডেকে পাঠালেন। বার বার আশাহত হয়ে হয়ে কিছুতেই আর চট করে আশান্বিত হই না।

ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে গিয়ে কথাবার্তা ঠিক করে চুক্তিপত্রে সই করে এলাম। রিহার্সাল দিতে হবে । মিঃ বোস তখন এম্পায়ার থিয়েটারের (অধুনা রক্সি সিনেমা) উপরতলায় সমস্ত ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। সেইখানেই রোজ দুপুরে রিহার্সাল দিতে যাই। প্রধান ভূমিকায় ছিলাম আমরা তিনজন— আমি, অহীনদা ও মিসেস সাধনা বোস। প্রথম দিন কাহিনীকার মন্মথ রায় গল্পটি শোনালেন, চমৎকার লাগল। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা কাহিনী, নায়ক হীরক রায় খামখেয়ালি বড়ঘরের ছেলে, কাগজে সুন্দরী মেয়ের ছবি দেখে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে বিয়ে করল মধ্যবিত্ত ঘরের মা-হারা বিদুষী মেয়ে মনীষাকে। গোল বাধল তারপর। হীরক রায় রতনগড়ের রাজকন্যার সঙ্গে প্রেম করে বাইরে রাত কাটায়, ঘরে মনীষা প্রহর গুনে বসে থাকে স্বামীর অপেক্ষায়। ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে কাহিনী। অবশেষে মনীষা জানতে পারলে তাকে বাজি রেখে বিয়ের কথা। লজ্জায় অপমানে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে যায় মনীষা স্টেজে, অভিনয়ের মধ্যে নিজের সব দুঃখ ডুবিয়ে দিতে। শেষকালে এক নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে রতনগড়ের রাজকন্যার সঙ্গে স্বামীর মিলন ঘটিয়ে দিয়ে চরম আত্মত্যাগ করে মনীষা ফিরে যায় অন্ধ বাপের কাছে। গল্পের শেষ এইখানেই।

অনেকদিন বাদে আবার আশান্বিত হলাম। নায়ক হীরক রায় দোষত্রুটিতে ভরা সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। পরোপকারী, চরিত্রবান, পত্নীগতপ্রাণ ভালমানুষ নয়, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। একটা অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। পরিচালক নিজে যদি অভিনয় করেন অথবা তাঁর স্ত্রী যদি নায়িকা হন, তাহলে সবসময় বেচারি নায়কের উপর সুবিচার রক্ষা করতে পারেন না বা করেন না। যাকগে, তবুও নায়ক হীরক রায় গতানুগতিক নায়কদের চলার পথের বাইরে দিয়ে হাঁটে, সেইটেই কি আমার মতো পথশ্রান্ত নায়কের পক্ষে কম লাভ? পরিচালক মধু বোসকে ধন্যবাদ দিলাম।

সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রায় আট মাসে শুটিং শেষ হল। মাসখানেক বাদে রূপবাণী চিত্রগৃহে সাড়ম্বরে মুক্তি পেল 'অভিনয়'। বাইরে তোলা প্রথম একখানি ছবি—হাতিমার্কা ছবির পাশে সগর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। দর্শক-সমালোচকের প্রশংসাগুঞ্জনে কলকাতার আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। আমার অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েও কেউ উঠল না, শতমুখে নিন্দাও করল না কেউ, শুধু লিখল 'ভাল পরিচালক ও ভাল ভূমিকা পেলে ভবিষ্যতে সুঅভিনয় করলে আমরা অবাক হব না।' যথেষ্ট। ভাবলাম যাক এতদিন বাদে ভাঁটার টান বন্ধ হয়ে জল স্থির হয়েছে। এবার একদিন জোয়ার এলেও আসতে পারে।

সাহিত্যিক শৈলজানন্দ সাহিত্যের সভামঞ্চ থেকে নিচে ফিল্ম দুনিয়ায় দৃষ্টিপাত করলেন, আর দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না, সিঁড়ি বেয়ে সটান নেমে এসে ঢুকে

পড়লেন গেট পেরিয়ে একেবারে স্টুডিওর মাঝখানে। নিজের 'নন্দিনী'র চিত্ররূপ দেবার সব ব্যবস্থা শেষ করে ফেললেন। কলেজজীবনে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম অস্থির পদক্ষেপের সঙ্গেসঙ্গেই শৈলজানন্দের সঙ্গে আলাপ, উনিও নতুন ব্রতী, সবে কয়লাকুঠির গল্প লিখেছেন। সেই থেকে বন্ধুত্ব।

দেখা হতেই বললেন, 'ছবি করছি শুনেছ বোধহয়? আমার প্রথম ছবিতে তোমাকে রোম্যান্টিক নায়কের ভূমিকায় নামাব ঠিক করেছি।'

বললাম, 'আবার রোম্যান্টিক নায়ক? তার চেয়ে যদি কোনও ভিলেনের রোল থাকে তাই দিন না?' হোহো করে বীরভূমী হাসিতে ঘরসুদ্ধ সবাইকে সচকিত করে শৈলজাবাবু বললেন—'তোমরা সবাই শোন, রোম্যান্টিক নায়কের ভূমিকার বদলে ধীরাজ চাইছে ভিলেনের রোল। এক রোম্যান্টিক নায়ক ছাড়া আর কোনও ভূমিকায় যে তোমায় মানায় না, এই সোজা কথাটা এতদিনে কেউ তোমায় বুঝিয়ে দেননি ধীরাজ?'

জবাব দিলাম না, চুপ করে রইলাম। একবার ভাবছিলাম বলি, সেই নির্বাক যুগ থেকে এই একটা কথা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি বলেই আজ একটু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাইছিলাম।

শৈলজানন্দ বললেন, 'বেশ তোমাকে আমি ভিলেনই দেব।'

অবাক হয়ে চাইলাম।

শৈলজানন্দ সোৎসাহে বলে চললেন, 'শুধু দেখিয়ে দাও তোমার মতো একটি ছেলে—নাক-চোখ-মুখ তোমার মতো নিখুঁত সুন্দর—আমি তোমাকে দেব ভিলেন রোল।'

বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল নিজের ওপর। ওই নাক-চোখ-মুখ, যার প্রশংসায় আজ পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন শৈলজানন্দ—সেগুলো যে আমার কত বড় শত্রু, তা আজ আমার চেয়ে আর কেউ জানে না। চুপ করে রইলাম।

শৈলজানন্দ বললেন, 'পারলে না তো? আমি জানি বাংলাদেশে তুমি ছাড়া আর একটিও রোম্যান্টিক নায়ক নেই। নাও 'কনট্র্যাক্ট' সই করো, সোমবার থেকে শুটিং।'

ঘুরেফিরে আবার সেই ম্যাডানে। এখন আর ম্যাডান নেই, ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। রায়বাহাদুর সুখলাল কারনানি স্টুডিওর ভাড়া দেওয়া ছাড়াও নিজে প্রডাকসনে নেমেছেন। জ্যোতিষবাবু বহুদিনের পুরোনো লোক, তাঁকে দিয়েই 'শকুন্তলা'র বাংলা চিত্ররূপ দেবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। পুরোনো জিনিসের ওপর রায়বাহাদুরের একটা ঝোঁক দেখলাম। পুরোনো গল্প, পুরোনো পরিচালক, পুরোনো নায়ক। ডাক পড়ল আমার। জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। বললেন, 'পারিশ্রমিক ঠিক করবেন রায়বাহাদুর স্বয়ং, তুমি নিজে গিয়ে ঠিক করে এস।'

বিকেল পাঁচটা বেজে গেল। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর দু' নম্বর ফ্লোরের সামনে চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, তারই এক পাশে প্রকাণ্ড একটা গোল টেবিল পাতা, চারধারে পাঁচসাতখানা চেয়ার। মাঝের বড় চেয়ারটায় বসে আছেন বিরাট বপু বুলডগের মতো ভয়াল গম্ভীর মুখ নিয়ে ধনকুবের রায়বাহাদুর সুখলাল কারনানি। অসম্ভব রাশভারি দুর্মুখ লোক, কাছে যেতে ভয় হয়। দেখলাম চেয়ারে বসবার সাহস কারো নেই। সবাই বেশ কিছুটা দূরে হাত-জোড় করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে চারধারে। নামডাকই শোনা ছিল, এতটা নিকট সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য কোন দিন হয়নি। একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, হাত-জোড় করার দলে ভিড়ে যাব, না সামনে চেয়ারে গিয়ে বসব—যা থাকে কপালে, সামনে গিয়ে নমস্কার করে একখানা চেয়ারে বসে পড়লাম। একনজর চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন রায়বাহাদুর। ড্রাইভার সতীশের বিচার হচ্ছিল, হঠাৎ আমি এসে পড়াতে একটুখানি মুলতুবি ছিল, আবার শুরু হল।

রায়বাহাদুর, 'তুমি ব্যাটা পাক্কা চোর আছ।'

সতীশ, 'না হুজুর।'

'আলবাত', বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন রায়বাহাদুর। 'গেল মাসের পেট্রলের হিসাবে দেখা গেল, দো গ্যালন কমতি। দো গ্যালন তেলের দাম তোমার মাইনেসে কাটা হোবে।'

ম্যাডানের আমল থেকে পুরোনো লোক সতীশ, একপাল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর করে, মনে মনে দুঃখিত হলাম।

সামনে রাখা ছোট্ট একটা কাগজের স্লিপে একবার চোখ বুলিয়ে হাঁক দিলেন রায়বাহাদুর, 'উছ্বা ব্যাটা চোরের সর্দার, উছ্বা কাঁহা? বুলাও উসকো।'

বুলাতে হল না, সামনে অপেক্ষমাণ জনতার মাঝে গরুড়পক্ষীর মতো হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রপুরীর হেড মালি বা গাছপালা সাপ্লায়ার উছ্বা। টকি আসবার পর থেকে উছ্বার রোজগার হানড্রেড পারসেন্ট বেড়ে গেছে। নির্বাক যুগে রাস্তা বা বন-জঙ্গলের সিন তুলতে হলে সত্যিকার রাস্তায় বা বনে-জঙ্গলে গিয়ে তোলা হোত। কিন্তু সবাক ছবিতে সব সময় তা সম্ভব হয় না, কাজেই স্টুডিওতে গাছপালা বসিয়ে দূরে আকাশের সিন টাঙিয়ে সে কাজ সেরে নেওয়া হয়, আর সেই গাছপালার জন্য আপনাকে উছ্বার দ্বারস্থ হতে হবেই। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তিন-চারটে সেটিং কুলিকে নিয়ে উছ্বা বড় বড় আম জাম কাঁঠাল গাছের ডাল কেটে এনে স্টুডিওর ভেতর জঙ্গল তৈরি করে দিল, মহানন্দে শুটিং শেষ হল। একমুখ পানদোক্তা নিয়ে হাসিমুখে উছ্বা এসে নমস্কার করে আপনার হাতে গাছপালার বিল দিল। দেখেই চক্ষু চড়কগাছ। একদিনের শুটিং-এর গাছপালার বিল করেছে উছ্বা ষাট টাকা। অনেক বকাবকি রাগারাগি করে সেইটে কেটে চল্লিশ টাকায় রফা হল। মহা দুঃখিত হয়ে টাকা নিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেল উছ্বা। আসলে কিন্তু

ঐ চল্লিশ টাকাই উছ্‌বার লাভ। গাছ কাটা আর বয়ে আনার জন্য তিন চারটে কুলিকে খুব বেশি হলে এক টাকা দিয়ে বাকি টাকাটা উছ্‌বা বাক্সে তুলে রাখল। দশ-বারো বছর বয়সের সময় উছ্‌বা উড়িষ্যা থেকে ম্যাডানে আসে, সেই থেকে আছে। পরশ্রীকাতর দুষ্টু লোকে কানাঘুষা করে বলে, এরই মধ্যে নাকি উছ্‌বা দেশে দু'খানি বাড়ি ও প্রচুর ধানের জমি করেছে।

সামনে রাখা কয়েকটি কাগজের ফর্দের ওপর চোখ বুলিয়ে গর্জন করে উঠলেন রায়বাহাদুর, 'ব্যাটা চোরের সর্দার, তিন দিনের গাছপালার বিল একশ সাত টাকা? তুই ব্যাটাই ফতুর করবি আমাকে।'

পানদোক্তা ঠাসা গোমড়া মুখখানা মুহূর্তে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল উছ্‌বার। পচা চিংড়ি মাছের খোলসের মতো লাল দাঁত দুপাটি বার করে এক গাল হেসে বলল, 'যেদিন তা পারিব, সেদিন উছ্‌বা মালির কাজ ছাড়ি দিবে। স্টুডিও খুলিকিরি গ্যাঁট হয়ে চেয়ারে বসিকিরি বিল সই করিব।'

রায়বাহাদুরকে অনুকরণের ভঙ্গিতে গালদুটো ফুলিয়ে গম্ভীর ভাবে শূন্যে অদৃশ্য কাগজে সই করে দেখিয়ে দিল উছ্‌বা।

ঈষৎ শঙ্কিতভাবে রায়বাহাদুরের দিকে চাইলাম। ঝুলে পড়া পুরু চামড়ার আবরণ ভেদ করে, খুশি বা রাগের কোনও আভাসই দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, বিলটা কাছে টেনে এনে খসখস করে কী লিখে সই করে দিলেন। কৌতূহলে সামনে একটু ঝুঁকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—একশ সাত টাকার বিলটার মাত্র সাত টাকা কেটে পুরো একশ টাকা মঞ্জুর করে সই করে দিয়েছেন রায়বাহাদুর।

এই অদ্ভুত লোকটার ততোধিক অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা ভেবে বেশ একটু অবাক হতে যাচ্ছি, পিছনে কংক্রিটের রাস্তায় জুতোর আওয়াজ পেলাম—খট খট খট। মুখ ফিরিয়ে দেখি পাতলা সিল্কের প্যান্টের সঙ্গে সিল্কের হাফ্‌শার্ট পরে বেশ দ্রুতপদে এগিয়ে আসছেন পরিচালক-অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া। সোজা এসে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে হাতের ফাইলটা টেবিলের ওপর রেখে সশব্দে বসে পড়লেন বড়ুয়াসাহেব। রায়বাহাদুরের ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের টিনটা সামনেই ছিল, তা থেকে একটা সিগারেট বার করে পরমানন্দে টানতে লাগলেন। পরিচয়ের সৌভাগ্য তখনও হয়নি, নীরব দর্শকের মতো শুধু চেয়েই রইলাম। চেয়ারটায় বেশ একটু নড়েচড়ে বসে রায়বাহাদুর বললেন, 'আপনার কি খোবর বড়ুয়াসাব?'

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বড়ুয়াসাহেব বললেন, 'আপনার এখানে ছবি করা আমার পোষাবে না রায়বাহাদুর!'

শঙ্কিতভাবে রায়বাহাদুর বললেন, 'কেনো? কেনো বলুন তো?'

'কালকে আমার 'চাঁদের কলঙ্ক'র শুটিং ছিল—মেয়ে-পুরুষ নিয়ে প্রায় দেড়শো একসট্রার দরকার। শুটিং করতে এসে দেখি মাত্র শ-খানেক লোক, তার মধ্যে

মেয়েগুলোকে ধরে নিয়ে এসেছে টালিগঞ্জের বস্তি থেকে, চেহারা দেখলে চোখ বুঁজে আসে। আর ডায়লগ? সাতদিন ধরে চেষ্টা করলেও ওদের মুখ দিয়ে একটা কথা কওয়ানো যাবে না। একসট্রা সাপ্লায়ার হানিফকে জিজ্ঞাসা করতেই বলল, 'কী করব স্যার। রায়বাহাদুর প্রতি মেয়ে-পিছু তিন টাকা আর ব্যাটাছেলে এক টাকার বেশি পাস করতে চান না। তিন টাকায় তো আর কুমোরটুলি থেকে মেয়ে গড়িয়ে আনতে পারিনে। কী করব, বাধ্য হয়ে শুটিং প্যাক-আপ করে দিলাম।'

'ঝুঠা! একদম ঝুঠা বাত।' সিংহের মতো গর্জন করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন রায়বাহাদুর। 'বুলাও নিমকহারাম হানিফকো!'

কোথায় হানিফ? সে একটু আগে বেগতিক বুঝে 'য পলায়তি' নীতি অনুসরণ করে সরে পড়েছে। রায়বাহাদুর হানিফের উদ্দেশে বেশ চোখা চোখা কতকগুলো গালাগালি বর্ষণ করে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'কী জানেন বড়ুয়াসাব, সব শালা চোর। ওরা যদি আমার সামনে এসে বলে যে ভাল মেয়ের দরকার— বেশি টাকা না দিলে পাওয়া যাবে না, আমি কি দিতাম না? ভয়ে কেউ সামনে এসে কোনও কথা বলবে না। তাছাড়া আমি জানি। মেয়েদের ঐ তিনটাকার মধ্যে একটাকা দস্তুরি লিবে ঐ ব্যাটা হানিফ।'

স্টুডিও ম্যানেজার বিজয় মুখুজ্যেকে ডেকে আর এক দফা বকাবকি করে পরের দিন বড়ুয়াসাহেবের শুটিং-এর সব বন্দোবস্ত পাকা করে রায়বাহাদুর বললেন, 'এই যে আপনি সোজা আমার কাছে এসে সব বললেন এতে আমি খুশিও হল, আর চটপট সব ব্যবস্থা হয়েও গেল। ভয়ে কেউ আমার কাছেই আসবে না—কেন রে বাবা! আমি কি বাঘ আছি না ভাল্লুক আছি যে কাছে এলেই চট করে গিলে খেয়ে লিব। আমি সব বুঝি বড়ুয়াসাব, বুঝলেন? যারা কাছে না এসে দূর থেকে শুধু হুজুর-হুজুর করে আর দোসরা আদমি দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিতে চায়,সে শালারা চোর আছে। যারা অভাব-অসুবিধা হলে সোজা কাছে এসে সব খুলে বলে, তারা সাচ্চা আদমি আছে, মনে কোনো ঘোর-প্যাঁচ নাই।'

কাজ শেষ করে খুশি মনে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে গটগট করে চলে গেলেন বড়ুয়াসাহেব।

এতক্ষণে সত্যিকার নজর পড়ল আমার দিকে। প্রকাণ্ড চেয়ারটায় হেলান দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে রায়বাহাদুর বললেন, 'আপনি? আপনি কী জন্য আমার কাছে এসেছেন?'

সংক্ষেপে নাম-পরিচয় এবং আসার উদ্দেশ্য বললাম।

অন্য দিকে চেয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রায়বাহাদুর বললেন, 'নাম শুনেছি, আপনি তো ম্যাডানের আমলের বহুত পুরোনো আর্টিস্ট আছেন। বলুন, আমার 'শকুন্তলা' ছবিতে কত লিবেন?'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'দেখুন রায়বাহাদুর, অভাব আমার অফুরন্ত, চাইবার অধিকার আমাকে দিলে, অসম্ভব চেয়ে ফেলব। তার চেয়ে আপনি কত দেবেন বলুন। পোষায়, সোজা 'হ্যাঁ' বলে রাজি হয়ে যাব। না পোষায় তাও আপনাকে জানিয়ে দেব।'

একটা বাজে কাগজের ওপর লাল পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি দাগ কাটতে কাটতে বললেন—'হুঁ, আপনার বুদ্ধি আছে।'

ফিল্ম-লাইনে আসা অবধি আমার বুদ্ধির তারিফ এই প্রথম শুনলাম।

—'দেখুন ধীরাজবাবু, আমি সিধা কথার মানুষ। তিন মাসের কনট্র্যাক্ট করব আপনার সঙ্গে, ছশো টাকা দিব।'

—'আমার পোষাবে না রায়বাহাদুর।'

—'কেন? ম্যাডানে তো আপনি অনেক কম মাইনেতে কাজ করেছেন?'

—'সত্যি কথা। কিন্তু সেটা ছিল নির্বাক যুগ, সবে ঢুকেছি লাইনে, আর তখন জিনিসপত্তর ছিল সস্তা। এখন চাল ব্ল্যাকে সত্তর-আশি টাকা দিয়ে কিনতে হয়—যার সংসারে দশ-বারোটি পোষ্য তার অবস্থাটা একবার ভাবুন তো, ঐ টাকাতে দু'বেলা ডাল-ভাত জোটানোই কষ্টকর।'

পেন্সিল থামিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন রায়বাহাদুর। বললাম, 'বাড়িতে আধপেটা ডালভাত খেয়ে স্টুডিওয় এসে রাজা দুষ্মন্ত সেজে সোনার সিংহাসনে বসার মতো বিড়ম্বনা জীবনে আর কী থাকতে পারে বলুন তো!'

মনে হল বৃহৎ ভুঁড়িটার সঙ্গে ঝুলেপড়া মুখের পুরু চামড়াগুলো বারকয়েক কেঁপে উঠেই তখুনি থেমে গেল। নিস্তরঙ্গ কালো দিঘির বুকে ছুঁড়ে ফেলা ছোট্ট একটা ঢিলের প্রতিক্রিয়ার মতো ক্ষীণ, ক্ষণস্থায়ী। টেবিলের ওপর আস্তে আস্তে পেন্সিলটা ঠুকতে ঠুকতে রায়বাহাদুর বললেন, 'কত টাকা পেলে রাজার মতো খেয়ে-দেয়ে আপনি সিংহাসনে বসতে পারেন?'

ঠাট্টা করছেন নাকি? যা থাকে কপালে, বললাম, 'বারোশো টাকা।' কোনও কথা না বলে ফাইল থেকে একটু সাদা কাগজ টেনে নিয়ে লাল পেন্সিলে দিয়ে কী একটা লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, 'এ কাগজটা নিয়ে আফিসে ক্যাশিয়ারের কাছে চলে যান। সেখানে কনট্র্যাক্ট সই করে তিনশো টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে বাড়ি গিয়ে রাজার মতো নাক ডেকে ঘুম দিন।'

বা-র-শো টাকা । জীবনে এই প্রথম তিন মাসের পারিশ্রমিক একখানা ছবিতে বারশো টাকার কনট্র্যাক্ট। কাগজখানা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে বসে ভাবছিলাম।

রায়বাহাদুর বললেন, 'ভাবছেন ছশো থেকে এককথায় ডবলে রাজি হলাম কেন? আপনি সোজা সত্যি কথা বললেন বলে। কোনো মুরুব্বি সঙ্গে এনে কায়দা করে টাকা বাড়ানোর চেষ্টা করলে, ছশোর একপয়সা বেশি দিতাম না।'

ছোট্ট চিরকুটখানা হাতে নিয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মত আস্তে আস্তে আফিসের দিকে পা বাড়ালাম। এতখানি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে আসবার সময় রায়বাহাদুরকে নমস্কার করতেও ভুলে গেলাম।

দু-নম্বর ফ্লোর থেকে অফিসঘর বেশ খানিকটা দূর। কংক্রিটের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ পিঠে কার হাত পড়তেই চমকে চেয়ে দেখি জ্যোতিষবাবু। চকিতে চারদিকে চেয়ে নিয়ে চুপিচুপি বললেন, 'কীহে, সুবিধে করতে পারলে কিছু?'

কথা না বলে চিরকুটখানা চোখের সামনে মেলে ধরলাম। টাকার অঙ্ক দেখে বোয়াল মাছের মতো হাঁ করে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'বা-র-শো টাকা! বল কী? আজই ঘন্টাদুয়েক আগে রায়বাহাদুর আমাকে বললেন, 'দুষ্মন্তের পার্টের জন্যে ছশো টাকা এস্টিমেট। তার বেশি একপয়সাও দেবেন না। তুমি বুড়োকে যাদু করেছ নাকি?'

হেসে বললাম, 'যাদু নয় ভেল্কিও নয়—আসল কথা কী জানেন, আপনারা বুড়োকে চিনতে পারেননি। স্পষ্ট, সোজা কথা ভালবাসে, আপনারা কাছে যেতেই সাহস পান না। তাই ওর ধারণা—'

বাধা দিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'থাক থাক, তোমায় আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না, কাছে গিয়ে যা-তা গালাগাল খাওয়ার চেয়ে দূরে থাকাই নিরাপদ ।'

যেখানে বাঘের ভয়—জ্যোতিষবাবুর ডাক পড়ল রায়বাহাদুরের কাছে। ভয়-বিবর্ণ মুখে আস্তে আস্তে চলে গেলেন জ্যোতিষবাবু। একবার ভাবলাম, শুনে যাই ব্যাপার কী, আবার ভাবলাম, না কাজ নেই। পা চালিয়ে অফিসঘরের দিকে চলে গেলাম।

কত বিরুদ্ধ সমালোচনাই না শুনেছিলাম, এই অপ্রিয়দর্শন রাশভারি স্পষ্টভাষী রায়বাহাদুর সম্বন্ধে। হাড়কেপ্পন, দুর্মুখ। কুকুর-বেড়ালের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করে বেতনভুক কর্মচারীদের ওপর, আরও কত কী। কিন্তু 'শকুন্তলা'র শুটিং উপলক্ষ্য করে মানুষটির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে বুঝলাম, ঐ বিশেষণগুলো শুধু নির্জলা মিথ্যেই নয়, অপরাধী, ভীরু কর্মচারীদের মনগড়া সাফাই।

নিয়মিত দুবেলা স্টুডিওয় আসা রায়বাহাদুরের একটা নেশার মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভোর ছটায় এবং বিকেল পাঁচটায় স্টুডিওয় আসা চাই। ঝড়জল, শারীরিক অসুস্থতা, কিছুতেই এর ব্যতিক্রম দেখা যেত না। গাড়ি থেকে নেমেই মোটা লাঠিটা হাতে নিয়ে কংক্রিটের রাস্তা ধরে ঠকঠক করে সারা স্টুডিওটা ঘুরে দেখে এসে দু'নম্বর সাউন্ড স্টুডিওর সামনে ফুলবাগানে প্রকাণ্ড চেয়ারটায় বসে অভাব-অভিযোগ শুনতেন। দু'বেলা ঐ একই প্রোগ্রাম। কোথায় গাছের একটা শুকনো পাতা পড়ে আছে, কোথায় কিছু ময়লা জমে রয়েছে, কিছুই ওঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এড়াত না। মালি থেকে শুরু করে সবাই দুটি বেলা রায়বাহাদুরের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত! ইন্দ্রপুরী

তো ইন্দ্রপুরী, ঝকঝকে-তকতকে, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সর্বত্র একটা লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করত।

জাপানি বোমার ভয়ে জনশূন্য কলকাতা। যারা কোনও মতে টিকে আছে, দুবেলা পেটভরে খাবার জোগানো কষ্টকর। চাল বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে চোরাকারবারিদের গুদামে আত্মগোপন করে সোনার দামে বিক্রী হচ্ছে। যাদের পয়সা আছে তাদের কথা ছেড়ে দিলাম । মুশকিল হল মধ্যবিত্ত-গৃহস্থ আর মজুর-গরিবদের নিয়ে। অনেকগুলো স্টুডিও কর্মীর অভাবে বন্ধ, শুধু ইন্দ্রপুরীতে এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। ব্যাপার কী ? অথচ অন্যান্য স্টুডিওর তুলনায় এখানে মাইনে কম। উত্তর পেতেও দেরি হল না। সেদিন শুটিং-এর পর গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি—দেখি স্টুডিওর গেটের কাছে বেশ ভিড়! কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বাইরের লোক কেউ নয়, সব স্টুডিওর কর্মী—সেটিং মিস্ত্রী, কুলি, ঝাড়ুদার, মেথর, ড্রাইভার প্রভৃতি—দাঁড়িয়ে জটলা করছে। একটু পরেই দেখি পাতালপুরীর অদৃশ্য চোরাকুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসছে বস্তা বস্তা চাল-ডাল-আটা-ময়দা আর টিন ভর্তি ঘি। তারপর মাইনের হিসাবে সেগুলো বণ্টন শুরু হয়ে গেল কর্মীদের মধ্যে। শুনলাম যেদিন থেকে চোরাবাজারের সূত্রপাত হয়েছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাজার থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেই দিন থেকে প্রতি সপ্তাহে ন্যায্য দামে এইগুলো দেওয়া শুরু হয়েছে রায়বাহাদুরের হুকুমে। একে সামান্য মাইনে, তাতে চারগুণ দামে ঐগুলো কিনে খেতে হলে ওদের কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে—তাই এ ব্যবস্থা।

পাতালপুরীর চোরাকুঠুরী সম্বন্ধে কিছু খুলে বলা দরকার। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গেট দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে দেখা যাবে একতলা ঘর—প্রথমটা খাবার ঘর, পরেরটা অফিস, তার পরেরগুলো ভাড়াটে পার্টির আফিস, যারা স্টুডিও ভাড়া নিয়ে বাইরে থেকে এসেছে তাদের অফিস হিসাবে অমনি ঘর দেওয়া হয়েছে। এইরকম পাশাপাশি অনেকগুলো ঘরের পর বাড়িটা শেষ হয়েছে। শেষ ঘরটা কাউকে ভাড়া দেওয়া হয়না, সবসময় বন্ধ থাকে। ঐ ঘরটা খুললে দেখা যাবে নিচের দিকে কতকগুলো সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেই আবার দেখা যাবে সারবন্দী ঘর। এইগুলোই পাতালপুরীর চোরাকুঠুরী। বাইরে থেকে দেখলে একতলা বাড়ি বলে মনে হলেও আসলে বাড়িটা দোতলা। শুনেছি নিছক খেয়ালের বশেই রায়বাহাদুর বাড়িটা তৈরী করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওর প্রয়োজন অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ওখানে raw ফিল্মস্ আর নেগেটিভ স্টক করে রাখা হয়।

মেয়েদের রায়বাহাদুর অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। এই একটি ব্যাপারে কোনও তারতম্য ছিল না। বড় অভিনেত্রী থেকে ছোট একসট্রা মেয়েদের পর্যন্ত দেবী বলে ডাকতেন। ইন্দ্রপুরীর ফুলবাগান প্রসিদ্ধ। বড়, বড় টকটকে লাল গোলাপ ফুটে আছে কিন্তু কারও হাত দেবার হুকুম ছিল না। মেয়েদের বেলায় কিন্তু নিয়মের বল্গা ঢিলে

হয়ে যেত। যে কোন মেয়ে যদি সামনে গিয়ে বলতেন—ঐ ফুলটা আমার চাই, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মালিকে ডাকিয়ে ফুল তুলে নিজের হাতে খোঁপায় গুঁজে দিতেন।

একটা মজার ঘটনা বলি। জ্যোতিষবাবুর কাছে শোনা, কী একটা বাংলা ছবির শুটিং-এ সেদিন ইন্দ্রপুরী সরগরম। বিরাট সেট, সাতদিন সময় লেগেছে তৈরি করতে। অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কার্তিক দে প্রভৃতি'বড় বড় শিল্পীদের শুটিং হচ্ছে, সঙ্গে প্রায় একশ একস্ট্রা। সেদিন একটু সকাল-সকাল এসে পড়েছেন রায়বাহাদুর, জ্যোতিষবাবু অনেক করে বলে শুটিং দেখাতে নিয়ে চলেছেন রায়বাহাদুরকে। এমনিতে শুটিং-ফ্লোরে বড় একটা দেখা যেত না রায়বাহাদুরকে—সবাই বেশ অবাক হয়ে দূর থেকে পিছনে পিছনে চলেছে। দু'নম্বর ফ্লোরটা জুড়ে রাজসভার সেট, ফ্লোরে ঢোকবার আগে থেমে গিয়ে রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কার শুটিং হচ্ছে?' অর্থাৎ নামকরা শিল্পীদের মধ্যে কে কে আছেন।

জ্যোতিষবাবু মহা উৎসাহে বলে গেলেন আর্টিস্টের নাম। সব শুনে রায়বাহাদুর বললেন—'আজ দেবীলোগ কে কে আছেন?'

জ্যোতিষবাবু বেশ ভড়কে গিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে রাজসভার শুটিং, এখানে দেবীরা কেউ নেই।'

—'দেবীলোগ নেহি হ্যায় তো খালি ষাঁড়কা শুটিং ক্যা দেখেঙ্গে?' বলেই এ্যাবাউট টার্ন করে ফিরে গিয়ে ফুলবাগানে নিজের চেয়ারটায় বসে পড়লেন রায়বাহাদুর।

মেয়েদের ব্যাপারে একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন রায়বাহাদুর। কোনও মহিলা-শিল্পী কিছু চেয়ে পায়নি, এ রকম বদনাম অতি বড় শত্রুরাও দিতে পারবে না।

আর একদিনের ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন 'শকুন্তলা'র শুটিং হচ্ছিল। বিরাট রাজসভা, পাত্র-মিত্র-পরিষদ নিয়ে সিংহাসনে বসে আছি দুষ্মন্ত সেজে, সামনে তাপস-বালকের মাঝে শকুন্তলা আত্মপরিচয় দিচ্ছেন। স্মৃতিভ্রষ্ট রাজা চিনতে পারছে না। এই সিনটা নেবার তোড়জোড় চলছিল। একবার, দুবার মনিটার হয়ে গেল, এইবার টেক। মেক-আপ ম্যানকে ডেকে সবাই নিজে-নিজে মেক-আপ ঠিক করে নিচ্ছি, একজন চিৎকার করে ছুটে এসে বলল, 'শুটিং বন্ধ করে দাও, রায়বাহাদুরের হুকুম।'

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো নিমেষে সমস্ত ফ্লোরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। এত লোকজন, এত অর্থব্যয় করে আজকের শুটিং বন্ধ করা মানে অনেক টাকা লোকসান।

দেখি জ্যোতিষবাবু রীতিমত ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে ফ্লোর ছেড়ে বাইরে চলেছেন, সিংহাসন ত্যাগ করে সঙ্গ নিলাম। বাইরে এসে দেখি এক নম্বর ফ্লোরের উত্তর প্রান্তে কাচের পার্টিশন দেওয়া রায়বাহাদুরের অফিসের সামনে সমস্ত স্টুডিও

ভেঙে লোক জড়ো হয়েছে। এমনিতে রায়বাহাদুর বাইরে বসেই কাজকর্ম করতেন, বিশেষ প্রয়োজন না হলে পার্টিশন দেওয়া অফিসঘরে ঢুকতেন না। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে দেখি অফিসঘরে রায়বাহাদুরকে ঘিরে বসে রয়েছেন কজ্জন বাঈ, আখতারি বেগম, পেসেন্স কুপার আর মিস্ রোজ। খোশমেজাজে রায়বাহাদুর কী একটা বলছেন আর ওরা হেসে এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। ব্যাপার কী? কেউ বলতে পারে না, সবাই আমার মতো অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে আলো দেখতে পেলাম। কাচের দরজা খুলে ক্যাশিয়ারবাবু হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন, সবাই ঘিরে ধরল তাঁকে। একটু পরে আসল ব্যাপারটা জানতে পারলাম। ঝরিয়া, ধানবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলো কয়লার খনি আছে রায়বাহাদুরের। এরই মধ্যে একটা খনি থেকে কিছু আগে টেলিগ্রাম এসেছে—কয়লা খুঁড়তে খুঁড়তে সোনা বেরিয়েছে, কয়লার খনি রায়বাহাদুরের ভাগ্যে সোনার খনি হয়ে উঠেছে। আরও শুনলাম, স্টুডিওর সবাইকে চার মাসের মাইনে বোনাস দেওয়ার হুকুম হয়েছে। শুটিং হঠাৎ বন্ধ হবার কারণ এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

পরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর। টেলিগ্রাম যখন আসে, তখন কজ্জন বাঈ প্রভৃতি চারজন নায়িকা রায়বাহাদুরের ঘরে বসেছিল। খবর শুনে ওরা সবাই এক-একখানা নতুন মোটরগাড়ির বায়না ধরে। তখনি রাজি হয়ে টেলিফোনে চারখানা নতুন গাড়ির অর্ডার দিয়ে বসে আছেন রায়বাহাদুর। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই গাড়িগুলো স্টুডিওয় এসে যাবে। অবাঙালি নায়িকাদের এত উচ্ছ্বাসের কারণও এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

দানবীর ওই অসাধারণ মানুষটির কথা একমুখে বলে শেষ করা যায় না। আমার দীর্ঘ নায়ক জীবনে রুস্তমজীর মতো ঐ অদ্ভুত মানুষটিও চিরদিন স্মৃতির ভাণ্ডারে উজ্জ্বল হয়ে আছেন ও থাকবেন। চেষ্টা করেও কোন দিন ভুলতে পারব না।

স্টুডিও ইন্দ্রপুরী আজও আছে, শুটিং হয় রোজ। অগণিত লোকজনের কলহাস্য, গানে আজও ওর আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সবই আছে, নেই শুধু লক্ষ্মীশ্রী, নেই সে ছিমছাম পারিপাট্য। মাত্র একটি মানুষের অভাবে সব থেকেও যেন কিছু নেই।

আজও শুটিং শেষে জনকোলাহল শান্ত হয়ে যখন স্তব্ধতা নেমে আসে ইন্দ্রপুরীর বুকে—আস্তে আস্তে পাঁচ নম্বর ফ্লোরের দক্ষিণদিকের কংক্রিট রাস্তার সামনে গিয়ে পুবমুখো হয়ে দাঁড়ালে স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মোটা লাঠি ঠকঠক করে বিরাটকায় রায়বাহাদুর গজেন্দ্রগমনে চলেছেন একা ঐ রাস্তা বেয়ে। মাঝেমধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে শুকনো পাতা বা একটু আবর্জনা দেখে লাঠি ঠুকে চিৎকার করে বলছেন, 'কোথায় সেই চোরের সর্দার উছ্‌বা মালি, মেথর নাথুরাম? সব শালা নেমকহারাম, বসে-বসে মাইনে খাবে আর কাজে ফাঁকি দেবে, সব শালাকে আজ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেব।'

আজও উছ্‌বা মালি, নাথুরাম মেথর ইন্দ্রপুরীতে রয়েছে, নেই শুধু ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার লোকটি। সবাইকে বহাল রেখে সে নিজেই আগে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। অজান্তে চোখের ভারী পাতা দুটো বুজে আসে, চেষ্টা করেও চেয়ে থাকতে পারি না।

আমার জীবন নদীতে জোয়ার নেই, শুধু ভাঁটা। অনাদি-অনন্তকাল ধরে একঘেয়ে মিনমিনে জলস্রোত বয়ে চলবে লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন পথভোলা পথিকের মতো। বাঁকের মুখে ক্ষণিক থমকে দাঁড়াবে, আবার চলতে শুরু করবে গতানুগতিক রাস্তা ধরে। এ নদী শুকিয়ে চড়া পড়ে গেলেও জোয়ার কোনোদিন আসবে না, এই বোধ হয় নিয়তির বিধান।

দীর্ঘ নায়ক জীবনে কত ছবিতেই না অভিনয় করলাম। অধিকাংশ মনে রাখবার মতো না হলেও তার মধ্যে কয়েকটি সত্যিই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলাম। যথা—'রাজগী', 'অভিনয়', 'অভয়ের বিয়ে', 'রাজকুমারের নির্বাসন' প্রভৃতি, কিন্তু তাতে হল কী? শুধু বাঁকের মুখে ক্ষণিক থমকে দাঁড়িয়ে জোয়ারের স্বপ্ন দেখা, তারপর আবার যে তিমির সেই তিমিরে। চেনা-অচেনা অসংখ্য পরিচালককে করজোড়ে অনুরোধ করেছি, দয়া করে আমাকে অন্য ধরনের একটা ভূমিকা দিয়ে দেখুন। আমি আপনাদের নিরাশ করব না। আমার অভিনয় ক্ষমতার ওপর আস্থা করে কেউই লক্ষ্মণের গণ্ডি ডিঙোতে সাহস পেলেন না। রাঙা-মূলো ভালমানুষ নায়ক দ্বিতীয় আর কেউ তখন নেই, অথচ ঐ রকম একটা মাকাল ফল নইলে বাংলা ছবি চলে না—তাই আমাকে নেওয়া।

নিউ থিয়েটার্সের হয়ে বাংলা 'চণ্ডীদাস' ও হিন্দি 'পুরাণ ভকত' ছবি তুলে সারা ভারতব্যাপী খ্যাতিলাভ করেছেন পরিচালক দেবকী কুমার বসু। ইস্ট ইণ্ডিয়ার হয়ে এবার তিনি তুলবেন বাংলায় ও হিন্দীতে নিজস্ব কাহিনী 'সোনার সংসার'। হিন্দীর জন্য শিল্পী বোম্বাই থেকে আগেই ঠিক করে এসেছেন, বাংলায় বাংলাদেশের ছোট-বড় সব শিল্পীকেই নিয়েছেন। শুধু বাকি আছে সুদর্শন তরুণ নায়কের ভূমিকাটি। কেন বলতে পারি না, দেবকীবাবু আমাকে একটু স্নেহের চোখে দেখতেন। নিউ থিয়েটার্সে চণ্ডীদাসের ভূমিকা আমায় দেবেন বলে ভয়েস, ক্যামেরা সব টেস্ট সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ কয়েকটি গূঢ় কারণে তখন আমায় নিরাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবার নির্বিবাদে আমাকে নায়কের ভূমিকায় নির্বাচন করলেন। ধন্য হয়ে গেলাম—আশা-মরীচিকার ছলনায় নতুন করে চলার পথের কল্পনায় মেতে উঠলাম। দীর্ঘ বাঁকের মুখে ভাঁটার টান অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ হয়ে আছে, দূরে জোয়ার আসার অস্ফুট কলধ্বনিও শুনতে পেলাম যেন।

ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলো ছবি মুক্তি পেয়েছে, ইচ্ছে করেই সেগুলোর উল্লেখ

করলাম না। কাগজের সমালোচনা আর পড়বার দরকার হয় না, না পড়েই বুঝতে পারি কী লিখছে ওরা আমার সম্বন্ধে। আমার বন্ধুভাগ্য হিংসা করবার মতো। কোথায় কোন্ পত্রিকায় গালাগাল দিয়ে লিখেছে আমার নামে, লাল পেন্সিল দিয়ে লাইনগুলো আন্ডারলাইন করে বাড়ি এসে আমার সামনে সেটি মেলে ধরে বন্ধুবর বললেন, 'দ্যাখ ব্যাটাদের কাণ্ড, কেন আমরাও তো ছবি দেখেছি, অত খারাপ তো হয়নি।' কিন্তু দৈবাৎ যদি কোনও ছবিতে সামান্য প্রশংসা করে লিখেছে, সেটা আমার বন্ধুবর হয় পড়ে না, নয়তো ইচ্ছে করেই অবজ্ঞার ভান করে। যাক সে কথা।

সমস্ত স্টুডিওর উত্তরদিকের মাঠটা জুড়ে বস্তির সিন তৈরি শুরু হয়েছে। শুনলাম সত্যি-সত্যি একটা বস্তি তৈরি হবে, সময় লাগবে পনেরো-কুড়ি দিন।

এরমধ্যে একদিন সবাইকে ডেকে দেবকীবাবু গল্পটি শুনিয়ে দিলেন। চমৎকার গল্প, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত নাটকীয় সংঘাতে পরিপূর্ণ কাহিনী, অন্তত বাংলাদেশের সর্বস্তরের দর্শকের মন-প্রাণ হরণ করবার সম্ভব-অসম্ভব এত প্যাঁচের ছড়াছড়ি এর আগে আর কোন ছবিতে দেখা যায়নি। একটু নিরুৎসাহ হলাম, আমার ভূমিকাটি লখিন্দরের এক ধাপ উঁচু সংস্করণ। অনাথ ছেলে, ছেলেবেলা থেকে অপরের দয়ায় নির্ভর করে লেখাপড়া শিখে যৌবনে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে বস্তিতে। বস্তি তো নয়, মানুষের চিড়িয়াখানা—সেইখানে কয়েকটি উন্মাদ যুবকের আড্ডায় এসে আস্তানা গাড়ল অনাথ রঘুনাথ। ঐ বস্তিরই অপর একটি ঘরে থাকে একটি অসহায় মেয়ে। রঘুনাথ ভালবাসল তাকে। তারপর হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে ওদের প্রেম আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল, শেষকালে এক নাটকীয় মুহূর্তে রঘুনাথ ফিরে গেল বাবা-মার কাছে, সবাই মিলে বরণ করে নিয়ে এল বস্তির মেয়েটিকে রঘুনাথের বধূরূপে। ছবির শেষ এইখানেই।

পরিচালক দেবকী বসুর সঙ্গে কাজ করে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম। যে কোনও অভিনেত্রীর পক্ষে দেবকীবাবুর ছবিতে নায়িকা হওয়া ভাগ্যের কথা। ঐ একটিমাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে মন-প্রাণ ঢেলে তিনি গল্পের জাল বুনে চলেন। ফলে অন্যান্য চরিত্র নায়িকার পাশে বেশ কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তা হোক—তাতে ছবির আকর্ষণ কমে না, বাড়ে। দেবকী বসু পরিচালিত অধিকাংশ ছবিতে এটি বিশেষ লক্ষণীয় ।

মেট্রো সিনেমায় এমিল জেনিংস-এর প্রথম ইংরেজি সবাক ছবি 'ব্লু এঞ্জেল' মুক্তি পেল। নির্বাক যুগে এই অসাধারণ শক্তিধর অভিনেতার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম, তাঁর প্রথম কথা-কওয়া ছবি দেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। অপূর্ব ছবি, অভিভূত হয়ে গেলাম। ছবি শেষ হয়ে গেলেও চুপ করে চেয়ারে বসে আছি। অসংখ্য ভিড়, ভাবলাম ভিড় কমে গেলে একটু পরে নিচে নামব। কানে তখনও বাজছিল মারলিন ডিয়েট্রিচের সেই বিখ্যাত গান—

'ফলিং ইন লাভ এগেন'। আর চোখে ভাসছিল ভীত অবহেলিত এমিলের পথ দিয়ে ছুটে পালানো—। তন্ময় হয়ে বসেছিলাম। একটু পরে চারদিকে চেয়ে দেখি উপরে আর কেউ নেই, সবাই নেমে চলে গেছে। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, কানে এল, 'ছোড়দা!'

আজও মনে আছে চমকে রেলিংটা ধরে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। চাইতে সাহস হচ্ছিল না। বছর তেইশ-চব্বিশের একটি লাবণ্যময়ী সুন্দরী মেয়ে নিচের লবিতে আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'ছোড়দা, আমি রিনি'! নাম না বললে, সত্যিই চেনা একটু কষ্টকর হত আমার পক্ষে। কয়েক বছরে কী বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে রিনির! অবাক হয়ে চেয়ে আছি, রিনি বলল, 'আমার ওপর রাগ করেছ ছোড়দা?'

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে রিনির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বছরপাঁচেকের একটি ফুটফুটে ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে রিনি, হেসে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করলাম—'ছেলের সঙ্গে তো আলাপ হল, ছেলের বাপ কই?'

কিছুদূরে একটা সোফায় বছর সাতাশ-আঠাশের মিশমিশে কালো একটি যুবক গম্ভীর মুখে আমাদের দিকে চেয়ে বসে আছে দেখলাম। রিনি কাছে গিয়ে কী একটা বলতেই গম্ভীর মুখে উঠে এসে হাত তুলে নমস্কার করল। সাত-আট বছর আগে রিনির বিয়ের খবরটা শুনেছিলাম, কাকা সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে নেমন্তন্ন করেননি। বললাম, 'অনেকদিন তোদের কোনও খবর রাখি না রিনি, যাক আজ তোদের দেখে খুব খুশি হলাম।'

রিনির শ্বশুরের অবস্থা ভাল, কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি-গাড়ি আছে। স্ট্র্যান্ড রোডে মস্ত বড় লোহা-লক্কড়ের দোকান। ছেলেটি লেখাপড়া বেশিদূর না করলেও বেশ পাকা ঝানু ব্যবসাদার, পৈত্রিক দোকান সে-ই দেখাশুনা করে। আমাদের এই ঘরোয়া আলোচনার মধ্যেই রিনির স্বামী গম্ভীর মুখে দূরে সরে গিয়ে লবিতে ঝোলানো একটা ছবির দিকে চেয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল। সত্যি কথা বলতে কি, রিনির স্বামীকে প্রথম থেকেই আমার ভাল লাগেনি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে পার্ল হোয়াইট, সত্যি বলতো, এ বিয়েতে তুই সুখী হয়েছিস?'

ঠোঁটদুটো যেন একটু কেঁপে উঠল রিনির, তাড়াতাড়ি আমার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ছেলেটার চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে আদর করার আড়ালে নিজেকে সামলে নিয়ে জোর করে হাসি এনে বলল, 'ওরা স্বভাব নৈকষ্য-কুলীন, ঠিক বাবা যেমনটি চেয়েছিলেন।' আর বলতে পারল না রিনি, চোখ ছলছলিয়ে এল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। রিনি বলল, 'ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করলে ছোড়দা, আমাদের খাওয়া পাওনা আছে।'

আমাদের অর্থে কার কথা বলতে চাইছে রিনি বুঝতে পেরে বেশ শঙ্কিত হয়ে

পড়লাম। একটু পরে রিনি আবার বলল, 'গোপাদির কাছে আমি বাজি হেরে গেছি ছোড়দা!'

সব বুঝেও অজ্ঞতার ভান করে বললাম, 'কিসের বাজি?'

আবার চোখ দুটো ম্লান হয়ে গেল রিনির, অন্য দিকে চেয়ে বলল...'তোমার বিয়ের বাজি। আমি বলেছিলাম, আমার ছোড়দা কোনওদিনই বিয়ে করবে না। গোপাদি হেসে বলেছিল, 'পুরুষ মানুষকে তোমার এখনো চিনতে দেরি আছে রিনি, অল্পদিন হলেও যেটুকু চিনেছি তাতে আমি বলছি চিরকুমার তোমার ছোড়দা থাকবে না।' এই নিয়ে বাজি।'

একটা কিছু বলার দরকার, 'তোমার গোপাদি ঠিকই বলেছেন রিনি।' ব্যথাভরা চোখ দুটো দিয়ে আমার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিতে চায় রিনি। ওর দিকে চাইতেও ভয় হচ্ছিল। লবির পশ্চিমদিকের দেওয়ালে ক্লার্ক গেবেলের প্রকাণ্ড ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম। ক্লার্ক গেবেলের মুখে দুষ্টুমি হাসি। চোখ ফিরিয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণে চাইলাম, রহস্যময়ী গ্রেটার ছবি, রাজ্যের বিরহ ব্যথা বুকে চেপে মুখে মানুষকে ধোঁকা-দেওয়া হাসি। রিনি বলল, 'গোপাদির মা-বাবার মৃত্যুর খবর তুমি জানতে ছোড়দা?'

ঐদিকে চেয়েই বললাম, 'বাবার মৃত্যুর খবর কাগজে দেখেছিলাম...মায়ের খবর পাইনি।'

—'মাত্র একবছরের মধ্যেই গোপাদি মা-বাবা দুজনকেই হারায়, এম. এ. পরীক্ষার তখন মাত্র দুমাস বাকি। কত করে বললাম, কিছুতেই পরীক্ষা দিল না গোপাদি। তারপর ছ'মাসের মধ্যেই জমি-জমা বিক্রি করে, বাড়িটা ভাড়া দিয়ে ট্রাস্টি-অ্যাটর্নির সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে বিলেত চলে যায়। সেও আজ ছ-সাত বছরের কথা।'

মেট্রোর আগামী আকর্ষণ বাইবেলের ঘটনা নিয়ে কী একটা বিরাট জমকালো প্রডাকসনের রঙিন ব্যানার প্রবেশপথের মাথার ওপর ঝোলানো। কী নাম ছবিটার, কে অভিনয় করেছে, কার প্রডাকসন কিছুই মনে নেই, প্রাণহীন চোখে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দু'পা এগিয়ে কাছে এসে রিনি বলল, 'প্রতি মাসে যেখানেই থাকুক না কেন, একখানা করে চিঠি গোপাদি আমাকে লেখে। প্রত্যেক চিঠিতে তোমার কথা থাকে। ছোট্ট একটা লাইন, তোমার ছোড়দার খবর কী রিনি! বহুদিন তোমার খবর রাখি না। আন্দাজে লিখে দিই, ছোড়দা ভালই আছে, বাংলাদেশের একচ্ছত্র নায়ক।'

ছেলের হাত ধরে রিনির স্বামী গম্ভীর অপ্রসন্নমুখে কাছে এসে দাঁড়ায়। একনজর চেয়ে বেশ বুঝতে পারি, আমার মতো 'বিখ্যাত' লোকের সঙ্গে স্ত্রীর 'এতখানি' ঘনিষ্ঠতা ভদ্রলোক মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না। আস্তে আস্তে রিনি বলে,

'গোপাদির প্যারিসের ঠিকানাটা নেবে ছোড়দা?' ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে কী যেন খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে রিনি।

অম্লানবদনে বললাম, 'না!'

অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রিনি বলল, 'না?'

—'হ্যাঁ। ঠিকানা নিলেও আমি হারিয়ে ফেলব রিনি। তার চেয়ে তোর কাছেই থাক।' বিস্ফারিত চোখে রাজ্যের হতাশা ও ব্যথা নিয়ে তাকিয়ে রইল রিনি, কোনও দিকে না চেয়ে প্রকাণ্ড দরজাটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

ভিতরে ঠাণ্ডা, বাইরে গরম। সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখতে-দেখতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার মতো। বাইরের লবিতে অসম্ভব ভিড়। কোন রকমে ঠেলেঠুলে রাস্তা ক্রস করে ধর্মতলা ট্রাম টার্মিনাসের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ট্রামেও ভিড়, দু-তিনখানা ট্রাম ছেড়ে দিয়ে মাঠে মনুমেন্টের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। আজ আর ভিড় সহ্য করতে পারছিলাম না, একটু নির্জনতা, মানুষের নিষ্ঠুর দৃষ্টিসীমার বাইরে—তা সে যেখানেই হোক, একটুখানি একা থাকতে চাই। ঘুরেফিরে বারে বারে রিনির কথাটাই মনটাকে তোলপাড় করে তুলছিল। সেই সদাহাস্যময়ী চঞ্চলা রিনির এ কী মূর্তি দেখে এলাম। হাসতে ভুলে গেছে রিনি। শুধু কৌলীন্যপ্রথা বজায় রাখতে জেনেশুনে একটা লৌহদানবের সঙ্গে ফুলের মতো রিনিকে লোহার শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়েছেন কাকা! রামগরুড়ের ছানার মতো কোনদিন ভুলেও না-হাসবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যারা পৃথিবীতে এসেছে শুধু পয়সা রোজগারের জন্য, তাদের সংসারে রিনির মতো মেয়ে সারা জীবন কাটাবে কী সম্বল করে? মনে পড়ল ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে গাড়ির মধ্যে গোপার মায়ের কথা, 'গরীব হলেও ক্ষতি ছিল না, শুধু তুমি যদি নৈকষ্য-কুলীন হতে, আর বায়োস্কোপে অভিনয় না-করতে।' সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মনে হল চিৎকার করে বলি, এই ভণ্ড ব্রাহ্মণসমাজে জাতের নামে বজ্জাতি আর কতদিন চলবে? ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়ে দুনিয়ার দরবারে এদের সত্যিকার আসন নির্দেশ করতে আর কতদিন লাগবে ভগবান?

অন্ধকার নির্জন গড়ের মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটেই চলেছি। খুব কাছে কে একজন বলে উঠল, 'আরে কে যায়! ধীরাজ না?'

অনিচ্ছার সঙ্গে দাঁড়ালাম। উঠে এসে একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে মনমোহন বলল, 'অন্ধকার মাঠের মধ্যে একা চলেছিস কোথায়?'

বললাম, 'চুলোয়! তুই বা এখানে বসে করছিস কী?'

একটা কাগজের ঠোঙা আমার হাতে তুলে ধরে মনমোহন বলল, 'চিনেবাদাম খাচ্ছি, খাবি?'

সামনে কিছু দূরে আর একজন কে বসে রয়েছে দেখলাম। চিনেবাদামের ঠোঙাটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'তোর সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?'

দাঁত দিয়ে কড়মড় করে একটা বাদামের খোলা ভাঙতে ভাঙতে মনমোহন বলল, 'ও আমার বন্ধু দ্বারিক, তিনটের শো'তে মেট্রোয় 'ব্লু এঞ্জেল' দেখতে গিয়েছিলাম।'

বললাম, 'আমিও তো গিয়েছিলাম, কিন্তু তোদের তো দেখতে পাইনি।'

—'বাহ্যজ্ঞান থাকলে তো দেখতে পাবি! ওরকম একটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে গেলে আমাদের মতো লোককে চোখে না দেখাই স্বাভাবিক।'

কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, 'কোনও মেয়ের সম্বন্ধে সঠিক কিছু না জেনে এ ধরনের রিমার্ক ভবিষ্যতে আর কখনও করিসনে মনু। মেয়েটি আমার বোন, রিনি।' রিনি ও গোপার কথা কিছু-কিছু বলেছিলাম মনমোহনকে। লজ্জায় এতটুকু হয়ে মাপ চাইল মনমোহন। প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য হেসে বললাম, 'চল, তোর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি, চল।'

দ্বারিক পাল অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। ফিল্মে ক্যামেরার কাজ শিখতে চায়, তাই মনমোহনকে মুরুব্বি পাকড়ে সিনেমা, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি বেপরোয়া খরচ করে চলেছে। চিনেবাদামের ঠোঙা শেষ করে পকেট থেকে ডালমুটের একটা ঠোঙা বার করে খেতে-খেতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতো স্টুডিও সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ দিতে শুরু করে মনমোহন। তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে ভবিষ্যতে ক্যামেরাম্যান হওয়ার স্বপ্ন দেখে ধনী পিতার একমাত্র ছেলে দ্বারিক পাল।

ভাল লাগে না, মন চাইছে একান্ত নির্জনতা। ওরই মধ্যে একফাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলি।'

অবাক হয়ে মনমোহন বলে, 'এরই মধ্যে? আজ তোর হয়েছে কী?'

বললাম, 'দেহ-মন দুটোই আজ একসঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, ফলং আজ রাতে নিদ্রা নাস্তি।'

হাসতে গিয়ে ডালমুটের বিষম খেয়ে খানিক কেশে নিল মনমোহন। তারপর বলল, 'জানি, কিন্তু সেদিক দিয়েই আজ আমি যাব না। ভাল কথা, তোর গিন্নি কোথায়?'

বললাম, 'পিত্রালয়ে। কেন, গিন্নির পিত্রালয়ে থাকার সঙ্গে আমার নিদ্রাহীনতার কোনও ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আবিষ্কার করেছিস নাকি?'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মনমোহন বলল, 'তোর জন্যে সত্যিই দুঃখ হয় ধীরাজ! ভাগ্যদেবতার ত্যাজ্যপুত্র হয়ে তোর সারা যৌবনটাই প্রায় দুঃখ আর নৈরাশ্যের মধ্যে দিয়ে কাটল।'

হেসে ফেললাম, মনমোহনের মতো ছেলে যখন স্বভাবসিদ্ধ হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে পাকা দার্শনিকের মতো চোখা চোখা ধর্মের বুলি আওড়ায় তখন কী জানি কেন আমার হাসি পায়।

ক্ষুণ্ণ হল মনমোহন, বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'আজকের 'খেয়ালি'

দেখেছিস?' মাথা নাড়লাম। তখনকার দিনে বহুলপ্রচারিত সিনেমা সাপ্তাহিক 'খেয়ালি'। মনে ভাবলাম, নতুন আর কী লিখবে, হয়ত আমার কোনো ছবিকে উপলক্ষ্য করে গালাগালি দিয়েছে। মনমোহন বলল, 'দেখলে হাসি আসত না। আমার কথা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতিস।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কোন্ ছবিটা নিয়ে আমায় গালাগালি দিয়েছে রে?'

—'ছবি নয়, এবার ব্যক্তিগত আক্রমণ। তোমাকে 'খোলা চিঠি' দিয়েছে। বলতে বলতে পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা 'খেয়ালি' বার করে সামনে মেলে ধরল মনমোহন। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাই না। মনমোহন বলল, 'পকেটে করে বাড়ি যাও, রাত্রে পড়ে দেখ। তবে হ্যাঁ, এও বলি, এ ধরনের নোংরা মনোবৃত্তি নিয়ে যারা পত্রিকায় সমালোচকের আসন কলঙ্কিত করে, তাদের প্রকাশ্যে চাবকানো উচিত। নয়তো আদালতের সাহায্য নিয়ে মানহানির মামলা করে শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মনমোহন, বুঝলাম ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। আবার ভাঁজ করে 'খেয়ালি'টা পকেটে পুরে দ্বারিক পাল ও মনমোহনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রামরাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ট্রাম স্টপেজে যখন এসে পৌঁছলাম, 'হোয়ায়িটওয়ে লেডল'র বড় গোল ঘড়িটায় তখন প্রায় রাত্রি সাড়ে নটা বাজে।

শেষ এখানে হয় না; অনাদ্যনন্তকাল ধরে চলবে আমার যোগসূত্রবিহীন নায়কজীবনের একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানি, তাই ইচ্ছে করেই ছেদ টেনে দিয়েছি। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই না নায়ক হবার স্বপ্নে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়েছিলাম, কিন্তু কী পেলাম? না পেলাম পয়সা, না হল খ্যাতি যশ। শুধু সামাজিক অবজ্ঞা ও অপযশের মালা গলায় ঝুলিয়ে একঘেয়েমির স্রোতে ভেসে চলেছি। নিজের কাছেই যখন এই ব্যর্থ জীবনটার কোনও মূল্যই রইল না, তখন অপরের কাছে কী-ই বা আশা করতে পারি?

মনমোহনের কাছ থেকে ভাঁজ করা 'খেয়ালি'টা পকেটে করে বাড়ি এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। স্ত্রী দীর্ঘদিন বাদে পিত্রালয়ে গেছেন। সেদিক দিয়ে খুব রক্ষে, নইলে এত বড় একটা পাথর বুকে চেপে মুখে হাসির অভিনয় করা অসম্ভব হত।

সম্পাদকীয় মন্তব্যের পরেই খুব বড় বড় হরফে লিখেছে, খোলা চিঠি—ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। চিঠিটার সঠিক ভাষা মনে না থাকলেও মূল বক্তব্যটা আজও স্পষ্ট মনে আছে, 'ওহে অপদার্থ মাকাল ফল! আর কতদিন তুমি ফিল্মলাইনে থেকে আমাদের ধৈর্যের ওপর কশাঘাত করবে? তুমি বিদায় নাও। তোমার ঐ ড্যাবডেবে চোখের চাহনি আর যে আমরা সহ্য করতে পারছি না। অভিনয় করবার ক্ষমতা না দিয়ে ভগবান তোমায় রাঙা-মূলোর মতো শুধু খানিকটা বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই মাঝেমাঝে তোমার জন্য আমাদের দুঃখ হয়! অবশ্য এটুকু ভেবে

তুমি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেতে পার যে, তোমার দীর্ঘ নায়কজীবনে একশ্রেণীর দর্শকের চিত্ত জয় তুমি করেছ, তারা হল কতকগুলো অপরিণামদর্শী স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে আর মফস্বলের ধর্মান্ধ একশ্রেণীর দর্শক। এদের কাছে তোমার কেষ্ট-বিষ্টু-মহাদেব তুলনাবিহীন। আমরা শুধু অবাক হয়ে ভাবি বাংলাছবির প্রযোজক-পরিচালকদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কথা; কী দেখে তাঁরা পয়সা দিয়ে একটার পর একটা ছবিতে তোমাকে নায়কের ভূমিকায় মনোনীত করেন, ভেবে কূল-কিনারা পাই না। তাঁদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আর যেন তোমাকে নেওয়া না হয়। অবশ্য কিছু একটা না করলে তোমারই বা উপায় কী হবে? তাই তোমাকে একটা সদুপদেশ দিচ্ছি—এখন তুমি যাত্রাদলে যোগদান কর, উদাসিনী রাজকন্যার ভূমিকায় তোমাকে চমৎকার মানাবে। তুমিও নাম, যশ, পয়সা পাবে, আমরাও স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
আনিয়াৎ খাঁ'

একবারই যথেষ্ট, চিঠিখানি দু'বার পড়বার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা ছিল না। টকটকে লাল লোহার শিকের ছেঁকার মতো প্রতিটা লাইন আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দিল। ঘরে আলো জ্বলছিল—নিজের দিকে চাইতেও লজ্জা করছিল, তাড়াতাড়ি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে চুপ করে বসে রইলাম।

নায়ক জীবনের শুরু থেকে একের পর এক ঘটনাগুলো চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল। স্পষ্ট মনে আছে, নির্বাক যুগ থেকে রোনাল্ড কোলম্যান, এমিল জেনিংস, পল মুনি, চালর্স বয়ার প্রভৃতি ক্ষণজন্মা অভিনেতার অভিনয় দেখে মনের নিভৃত কোণে কত আশাই না বাসা বেঁধেছিল! বড় হয়ে একদিন আমিও ওদের মতো অভিনয়-দক্ষতায় সারা বাংলাদেশকে সবার ঈর্ষার কেন্দ্র করে তুলব। পিছিয়ে-পড়া অপাংক্তেয় শিশু-শিল্পকে আমিই একদিন বসাব মর্যাদার স্বর্ণ সিংহাসনে। অসার দম্ভ দেখে ভাগ্যদেবতা অন্তরীক্ষে বসে বাঁকা হাসি হেসেছিলেন সেদিন—শুনেও বুঝতে পারিনি, আজ না শুনেও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অনটন কোনও দিনই আমার অদম্য মনোবলকে দমাতে পারেনি। আজ মনে হল সহ্যের শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি।

মানুষের কল্পিত দেবদেবীর মূর্তির সামনে কেঁদে মাথা খুঁড়ে দুঃখভার লাঘব করার চেষ্টা কোনও দিন করিনি। সে অন্ধবিশ্বাস ও ভক্তি আমার কোনও দিনই ছিল না—আজও নেই। মাটির পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে মনে মনে পূজা করতাম আমার বাবা-মাকে। বাবার প্রতিটি কথা অভ্রান্ত সত্য বলে মানতাম। চরম দুঃখে মনে শান্তি ও বল পেতাম বাবার কথা স্মরণ করে। আজও দিগভ্রান্ত পথিকের মতো রাত্রির ঘন আবরণ ভেদ করে অতীতের অতলে ডুব দিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলাম। সবই অস্পষ্ট

ঝাপসা, দু'-একবার বাবাকে দেখলাম যেন, বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো ক্ষণিক সে দেখা। মনে হল, মুখে সে শান্ত সৌম্য হাসি নেই, চোখে নেই অনুকম্পার দৃষ্টি, শুধু অনুযোগ ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন বাবা; কাতর স্বরে ডাকলাম—বাবা! ফিরে চাইলেন না, তেমনি মুখ ফিরিয়ে বললেন—জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে, প্রতিপদে নতি স্বীকার করে, মনগড়া যুক্তি দিয়ে মনকে চোখ-ঠেরে আজ ভাগ্যদেবতার দুয়ারে মাথা খুঁড়তে তোমার লজ্জা করে না? সব চেয়ে বড় পরাজয়গুলো পিতৃমাতৃভূমির দোহাই-এর আড়ালে চাপা দিয়ে যে ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ তুমি পাবার চেষ্টা করেছ, আজ বুঝতে পারছ সেগুলো কত বড় মিথ্যে? আসলে সব কিছুর মূলে রয়েছে তোমার ভীরু মন; এইরকম মন নিয়ে সংসার-অরণ্যে পা বাড়ালে যা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাই হয়েছে—সহানুভূতি বা অনুকম্পার প্রশ্ন ওঠে না।

সর্বগ্রাসী অন্ধকার এগিয়ে আসছে, বাবাকে আর দেখতে পারছি না—চিৎকার করে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। অন্ধকারের বুক চিরে চোখের সামনে ফুটে উঠল জনবহুল প্যারিসের রাস্তা, বায়োস্কোপে দেখা প্যারিস। রংবেরং-এর পোশাক পরা নানা জাতের নরনারীর মিছিল। ওরই মধ্যে চোখে পড়ল শাড়ি পরা কাঁধে ক্যাম্বিসের মতো ঝোলানো ব্যাগ—তাতে ছোট-বড় কতকগুলো তুলি—ডানহাতে ছবি আঁকবার একটা ফোল্ড করা ক্যানভাস—অজ্ঞাতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, গোপা! চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল মেয়েটি। তারপর আস্তে আস্তে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। গোপার মুখে বিদ্রোহের হাসি, চোখে অবজ্ঞা- মাখানো দৃষ্টি। বেশিক্ষণ সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারি না—মুখ নিচু করে দাঁড়ালাম। গোপা বলল, 'মানুষের তৈরী, বোকাকে ধোঁকা-দেওয়া কয়েকটা ভুয়ো সামাজিক গণ্ডি ডিঙোবার সাহস নেই, তুমি চাও সংসার-সংগ্রামে জয়ী হয়ে দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে? জীবনের জুয়াখেলায় বুদ্ধির দোষে সর্বস্ব খুইয়ে আজ ভিখারির মতো পিছু ডাকতে লজ্জা করে না তোমার?' মুখ ফিরিয়ে চলতে শুরু করল গোপা। মনে হল ছুটে গিয়ে বলি, 'ফাঁসির আসামীকেও সপক্ষে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়, তোমরা কি তাও দেবে না আমায়?' ছুটতে গেলাম, পা-দুটো শিকল দিয়ে বাঁধা, কথা বলতে চাই, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

আবার অন্ধকারে প্যারিসের রাস্তা হারিয়ে গেল। সমগ্র দৃষ্টিসীমা জুড়ে স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি। মাটি থেকে সোজা উঠে গেছে আকাশে। আদি আছে, অন্ত নেই। অগুনতি তার ধাপ, মাটিতে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছি আমি। উপরে উঠবার চেষ্টা করি—পারি না, পা দু'টো অসাড় অবশ। হঠাৎ একাধিক নারীকণ্ঠের কলগুঞ্জনে চমকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম ললিতা, সীতা, সবিতা থেকে আরম্ভ করে সব ছবির নায়িকারা এগিয়ে আসছে। লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। ফিরেও চাইল না কেউ আমার দিকে; পাশ কাটিয়ে

হাসিমুখে জয়যাত্রার কোরাস গাইতে গাইতে সবাই একসঙ্গে ওপরে উঠতে লাগল—ঐ অন্তহীন সিঁড়ির—একটার পর একটা ধাপ অনায়াসে অতিক্রম করে। সমস্ত দেহমন ব্যথায় টনটন করে ওঠে—চাইতে কষ্ট হয়, তবু চেয়ে থাকি—আজ সব ইন্দ্রিয়গুলো একসঙ্গে জোট পাকিয়ে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

দেখলাম একখণ্ড কালো মেঘ চোখের নিমেষে কোথা থেকে এসে বিশ্বচরাচর অন্ধকারে ঢেকে ফেলল। ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সামনের জমাট অন্ধকারের দিকে চেয়েই বিস্ময়ে ভয়ে আঁতকে উঠলাম। ঘর-বাড়ি গাছপালা সব ভেঙেচুরে একাকার করে সামনে এগিয়ে আসছে সর্বগ্রাসী জলপ্লাবন। ছুটে পালাবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না, আর পালাবই বা কোথায়? আমার ওপর দিয়ে চলে গেল উন্মত্ত জলরাশি, কিন্তু আশ্চর্য! আমায় তো সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না! অকর্মণ্য, অসহায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে জল হাঁটু ছাড়িয়ে কোমর ডুবিয়ে বুক পর্যন্ত উঠে এল। সভয়ে দেখলাম চারপাশ দিয়ে ভেসে চলেছে সংখ্যাহীন মানুষের সারি, গরু, গাছ, বাড়ি—স্থাবর-জঙ্গমে কোনও ভেদাভেদ নেই—সব একাকার। ওদের সঙ্গে ভেসে গেলে বেঁচে যেতাম! কিন্তু তা যে হবার নয়, এই একভাবে দাঁড়িয়ে তিলেতিলে মৃত্যুর সবগুলো বিভীষিকা দেখতে দেখতে মরা, এই আমার নিয়তি। গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে জলে, আর কতক্ষণই বা; মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে জীবনের হাতছানির মতো দূরে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখলাম, কে যেন তীরবেগে নৌকা বেয়ে আমায় উদ্ধার করতে ছুটে আসছে। কাছে প্রায় হাত-দশেক দূরে দাঁড়িয়ে গেল নৌকা। সবিস্ময়ে দেখলাম বৈঠা হাতে বসে আছে জয়া। কঠিন চোখে আমার দিকে একবার চেয়েই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল জয়া। পর মুহূর্তে দ্বিগুণ জোরে বৈঠা বেয়ে স্রোতের অনুকূলে নৌকা ভাসিয়ে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। ও যেন যাবার আগে নীরব ভর্ৎসনায় বলে গেল, 'একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তোমার মতো অপদার্থকে বাঁচিয়েছিলাম, ভুল করেছিলাম, আবার সেই ভুল করব ভেবেছ?'

আমিও ভুল করেছিলাম, জয়াকে নৌকো করে এগিয়ে আসতে দেখে ক্ষণিকের জন্যও বাঁচবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কী সম্বল করে মানুষ বেঁচে থাকে? সুখ-শান্তি-যশ-মান-খ্যাতি- প্রতিপত্তি-আর্থিক সচ্ছলতা এই সব নিয়েই তো সত্যিকারের জীবন। সব পুঁজি যার শূন্য হয়ে জমার ঘরে স্থায়ী আসন পেতে বসেছে, তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? বাবাকে মনে পড়ল। মনে-মনে বললাম, 'এই চরম মুহূর্তে ধীরভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার মনোবলটুকু যেন আমি না হারিয়ে ফেলি—শুধু এই আশীর্বাদ করুন বাবা!'

একটু একটু করে অতল গভীরে তলিয়ে যেতে লাগলাম—গাঢ় অন্ধকারের বুকের ওপর দিয়ে, অনন্তপথের যাত্রীর মতো। তারপর আর কিছু মনে নেই।

রাত ক'টা বাজল জানি না, ঘুমিয়ে পড়লাম না জেগে রইলাম কিছু মনে নেই। শুধু আজও স্পষ্ট মনে আছে, এক ঝলক আলোর হল্কা নিয়ে কে যেন দরজা খুলে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। চোখ ধাঁধানো আলোর কুণ্ডলীর মাঝে দেখলাম, বাবা! চাইতে পারি না, চোখ ঝলসে যায়, চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। অনুভব করলাম শিয়রে মাথার কাছে এসে বসলেন বাবা।

ঠিক সেদিনের মতো, যেদিন এলফিন্স্টোন পিকচার প্যালেস থেকে ষাট টাকা মাইনের খবর শুনে বাড়ি এসে লজ্জায়-ঘেন্নায় কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছিলাম।

শান্তিজলের মতো হাতখানি আমার মাথায়-পিঠে বুলোতে বুলোতে বাবা বললেন, 'ধীউ বাবা! অধৈর্য হয়ো না। তোমার দুঃখ-নিশার অবসান হবে।'

দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে কণ্ঠে নিয়ে এসে ধড়মড় করে উঠে বসে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলাম, 'কবে, বাবা কবে?'

বাইরে থেকে কে যেন দরজায় জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শুনলাম মা দরজা ঠেলতে ঠেলতে উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল স্বরে বলছেন, 'কী হল রে? এত ভোরে চিৎকার করে কার সঙ্গে কথা কইছিস?'

কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে শান্তকণ্ঠে জবাব দিলাম, 'কিছু না মা, স্বপ্ন দেখছিলাম।'

কয়েকদিন পরে হঠাৎ দুপুরে সাহিত্যিক-বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র বাড়িতে এসে হাজির। ব্যাপার কী? এতকাল প্রেমেন্দ্র শুধু গল্প, গান, সংলাপ আর চিত্রনাট্য লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, সম্প্রতি এস. ডি. প্রডাক্সনের প্রথম সবাক চিত্র 'সমাধান'-এর গল্প, চিত্রনাট্য ছাড়াও পরিচালনার গুরুদায়িত্ব ওঁর কাঁধে চাপানো হয়েছে এবং সেই গুরুভার স্বেচ্ছায় আরও গুরু করে তুলতে চলেছেন তিনি চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে— বিলেত-ফেরত, স্মার্ট, সুশ্রী একটি ভিলেনের ভূমিকায় আমায় মনোনীত করে।

কথা কইতে পারলাম না—ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে চাইলাম—নির্মল, মেঘশূন্য নভস্তল। কানে ভেসে এল উচ্ছৃঙ্খল জলরাশির কলকল ধ্বনি, দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে পরিষ্কার দেখতে পেলাম—সাপের মতো ফণা বিস্তার করে আসছে বহুআকাঙ্ক্ষিত জোয়ার।